# উপনিষৎ-প্রসঙ্গ

পঞ্চম খণ্ড

কৌষীতকী উপনিষৎ

শ্রীমৎ অনির্বাণ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান

# উপনিষৎ-প্রসঙ্গ

পঞ্চম খণ্ড

## কৌষীতকী উপনিষৎ

শ্রীমৎ অনির্বাণ

[ ১৯৬৫ সালে প্রদত্ত প্রবচন অবলম্বনে ]

মন্ত্রানুবাদ
গৌরী ধর্মপাল

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান
১৯৯২

Upanisad Prasanga
( Volume V )
By Srimat Anirvan

প্রথম প্রকাশ :
গুরুপূর্ণিমা ১৩৯৯
১৪ই জুলাই ১৯৯২

© বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

[ ভারত সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ স্টেট লেবেল কমিটির মাধ্যমে বিতরিত কাগজে মুদ্রিত ]

চল্লিশ টাকা

প্রকাশক :
রথীন্দ্রকুমার পালিত
পাবলিকেশন্‌স্ অফিসার
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক :
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
৫৫বি, কবি সুকান্ত সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

[ ১১০০ ]

# নিবেদন

উপনিষৎ-প্রসঙ্গের পঞ্চম খণ্ড রূপে প্রকাশিত হল কৌষীতকী উপনিষদ্। এটিও আমাদের কেয়াতলা রোডের ধর্মসভায় আলোচিত হয়েছিল। শ্রীমৎ অনির্বাণ শিলং ত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে এলেন ১৯৬৪-র নভেম্বরে। ১৯৬৫-র মে পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে থেকেই উপনিষৎ-প্রসঙ্গের প্রথম খণ্ড ঈশোপনিষদ্ লিখলেন। মে মাসে নরেন্দ্রপুর হৈমবতীতে থাকতে গেলেন। তারপর থেকেই প্রত্যেক রবিবার সকালে কেয়াতলাতে উপনিষদ্ এবং বেদের পাঠ সুরু করে দিলেন। কৌষীতকীর পাঠ ১৮ই জুলাই ১৯৬৫ থেকে শুরু করে ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৫-র মধ্যে শেষ করেছিলেন। তাঁর প্রবচনের চূড়ান্ত কপি আমার অনুলেখনের সঙ্গে মিলিয়ে নারায়ণী দেবী তৈরি করেছিলেন। ১৯৮০-র ফেব্রুয়ারীতে নারায়ণী দেবীর মৃত্যুর পর সেটি আমি ভুবনেশ্বর থেকে নিয়ে আসি। আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হালিসহর থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা আর্যদর্পণে তা বৈশাখ ১৩৮৭ থেকে পৌষ ১৩৯৬ পর্যন্ত ক্রমশ প্রকাশিত হয়। আর্যদর্পণের সুধী সহসম্পাদক শ্রীবিমলচৈতন্য ব্রহ্মচারী সযত্নে এই কষ্টসাধ্য কর্ম সম্পূর্ণ করেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্রীমৎ অনির্বাণের প্রবচনের অনুলেখন অবলম্বনে তৈরি-করা কঠোপ-নিষদের প্রকাশনের পর এই উপনিষদ্‌টি প্রকাশের জন্যও আমরা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম। তাঁরাও সানন্দে সম্মত হলেন। তখন নতুন ভাবে প্রেসকপি তৈরি করা হল শ্রীমতী গৌরী ধর্মপালের তত্ত্বাবধানে। মন্ত্রানুবাদও তিনি নতুন করে করে দিলেন। প্রেসকপি লিখতে সাহায্য করল স্নেহাস্পদ অধ্যাপিকা কৃষ্ণা রায় মহাশয় এবং রোহিণী ও আনন্দ।

কৌষীতকী উপনিষদ্ অনেকটা ব্রাহ্মণগোত্রের বলা যায়। তার ব্রহ্মপুর এবং ব্রহ্মপুরুষের বর্ণনা অদ্ভুত ধরনের। অন্য কোনো উপনিষদে এই জাতীয় সরস বর্ণনা পাওয়া যায় না। নির্গুণ ব্রহ্মের দিকে তাকে টানা অতিশয় দুরূহ মনে করেই বোধহয় শঙ্কর এর ভাষ্য করেননি। কৌষীতকীর এই মূল সুর যাতে সুষ্ঠুভাবে বোঝা যায় তার জন্য আমরা শ্রীমৎ অনির্বাণের বেদমীমাংসা

থেকে কৌষীতকীর সার এই গ্রন্থে যুক্ত করেছি। একই ঋগ্‌বেদের উপনিষদ্ বলে, তথা সৃষ্টিপ্রকরণে এবং প্রতিপাদ্যে মিল থাকার দরুন ঐতরেয়-র সারও এই সঙ্গে দিয়েছি। তাতে সুধী পাঠকদের সুবিধা হবে আশা করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিতের সাগ্রহ সহযোগিতা এবং অধ্যবসায়ের জন্য প্রকাশন ত্বরান্বিত হল। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। জ্ঞানোদয় প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সুদক্ষ কর্মীদের জানাই কৃতজ্ঞতা। বরদা বেদমাতা সবার কল্যাণ করুন। শুভম্ ইতি—

২৪শে আষাঢ় ১৩৭৭ গৌতম ধর্মপাল

৯/২ ফার্ন রোড, কলকাতা ১৯

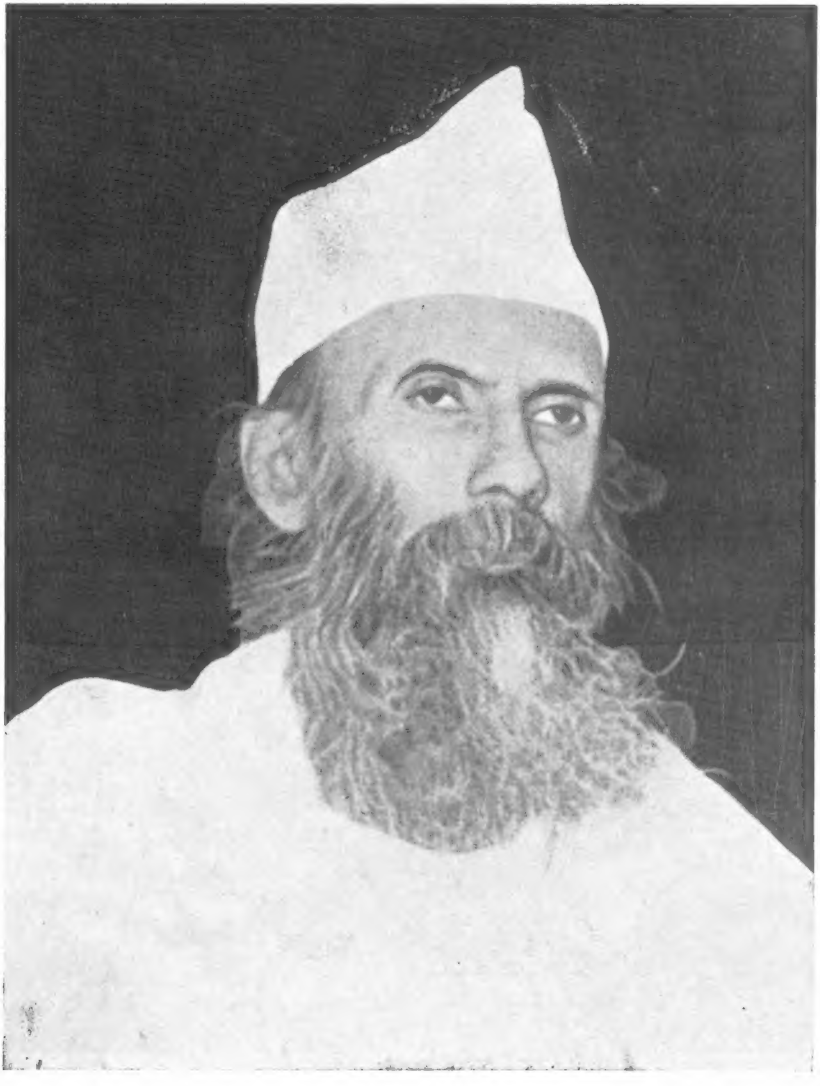

শ্রীমৎ অনির্বাণ

জন্ম : ২৪ আষাঢ় ১৩০৩ তিরোভাব : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫

# গ্রন্থকার পরিচিতি

অনির্বাণ—মরমী বেদভাষ্যকার মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ১৩০৩ সালের (ইং ১৮৯৬) ২৪শে আষাঢ় মৈমনসিংহে জন্ম। পূর্বনাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। পিতা রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীলা দেবী। ঢাকা ও কলকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতা সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে ব্রহ্মচর্য ও ১৯২১ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-নাম শ্রীমৎ নির্বাণানন্দ সরস্বতী। আসামের কোকিলামুখ-স্থিত আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে সুদীর্ঘ বারো বৎসর পরিচালক, ঋষি-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং প্রখ্যাত আর্যদর্পণ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে নিভৃতে সাধনা করেন। আলমোড়ায়, বালক-বয়সে দৃষ্ট জীবনদেবতা হৈমবতী বা বেদময়ী বাকের পূর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তাঁর বাকি জীবন এই সত্যদর্শনেরই বিবৃতি। এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধিকে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে শিলঙে রচনা করেন মহাগ্রন্থ বেদমীমাংসা, যা পরে রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করে।'' শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে উপলব্ধ সত্যের প্রতিফলন দেখে বেদভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ-ভাষ্য রচনাও তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর **Life Divine**-এর অনুবাদকে শ্রীঅরবিন্দ **A living translation** বলে অভিনন্দিত করেন।

১৯৬৪ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন এবং বৈদিক ও অরবিন্দ-সাহিত্য সম্পর্কে নিয়মিত প্রবচন, উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপলব্ধ জীবনসত্যকে প্রকাশ করে চলেন।

বাইরে শীর্ণ তপস্বীমূর্তি, ভেতরে রসাবিষ্ট অনির্বাণ ছিলেন অন্তরে অন্তরে বাউল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রাণপুরুষ। তিনি মনে করতেন, বৈরাগ্য ও প্রেম এই উভয়ের যুগনদ্ধতাই জীবনের মহত্তম শিল্প।

ভারত-বন্দনা রূপে সঙ্কল্পিত তাঁর ভারত-পরিক্রমা ১৯৬৭তে কেদার-বদ্রিনাথে সমাপ্ত হয়। ১৯৭১-এ আকস্মিক পতনজনিত আঘাতের ফলে গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত হন। ঐ অবস্থাতেও বহু স্বদেশী ও বিদেশী অধ্যাত্মপিপাসু ও জ্ঞানার্থীর আশ্রয়স্থল ছিলেন। ১৯৭৮-এর ৩১শে মে পরলোকে প্রয়াণ করেন।

গৌরী ধর্মপাল

# সূচীপত্র


কৌষীতকী সার ... ... ১
শান্তি পাঠ ... ... ১৩

## মূল ও অনুবাদ

প্রথম অধ্যায় ... ... ১৪
দ্বিতীয় অধ্যায় ... ... ২২
তৃতীয় অধ্যায় ... ... ৪২
চতুর্থ অধ্যায় ... ... ৫৪

## ভাষ্য

ভাষ্য ৬৪
প্রথম অধ্যায় ... ... ৬৬
দ্বিতীয় অধ্যায় ... ... ৭৬
তৃতীয় অধ্যায় ... ... ১২৮
চতুর্থ অধ্যায় ... ... ১৪০

# গ্রন্থকার পরিচিতি

অনির্বাণ—মরমী বেদভাষ্যকার মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ১৩০৩ সালের (ইং ১৮৯৬) ২৪শে আষাঢ় মৈমনসিংহে জন্ম। পূর্বনাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। পিতা রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীলা দেবী। ঢাকা ও কলকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতা সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে ব্রহ্মচর্য ও ১৯২১ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-নাম শ্রীমৎ নির্বাণানন্দ সরস্বতী। আসামের কোকিলামুখ-স্থিত আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে সুদীর্ঘ বারো বৎসর পরিচালক, ঋষি-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং প্রখ্যাত আর্যদর্পণ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে নিভৃতে সাধনা করেন। আলমোড়ায়, বালক-বয়সে দৃষ্ট জীবনদেবতা হৈমবতী বা বেদময়ী বাকের পূর্ণ উল্লাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তাঁর বাকি জীবন এই সত্যদর্শনেরই বিবৃতি। এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধিকে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে শিলঙে রচনা করেন মহাগ্রন্থ বেদমীমাংসা, যা পরে রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করে। শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে উপলব্ধ সত্যের প্রতিফলন দেখে বেদভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ-ভাষ্য রচনাও তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর Life Divine-এর অনুবাদকে শ্রীঅরবিন্দ A living translation বলে অভিনন্দিত করেন।

১৯৫৪ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন এবং বৈদিক ও অরবিন্দ-সাহিত্য সম্পর্কে নিয়মিত প্রবচন, উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপলব্ধ জীবনসত্যকে প্রকাশ করে চলেন।

বাইরে শীর্ণ তপস্বীমূর্তি, ভেতরে রসাবিষ্ট অনির্বাণ ছিলেন অন্তরে অন্তরে বাউল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রাণপুরুষ। তিনি মনে করতেন, বৈরাগ্য ও প্রেম এই উভয়ের যুগনদ্ধতাই জীবনের মহত্তম শিল্প।

ভারত-বন্দনা রূপে সঙ্কল্পিত তাঁর ভারত-পরিক্রমা ১৯৬৭তে কেদার-বদ্রিনাথে সমাপ্ত হয়। ১৯৭১-এ আকস্মিক পতনজনিত আঘাতের ফলে গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত হন। ঐ অবস্থাতেও বহু স্বদেশী ও বিদেশী অধ্যাত্মপিপাসু ও জ্ঞানার্থীর আশ্রয়স্থল ছিলেন। ১৯৭৮-এর ৩১শে মে পরলোকে প্রয়াণ করেন।

গৌরী ধর্মপাল

# সূচীপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| কৌষীতকী সার | ... | ... | ১ |
| শান্তি পাঠ | ... | ... | ১৩ |

## মূল ও অনুবাদ

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | ... | ... | ১৪ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | ... | ... | ২২ |
| তৃতীয় অধ্যায় | ... | ... | ৪২ |
| চতুর্থ অধ্যায় | ... | ... | ৫৪ |

## ভাষ্য

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভাষ্য | | | ৬৪ |
| প্রথম অধ্যায় | ... | ... | ৬৬ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | ... | ... | ৯৬ |
| তৃতীয় অধ্যায় | ... | ... | ১২৮ |
| চতুর্থ অধ্যায় | ... | ... | ১৪০ |

# কৌষীতকী-সার

## ( শ্রীমৎ অনির্বাণের বেদমীমাংসা থেকে )

ঋগ্‌বেদের দুটি উপনিষদ্—ঐতরেয় আরণ্যকের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদ্ আর শাঙ্খায়নারণ্যকের অন্তর্গত কৌষীতক্যুপনিষদ্, দুটিই গদ্যে রচিত।

ঐতরেয়োপনিষদের তিনটি অধ্যায়।[১] মূল প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব। 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' এই মহাবাক্যটি এই উপনিষদের অন্তর্গত। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে এটিই সর্বপ্রাচীন উপনিষদ্।[২]

উপনিষদের প্রথম অধ্যায়টিতে আছে সৃষ্টিরহস্যের বর্ণনা। বর্ণনা অবশ্য মরমীয়াদের মত সন্ধাভাষায়। তার সারসংক্ষেপ এই: আত্মা হতেই এই যা-কিছু সবার সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির মূলে আছে আত্মার 'ঈক্ষা' বা সংকল্প-যুক্ত দর্শন। তাইতে প্রথম সৃষ্টি হল 'লোক' বা ভুবনসমূহ। সবার উপরে যে লোক, তার নাম হল 'অম্ভঃ' বা নীহারিকা, আর সবার নীচে 'অপ্‌' বা মহাপ্রাণের সমুদ্র। দুয়ের মাঝে 'মরীচি' বা আলোর ঝিলিমিলি আর 'মর' বা মর্ত্য পৃথিবী। তারপর আত্মা ঐ মহাপ্রাণের সমুদ্র হতে এক পুরুষকে মূর্ত করে তুললেন। সেই পুরুষের বিভিন্ন অবয়বরূপে লোকপাল দেবতারা অভিব্যক্ত হলেন। এই দেবতারা বস্তুত আমাদের ইন্দ্রিয়গোলক ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান-চৈতন্য,[৩] এখানে বর্ণিত হয়েছে বিলোমক্রমে। তারপর সেই দেবতাদের মধ্যে জাগল ক্ষুধা আর তৃষ্ণা, তাঁরা তার তর্পণের জন্যে চাইলেন 'আয়তন' বা আশ্রয়। 'পুরুষ' বা মানুষ হল সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আয়তন, দেবতারা অনুলোমক্রমে তাতে অনুপ্রবিষ্ট হলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সেই আবিষ্ট আয়তনকে আশ্রয় করল। তখন আত্মা প্রাণসমুদ্রকে অভিতপ্ত করে এক 'মূর্তি'র সৃষ্টি করলেন, তা-ই হল অন্ন। পুরুষ মৃত্যুর দ্বারা অধিষ্ঠিত অপানবায়ু দিয়ে সেই অন্নকে গ্রহণ করল। মরলোকে জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেল, আত্মা 'সীমা' বা ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে 'বিদৃতি' নামের দুয়ার দিয়ে আধারে প্রবেশ করলেন ও দুয়ারটি হল 'নান্দন' কিনা আনন্দের হেতু।[৪] এই আবেশের পর আধারে আত্মার তিনটি 'আবসথ' বা অধিষ্ঠানভূমি সৃষ্ট



ব. বি/উপনিষৎ/৮৬-১

হল। তারপর আত্মা জীবযাত্রা যাপন করে ক্রমে আধারে নিজেকে পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মরূপে দর্শন করলেন। দর্শন করলেন ইন্দ্রকেই।[৫]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার তিনটি জন্মের কথা বলা হচ্ছে। তাঁর প্রথম জন্ম পুরুষ দ্বারা স্ত্রীতে নিষিক্ত বীর্য হতে ভ্রূণরূপে। দ্বিতীয় জন্ম স্ত্রীর গর্ভ হতে পৃথিবীতে কুমাররূপে। তৃতীয় জন্ম মৃত্যুর পর উৎক্রান্তির ফলে ঐ স্বর্গলোকে এক আপ্তকাম অমৃতসম্ভূতি—যেমন ঋষি বামদেবের হয়েছিল।[৬]

তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হচ্ছে আত্মার স্বরূপের কথা। আত্মা হতেই জগৎ সৃষ্টি, আত্মা হতেই জীবজন্ম। এই আত্মা তাহলে কি? আত্মা স্বরূপত প্রজ্ঞান, সেই প্রজ্ঞানই আমাদের লৌকিক চেতনার নানা বৃত্তিরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। শুধু অন্তর্জগৎ নয়, বহির্জগতও এই প্রজ্ঞান। প্রজ্ঞান-ই সব কিছুর প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই প্রজ্ঞান দ্বারাই আপ্তকাম অমৃতপদ লাভ করা যায়।[৭]

শাঙ্খায়নারণ্যকের তৃতীয় হতে ষষ্ঠ পর্যন্ত চারিটি অধ্যায় নিয়ে কৌষীতকী উপনিষদ্। প্রতিপাদ্য দেবযান ও পিতৃযাণ, প্রাণবিদ্যা এবং আত্মবিদ্যা।

প্রথম অধ্যায়ে দেবযান ও পিতৃযাণের কথা আছে। অধ্যায়টি আরম্ভ হয়েছে একটি উপাখ্যান দিয়ে। ঋষি আরুণির ছেলে শ্বেতকেতু রাজা চিত্র গাঙ্গ্যায়নির কাছে গেলে পর রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটা নিগূঢ় ( সংবৃতম্ ) তত্ত্ব আছে বিশ্বে, তার আরেকটি পথও আছে, তুমি আমায় সেখানে প্রতিষ্ঠিত করবে?' শ্বেতকেতু এই প্রশ্নের মর্ম বুঝতে না পেরে বাবার কাছে ফিরে এলেন। তারপর বাপ-বেটা দুজনে গিয়ে রাজার কাছ থেকে বিনীত শিষ্যের মত দেবযান পথের ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির রহস্যবিদ্যা অর্জন করলেন।[৮]

রাজা চিত্র তাঁদের যা বললেন, তার মর্ম এই: মৃত্যুর পর সবাই চন্দ্রমাতে যায়। চন্দ্রমা হলেন স্বর্গলোকের দ্বার। তাঁর কাছে গেলে সবাইকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে'? যে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে তাকে তিনি পথ ছেড়ে দেন, যে পারে না তাকে আবার কৃষ্ণপক্ষের সহায়তায় বৃষ্টিধারার সঙ্গে মর্ত্যে পাঠিয়ে দেন। প্রশ্নটির জবাবে ঋতুদের সম্বোধন করে বলতে হবে, 'হে ঋতুগণ, পৃথিবীতে জন্মে বিদ্যা-অবিদ্যার মাঝে দোল খেয়েছি, এখন আমায় অমৃতে নিয়ে যাও। সত্য আর তপস্যার জোরে বলছি, 'আমিই ঋতু, আমিই আর্তব ( ঋতুজাত )।'[৯] চন্দ্রমা আবার

জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে'? সে বলে, 'আমি তুমিই'। তখন চন্দ্রমা তাকে পথ ছেড়ে দেন।

মুক্ত (উপনিষদের ভাষায় 'অতিসৃষ্ট' অর্থাৎ মর্ত্যলোকের আকর্ষণ কেটে যাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে লোকোত্তরের দিকে) আত্মা তখন দেবযানের পথ ধরে যথাক্রমে অগ্নি বায়ু বরুণ ইন্দ্র ও প্রজাপতির লোক পেরিয়ে চলেন ব্রহ্মলোকের দিকে।[১০] ব্রহ্মলোকে আছে 'আর' হ্রদ, 'যেষ্টিহা' মুহূর্ত, 'বিজরা' নদী, 'ইল্য' বৃক্ষ, 'সালজ্য' নগর, 'অপরাজিত' পুরী, 'ইন্দ্র-প্রজাপতি' দ্বারপাল,[১১] 'বিভু' সভা, 'বিচক্ষণ' বেদি, 'অমিতৌজাঃ' পর্যঙ্ক। আর আছেন 'মানসী' আর 'চাক্ষুষী' নামে দুটি প্রিয়া, যাঁরা বিশ্বভুবনের ফুল দিয়ে মালা গাঁথছেন।[১২] তিনি বিজরা নদীর কাছে আসতেই ব্রহ্মা তা জানতে পারেন। তখন পাঁচশ' অপ্সরা ছুটে এসে তাঁকে ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করে।[১৩] তারপর তিনি মনোবলে আরহ্রদ পার হয়ে যান। 'সম্প্রতিবিদ্‌রা' যেখানে এলে পরে ডুবে যায়।[১৪] যেষ্টিহা মুহূর্তগুলি তারপর তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে যায়, তিনি বিজরা নদীও পার হয়ে যান মনোবলে। তখন আর তাঁর পাপ-পুণ্য বলে কিছু থাকে না, তিনি দ্বন্দ্বাতীত হয়ে দেখেন, তাঁর পায়ের তলায় রথচক্রের আবর্তনের মত অহোরাত্রের আবর্তন চলছে।[১৫] তখন থেকেই তাঁর আধারের ব্রাহ্ম-রূপান্তর হতে থাকে। তিনি ক্রমে ক্রমে ইল্য বৃক্ষাদি পার হয়ে অমিতৌজা পর্যঙ্কের কাছে এসে উপস্থিত হন, যার উপর ব্রহ্মা বসে আছেন। এই পর্যঙ্ক হল প্রাণ, আর যে 'বিচক্ষণ' বেদির উপর ওটি বসান, তা হল প্রজ্ঞা। মুক্ত আত্মা ব্রহ্মপর্যঙ্কে আরোহণ করলে ব্রহ্মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে'? তিনি উত্তর দেবেন, 'আমি ঋতু, আমি আর্তব। আমি আকাশ হতে উৎপন্ন। আমি সংবৎসরের তেজ, সর্বভূতের আত্মা। তুমিও সর্বভূতের আত্মা। তুমি যা, আমিও তা।'[১৬] ব্রহ্মা বলেন, 'আমি কে'? তিনি বলবেন, 'তুমি সত্য'। 'সত্য কি'? 'যা দেবতা এবং প্রাণ থেকে আলাদা তা হল সৎ, আর দেবতা এবং প্রাণ হল ত্যম্‌। সব মিলিয়ে এই সবই সত্যম্‌। তুমিই এই সব। প্রাণ মন বাক্‌ চক্ষু শ্রোত্র[১৭] হস্ত পদ উপস্থ শরীর এবং প্রজ্ঞা দ্বারা আমি তোমাকেই পাই।'

চিত্রের বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অধ্যায়ও এখানে শেষ হয়ে গেছে। চিত্রকথিত এই ব্রহ্মবিদ্যার এক নাম 'পর্যঙ্কবিদ্যা'।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছোট ছোট কয়েকটি বিদ্যার উপদেশ আছে। প্রথমে আছে প্রাণবিদ্যা। কৌষীতকি আর পৈঙ্গ্য এই দুজন ঋষি তার প্রবক্তা। দুজনের মতেই প্রাণ ব্রহ্ম। কৌষীতকি বলেন, বাক্ চক্ষু শ্রোত্র এবং মন প্রাণেরই বৃত্তি ; আর পৈঙ্গ্য বলেন, বাক্ হতে চক্ষু, চক্ষু হতে শ্রোত্র, শ্রোত্র হতে মন এবং মন হতে প্রাণ হল অন্তরতর ; অতএব প্রাণই সবার কেন্দ্র। অর্থাৎ প্রাণকে ব্রহ্ম বলে একজন দেখাচ্ছেন উন্মেষের দিক্, আরেক জন নিমেষের দিক্। দুয়েরই মতে প্রাণ-ব্রহ্মকে পেতে হলে অযাচক হতে হবে।[১৮]

এই প্রাণবিদ্যার দুটি প্রয়োগ আছে কামনাসিদ্ধির জন্য—একটির নাম 'একধনাবরোধন' আরেকটি 'দৈবস্মর'। দুটিতেই পূর্ণাহুতিবিধিতে প্রাণাঙ্গ পঞ্চদেবতা এবং প্রজ্ঞার উদ্দেশে হোম করতে হয়। ক্রিয়ার মূলে স্পষ্টতই রয়েছে ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত এবং একাগ্র করে সংকল্পশক্তিকে সুতীব্র করা, যাতে শুধু ইচ্ছার জোরেই অভীষ্ট লাভ হয়, সমস্ত কাম্যকর্মেরই এইটি মূল রীতি। প্রাণ ছাড়া প্রজ্ঞাকেও আহুতি দেওয়ার বিধান থেকে বোঝা যায়, এমনিতর ইষ্টসিদ্ধি প্রজ্ঞাবানেরই হয়। আসল শক্তি হল প্রজ্ঞায়। বৈদিক ভাবনায় তাই ব্রহ্ম বলতে যুগপৎ জ্ঞান এবং শক্তি দুইই বোঝায়। যার জ্ঞান আছে, তারই শক্তি আছে। উপরি-উক্ত অযাচক বৃত্তির সঙ্গে এই ভাবনাটির তুলনা করা যেতে পারে। একটিতে সাধক উদাসীন বা কেবল, আরেকটিতে বিভূতিমান্।

আরেকটি সাধনা হল প্রতর্দনের[১৯] 'সংযমন' বা 'আন্তর অগ্নিহোত্র'। এটিও প্রাণবিদ্যার অন্তর্গত। সাধনাটি এই : মানুষ যখন কথা বলে তখন সে নিশ্বাস নিতে পারে না, যখন সে নিশ্বাস নেয় তখন কথা বলতে পারে না। এই ব্যাপারটিকে ভাবনা করতে হবে, যেন কথা বলবার সময় সে প্রাণকে বাকে আহুতি দিচ্ছে, আবার চুপ করে থাকবার সময় বাক্‌কে প্রাণে আহুতি দিচ্ছে। এই দুটি আহুতিই হল অন্তহীন অমৃত আহুতি, যা মানুষ জেগে বা ঘুমিয়ে সব সময় দিয়ে চলেছে। এই হল সত্যকার অগ্নিহোত্র। এই অগ্নিহোত্র করতেন বলে প্রাচীনেরা আর কর্মময় অগ্নিহোত্র করতেন না।[২০]

তারপর শুষ্কভৃঙ্গারের 'উক্‌থবিদ্যা'। এটিও প্রাণবিদ্যার অন্তর্গত। শুষ্কভৃঙ্গার বলেন : উক্‌থই ব্রহ্ম, ঋক্ যজুঃ সাম এই তিনটিরই পর্যবসান উক্‌থে ; উক্‌থই যজু ; প্রাণই উক্‌থ ; আবার প্রাণই ত্রয়ীবিদ্যার আত্মা।[২১]

তারপর সর্বজিৎ কৌষীতকির ভোরে দুপুরে এবং সন্ধ্যায় আদিত্যের উপাসনা—পাপ দূর করে নির্মল হবার জন্যে।[22]

তারপর প্রাণ সন্তান ও পশুর কল্যাণ কামনা করে কয়েকটি গৃহ্যকর্মের উপদেশ আছে। তারপর আবার একটি প্রাণবিদ্যার উপদেশ। প্রাণের নাম তখন 'দৈবঃ পরিমরঃ' অর্থাৎ যার মাঝে সমস্ত দৈবশক্তির পর্যবসান ঘটে। এ-বিদ্যার দুটি ধারা—একটি অধিদৈবত, আরেকটি অধ্যাত্ম। অধিদৈবত বিবৃতিটি এই : ব্রহ্ম জ্বলে ওঠেন অগ্নিরূপে ; কিন্তু আগুন নিবে গেলে ব্রহ্মও মরে যান। তখন আগুনের তেজ প্রবেশ করে সূর্যে, ব্রহ্ম সূর্য হয়ে জ্বলে ওঠেন। এমনি করে সূর্যের তেজ যায় চন্দ্রে, চন্দ্রের তেজ বিদ্যুতে, বিদ্যুতের তেজ দিক্‌সমূহে অর্থাৎ শূন্যে। কিন্তু প্রত্যেকবার তাদের প্রাণ থেকে যায় বায়ুতে, সেই বায়ু হতেই আবার তাদের আবির্ভাব হয়। সুতরাং বায়ুরূপী প্রাণই সর্বাধার। আবার অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে দেখতে গেলে বাক্ প্রবেশ করে চক্ষুতে, চক্ষু শ্রোত্রে, শ্রোত্র মনে এবং মন প্রাণে ; কিন্তু এদের প্রাণ প্রতিবারই প্রবিষ্ট হয় প্রাণে। সুতরাং প্রাণই সর্বাধার[23], প্রাণ থাকলেই তবে বাক্ চক্ষু শ্রোত্র এবং মনের সার্থকতা, এই প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা অর্থাৎ প্রাণ এবং প্রজ্ঞা একই তত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ।[24] মৃত্যুর পর বাক্ প্রভৃতি প্রাণ-বৃত্তি বায়ুতে প্রবেশ করে আকাশ হয়ে যায়, আর এমনি করে স্বর্লোকে উৎক্রান্ত হয়।[25]

তারপর 'পিতা-পুত্রীয় সম্প্রদান' দিয়ে অধ্যায়টি শেষ হয়েছে। মৃত্যু আসন্ন দেখে পিতা তাঁর ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণের সমস্ত বৃত্তি এবং প্রজ্ঞা পুত্রে নিহিত করেন, পুত্রও তা গ্রহণ করেন। এরপর পিতা যদি ভাল হয়ে ওঠেন, তাহলে তিনি পরিব্রাজক হয়ে বেরিয়ে যাবেন কিংবা যতদিন সংসারে থাকবেন পুত্রের অধীন হয়েই থাকবেন।[26]

তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মবিদ্যার উপদেশ। উপদেষ্টা ইন্দ্র, শ্রোতা দিবোদাসের পুত্র রাজা প্রতর্দন।[27] ইন্দ্র বলছেন, 'আমি প্রাণ'। প্রাণের স্বরূপ হল প্রজ্ঞা। সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি প্রাণেরই আশ্রিত। ঘুমের সময় ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি প্রাণে প্রবেশ করে, আবার জাগ্রদবস্থায় প্রাণ হতেই বেরিয়ে আসে। মৃত্যুর সময়ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি প্রাণে লীন হয়ে যায়, আর প্রাণ তাদের নিয়ে 'উৎক্রমণ' করে। প্রাণ থেকে ইন্দ্রিয়েরা বিষয়কে দোহন করে বাইরে স্থাপন করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাণই বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়।[28]

প্রজ্ঞাই ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে বিষয়ের জ্ঞান জন্মায় এবং তার সঙ্গে জীবের ব্যবহার সিদ্ধ করে।[২৯] প্রজ্ঞা ছাড়া জ্ঞান বা ব্যবহার কোনোটাই সিদ্ধ হতে পারে না। তাই ইন্দ্রিয়বৃত্তির মূলে যে-প্রজ্ঞা তাকেই মানুষের জানতে চেষ্টা করা উচিত। এক প্রজ্ঞাই দশটি প্রজ্ঞামাত্রাতে বিভক্ত হচ্ছে, তারা হল ইন্দ্রিয়বৃত্তি। আবার তারই অনুরূপ রয়েছে দশটি ভূতমাত্রা। প্রজ্ঞামাত্রা আর ভূতমাত্রা অন্যোন্যনির্ভর। ভূতমাত্রা অর্পিত রয়েছে প্রজ্ঞামাত্রায়, প্রজ্ঞামাত্রা অর্পিত রয়েছে প্রাণে। এই প্রাণই আবার প্রজ্ঞাত্মক, আনন্দ, অজর, অমৃত।[৩০]

চতুর্থ অধ্যায়ে এই তত্ত্বেরই উপদেশ আছে রাজা অজাতশত্রু এবং ব্রাহ্মণ দৃপ্তবালাকির উপাখ্যান অবলম্বনে।[৩১] বালাকির অহঙ্কার ছিল, তিনি ব্রহ্মবিৎ। তাই তিনি অজাতশত্রুকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে গিয়েছিলেন। অজাতশত্রু দেখিয়ে দিলেন, বালাকি যা জানেন, তিনি তার চাইতে অনেক বেশী জানেন। বালাকি হার মেনে রাজার কাছেই উপদেশপ্রার্থী হলেন। বালাকির ঔপনিষদ পুরুষের জ্ঞান ছিল জাগ্রৎভূমিকে আশ্রয় করে; অজাতশত্রু তাঁকে দিলেন সুষুপ্তির বিজ্ঞান। সুষুপ্তিতে জাগ্রতের চেতনা আপাতদৃষ্টিতে লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু তবুও চেতনা কোথাও থাকে। থাকে প্রাণে, হিতা নামে যেসব নাড়ী হৃদয় থেকে পুরীঅতের দিকে[৩২] ছড়িয়ে পড়েছে তাদের মধ্যে।[৩৩] এইখানেই আমরা শুদ্ধপ্রাণের সন্ধান পাই। অন্তর্মুখ হয়ে এই প্রাণকে জানাই সত্যকার জ্ঞান।[৩৪]

ঋগ্‌বেদের উপনিষদ্ দুখানিতে আমরা তাহলে মুখ্যত এই কয়টি তত্ত্বের বিবৃতি পাচ্ছি: আত্মা হতে জগৎ সৃষ্টি এবং জীবজন্ম হয়েছে, দেবযানের পথ ধরে চলেছে জীবের ব্রহ্মাভিযান, ব্রহ্মের স্বরূপ প্রজ্ঞা এবং প্রাণ, ব্রহ্ম সুপ্তিজ্ঞানলভ্য। চিত্র প্রতর্দন এবং অজাতশত্রু এই তিনজন ব্রহ্মবিদ্ রাজর্ষির উল্লেখও পাচ্ছি।

---

১। ঐ. আ. ২। ৪-৬।

২। আবার কেউ-কেউ বৃহদারণ্যককে সর্বপ্রাচীন বলে থাকেন।

৩। এইখানে সাংখ্যের ত্রিগুণের অনুরূপ কল্পনা পাওয়া যাচ্ছে।

৪। এইখানে সুষুম্ণপথের উদ্দেশ পাওয়া গেল। ঋক্‌সংহিতায় 'সুম্ন'

অর্থে 'সুখ'; 'সুম্নম্ণ' পরম সুখ। তাই এখানে নান্দন-দুয়ার। তু. যাভির্ (পাবমানীভিঃ) গচ্ছতি নান্দনম্ ঋ. খিল. ৩।১০।৬ (দ্র. ঋ. ৯।৬৭।৩১, ৩২)।

৫। সুতরাং ঋক্‌সংহিতার ইন্দ্র ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই এই আধারে অনুপ্রবিষ্ট। এই হল ঋগ্‌বেদের উপনিষদ বা সারবস্তু।

৬। 'ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে' (২।১।৪) বলতে পুনর্জন্ম বোঝাচ্ছে। কিন্তু এই পুনর্জন্ম ইহলোকে নয়, 'অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে'; নইলে বামদেবের উদাহরণের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না। 'প্রয়ন্নেব'—এখানে 'এব' পদটি লক্ষণীয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লোকান্তরে জন্ম হয়। বৌদ্ধ ভাবনাতেও অনুরূপ কথা আছে, যেমন ইহলোক হতে 'তুষিতস্বর্গে জন্ম।' মৃত্যুক্ষণটিকে সেখানে বলা হয় চ্যুতিক্ষণ। একই আত্মা পুত্ররূপে লোকসন্ততির জন্য নিজের বিভূতির একটি ধারাকে এখানে রেখে আরেকটি ধারায় অমৃতলোকে চলে গেলেন—এই হল অধ্যায়টির তাৎপর্য। বস্তুত প্রচলিত পুনর্জন্মবাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না কিন্তু। তু. ত্রির্বৈ গৃহপতে পুরুষো জায়তে, পিতুরেবাগ্রেঽধিজায়তেঽথ মাতুরথ যজ্ঞাৎ (জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রা. ৩।২।৩)।

৭। কি করে, তার কোনও নির্দেশ এই উপনিষদ্‌টিতে নাই। কঠোপনিষদে প্রজ্ঞানকে আত্মোপলব্ধির সাধন বলা হয়েছে (১।২।২৪)। তার পূর্বের মন্ত্রটিতেই বলা হচ্ছে, এই আত্মাকে প্রবচন মেধা বা শ্রুতি দিয়ে পাওয়া যায় না, তিনি যাঁকে বরণ করেন সে-ই তাঁকে পায়। সুতরাং প্রজ্ঞান এখানে বোধি (spiritual intuition) বা সহজ জ্ঞান। ঋক্‌সংহিতায় 'প্রজানৎ' এই বিশেষণটির ব্যবহার আছে কয়েক জায়গায়। কয়েকটি প্রয়োগ লক্ষণীয়: হৃদা মতিং জ্যোতিরনু প্রজানন্ ৩।২৬।৮; 'প্রজানন্ বিদ্বাঁ উপ যাহি সোমম্' ৩।২৯।১৬, ৩৫।৪(৮); বিশ্বামবিন্দন্ পথ্যামৃতস্য প্রজানন্নিত্তা নমসা বিবেশ ৩।৩১।৫; (পূষা) আ চ পরা চ চরতি প্রজানন্ ১০।১৭।৬; (উষঃ) প্রজানতীব দিশো ন মিনাতি ১।১২৪।৩, ৫।৮০।৪। প্রজ্ঞানের সঙ্গে অগ্নির বিশেষ যোগ দেখতে পাচ্ছি। প্রজ্ঞানই বিদ্যা এবং হৃদয় তার সাধন। দেবোপাসনায় চেতনার যে-বৈশারদ্য, যার ফলে হৃদয়ে তাঁর সাযুজ্য

অনুভূত হয়, তা-ই প্রজ্ঞান। এইজন্যই প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, সংহিতার ভাবনার অনুবৃত্তি উপনিষদে হয়েছে এইভাবে।

৮। এই কাহিনীটি একটু উলটে-পালটে পাওয়া যায় ছান্দোগ্যে (৫।৩-১০) এবং বৃহদারণ্যকে (৬।২)। দুটি উপনিষদেই রাজার নাম প্রবাহণ জৈবলি। তিনি পঞ্চালদের রাজা। আরুণি এবং শ্বেতকেতুর প্রসঙ্গ আবার আছে ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সমস্ত অধ্যায়টি জুড়ে আছে আরুণির 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের' উপদেশ। প্রসিদ্ধ মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি'র উল্লেখও এখানেই আছে। আরুণি এখানে নিঃসন্দেহে ব্রহ্মবিৎ। মৃত্যুর পরের অবস্থার বর্ণনা খুব সংক্ষেপে তিনিও দিয়েছেন (৬।৮।৬), কিন্তু সেখানে পিতৃযাণ-দেবযানের প্রসঙ্গ নাই। মনে হয়, এই তথ্যটির একটি বিবৃতি তিনি সংগ্রহ করেন একজন রাজার কাছে—সে-রাজা একমতে চিত্র, আরেক মতে প্রবাহণ। এই উপলক্ষ্যে উপনিষদে ক্ষত্রিয় প্রভাব নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতদের মাঝে অনেকে খানিকটা কোলাহলের সৃষ্টি করেছেন। অন্তত দেবযান-পিতৃযাণ পথের তত্ত্বটা যে বিশেষ করে ক্ষত্রিয়সম্প্রদায়ের আবিষ্কার নয়, তার প্রমাণ ঋক্‌সংহিতাতেই আছে।

৯। এখানে ঋতুর উল্লেখটি লক্ষণীয়। ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যকে দেবযান ও পিতৃযাণের বিবৃতি দেওয়া হয়েছে মুখ্যত কালকে আশ্রয় করে। ঋক্‌সংহিতায় কালের প্রাচীন সংজ্ঞা হচ্ছে 'ঋতু'। সেখানে একজায়গায় অগ্নিকে বলা হচ্ছে, 'বিদ্বান্ পথ ঋতুশো দেবযানান্'—(১০।৯৮।১১) এখানে দেবযানের সঙ্গে ঋতু বা কালের স্পষ্ট উল্লেখ পাচ্ছি। দেবযানের পথে চলতে হলে কাল বুঝে চলতে হবে। অগ্নি সে-কালের খবর রাখেন। উত্তরায়ণে যজ্ঞ করতে হবে, কেননা তখন দিনের আলো বেড়ে চলে। আর দিনের আলোই প্রত্যক্ষ দেবতা। মরবার সময়ও মানুষ যদি উত্তরায়ণে মরতে পারে, তাহলে চিতার আগুন তাকে দেবযানের পথে নিয়ে যাবে। মন্ত্রটিতে ঋতুর উল্লেখ থেকে এই ভাবনাগুলি উদ্ধার করা যায়। কৌষীতকী উপনিষদেও এইজন্য বিশেষ করে ঋতুকে সম্বোধন করেই লোকান্তরিত জীব কথা বলছে।

১০। তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দমীমাংসায় লোকসংস্থান দেওয়া হয়েছে

এইভাবে : মনুষ্য, মনুষ্যগন্ধর্ব, দেবগন্ধর্ব, পিতৃ, আজানজদেব, কর্মদেব, দেব, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি, ব্রহ্ম।

১১। বৌদ্ধ সাহিত্যে বৈদিক ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের বিজয় দেখাতে গিয়ে শক্র ব্রহ্মা বা ইন্দ্র-প্রজাপতিকে বুদ্ধের তাঁবেদাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদেও দেখি ইন্দ্র-প্রজাপতি ব্রহ্মলাভের দ্বার, সংহিতায় কিন্তু তাঁরা পরমপুরুষ। এই পুরুষের যখন কোনও সংজ্ঞা দেওয়া হয় না, তখন সংহিতায় তিনি শুধু 'পুরুষ' বা 'দেব'; যখন তিনি নিরুপাধিক, তখন 'একং তৎ' বা 'একং সৎ'। সংহিতার এই ভাবগুলিই উপনিষদের ব্রহ্মবাদের ভিত্তি।

১২। এঁরা স্পষ্টত ব্রহ্মশক্তি। তু. কেনোপনিষদের 'হৈমবতী স্ত্রী' (৩।১২)। শক্তিবাদের বীজ পাওয়া যাচ্ছে এখানে।

১৩। তু. ক. ১।১।২৫-২৬। সেখানে যম নচিকেতাকে আত্মবিদ্যা দেবার আগে 'রামাদের' দিয়ে লুব্ধ করতে চাইলে নচিকেতা তাদের প্রত্যাখান করেন। যোগদর্শনে আছে, যোগী মধুমতী ভূমিতে উপস্থিত হলে পর তাঁকে নানা প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়, তিনি বৈরাগ্যবলে সেসব প্রলোভন জয় করেন (পাত. ৩।৫১ ব্যাস-ভাষ্য)।

১৪। যারা শুধু বর্তমানটাই দেখে অর্থাৎ ইহলোককেই জানে, পরলোক বা লোকোত্তরকে জানে না বা মানে না, তারা 'সম্প্রতিবিদ্'। এরাই বলে 'প্রেত্য নাস্তি' (কঠ, ১।১।২০), 'অয়ং লোকো নাস্তি পরঃ' (কঠ ১।২।৬), এরা অহোরাত্রের আবর্তনের মধ্যেই আটকে আছে।

১৫। তু. তৈ. ব্রা. ৩।১১।৭।৪।

১৬। যত্ত্বমসি, সোঽহমস্মি।

১৭। এই কয়টি ব্রহ্মপুরুষ স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলে বিখ্যাত (দ্র. ছা. ৩।১৩)। উপনিষদের অনেক জায়গায় তাদের উল্লেখ আছে। কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাক্, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু ও কর্ণ, তা ছাড়া প্রাণ এবং মন—এই পাঁচটি ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য সাধন। যাজ্ঞবল্ক্য তাদের সঙ্গে যোগ করেছেন হৃদয়কেও (বৃ. ৪।১)।

১৮। তু. 'অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্'—যার কিছুতেই লোভ নাই, সব ভাল-ভাল জিনিষ এসে তার কাছে হাজির হয়। (পাত. ২।৩৭)।

১৯। প্রতর্দন ছিলেন কাশীর রাজা। এই উপনিষদেরই তৃতীয় অধ্যায়ে আবার তাঁকে দেখতে পাব।

২০। এই সাধনাতে আহুতির ভাবনাটি সব সময় অন্তরে জাগিয়ে রাখতে হবে, আবার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিও সব সময় দৃষ্টি রাখতে হবে। এর সঙ্গে তুলনীয় গীতার সংযমাগ্নিতে ইন্দ্রিয়কর্ম এবং প্রাণকর্মের হোম। ( ৪।২৬-২৭ )

২১। উক্থ ( √ বচ্; তু. 'বিদথ' বিদ্যা ) বাকের নামান্তর। ধনুর সঙ্গে তুলনা করায় বোঝা যাচ্ছে উক্থ প্রণব। তু. মুণ্ডক 'প্রণবো ধনুঃ' ২।২।৩। এখানে উক্থ যেমন ঋক্-যজুঃ-সামের সার, প্রণবও তা-ই ( ছা ১।১।৯, ২।২৩।২-৩; তু. ঋচঃ প্রণব উক্থশংসিনাম্ তৈ. স. ৩।২।৯।৬ )। অনুমান করা যেতে পারে, 'বিদথ' যেমন বিদ্যার সাধনা, 'উক্থ'ও তেমনি বাকের সাধনা এবং এই বাক্ প্রণব। শুষ্কভৃঙ্গারের সাধনাটি তাহলে প্রাণকে অবলম্বন করে প্রণবজপের সাধনা।

২২। প্রচলিত ত্রিসন্ধ্যায় সাবিত্র্যোপাসনার সঙ্গে তুলনীয়।

২৩। এটি নিবৃত্তি বা প্রলয়ের সাধনা। বিশ্বের লয় হয় প্রাণে। সুতরাং প্রাণই সর্বযোনি ব্রহ্ম। অধ্যাত্ম বিবৃতিটিতে পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষের উল্লেখ পাচ্ছি। অধিদৈবত বিবৃতির সঙ্গে তু. 'ন তত্র সূর্যো ভাতি' ইত্যাদি ( ক. ২।২।১৫ )।

২৪। তু. ব্রহ্মসূত্রে আকাশ-প্রাণের মিথুন ( ১।১।২২-২৩ )।

২৫। পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যৌঃ, তারপরে তুরীয় লোক হল 'স্বঃ' যা বিষ্ণুর 'পরম ধাম'। এখানে উৎক্রান্তির বিবরণটি খুব সংক্ষিপ্ত এবং প্রাঞ্জল। ব্যষ্টিপ্রাণ সমষ্টিপ্রাণে মিশে শূন্যবৎ হয়ে যায়, আর সেই শূন্য স্বর্জ্যোতিতে ঝলমল করতে থাকে। আলো-ঝলমল আকাশেই ফিরে যাব মৃত্যুর পর। বৈদিক চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদের দিক থেকে জীবনমরণ-রহস্যের এই চাইতে সুন্দর ও বিকল্পহীন সমাধান আর হতে পারে না।

২৬। বৃহদারণ্যকে এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয়েছে 'সংপ্রত্তি' ( <সম্ প্র √দা+তি )। দ্র. ১।৫।১৭।

২৭। এখানেও দেখছি ইন্দ্রই ব্রহ্ম। ঋগ্‌বেদের দুখানি উপনিষদেই

পরমদেবতা হলেন ইন্দ্র, এটা লক্ষণীয়। পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ প্রভাবে ইন্দ্র স্বমহিমা হতে চ্যুত হয়েছেন, তাঁর স্থান অধিকার করেছেন রুদ্র এবং ভগ বা বিষ্ণু। এখানে বলা হচ্ছে, সত্যই ইন্দ্র। ইন্দ্র প্রতর্দনকে বললেন, 'আমাকেই বিশেষ করে জান, এই বিজ্ঞানকেই আমি মানুষের পক্ষে কল্যাণতম বলে মনে করি।' তারপর ইন্দ্রের তিনটি কীর্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ত্রিশীর্ষ বধ, দ্বিতীয়টি অরুর্মুখ যতিদের নেকড়ে বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া (দ্র. ঐ. ব্রা. ৭।২৮, সেখানে যতিদের নাম 'অরুর্মঘ')। এই অরুর্মুখ বা লাল-মুখো যতি কারা? বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা ইন্দ্রদ্বেষী, অতএব দেববাদী নন। তৈত্তিরীয়ারণ্যকে আছে, আরুণকেতুক অগ্নিচয়ন করেছিলেন যে-ঋষিরা তাঁদের মধ্যে এক সম্প্রদায় ঋক্‌সংহিতার মুনিসূক্তের (১০।১৩৬) মুনিদের মতই 'বাতরশন' অর্থাৎ নগ্ন (১।২৪।৪)। তাঁদের সঙ্গে যতিদের কোনও সম্পর্ক আছে কি? তৃতীয় কীর্তিটি হল, দ্যুলোকে প্রহ্লাদীয়দের অন্তরিক্ষে পৌলোমদের এবং পৃথিবীতে কালকঞ্জদের তর্দন (বেধন) করা। তিনটিই অসুরশক্তি, বাসা বেঁধেছে মনোময় প্রাণময় আর অন্নময় লোকে। তু ত্রিপুরনাশ, গ্রন্থিত্রয়ভেদ, সপ্তশতীতে দেবীর তিনটি চরিত্র। ইন্দ্র এখানে আরেকটি কথা বলছেন, 'আমাকে যে জানে, কোনও কর্মের দ্বারাই সে লোকভ্রষ্ট হয় না, চুরি ভ্রূণহত্যা মাতৃবধ বা পিতৃবধ কিছুর দ্বারাই না।' এ সেই বেদান্তের 'ন পুণ্যং ন পাপম্'।

২৮। প্রাণ যদি প্রজ্ঞা হয়, তা হলে জ্ঞান ইন্দ্রিয় এবং বিষয় তিনটিই এই মত অনুসারে একাত্মক হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ রূপজ্ঞান, রূপগ্রাহক চক্ষুরিন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যরূপ তিনটিই তত্ত্বত এক। সাংখ্য মতে তিনটিই যথাক্রমে প্রকৃতির সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক বিকার। প্রাণ বা প্রজ্ঞাই বাইরে বিষয়ের আকারে দেখা দেয়, এই মতের সঙ্গে তুলনীয় বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ।

২৯। এখানে চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ (প্রাণ) জিহ্বা বাক্ হস্ত পদ উপস্থ এবং মন এই নয়টি ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে। ত্বক্ এবং পায়ু বাদ পড়েছে দেখা যায়। শরীরের আলাদা উল্লেখ থেকে মনে হয় ঐটিই ত্বকের জায়গা নিয়েছে।

৩০। একদিকে প্রজ্ঞা বা চিৎ, আরেকদিকে ভূত বা জড়—অস্তিত্বের এই দুটি কোটি। মাত্রাস্পর্শের জগৎটা দেখা দিয়েছে দুয়ের মাঝখানে। অবশ্য প্রজ্ঞাই মূল, কিন্তু তা নিষ্প্রাণ বা নিস্পন্দ নয়। আদি বেদান্তের মূল সূত্রগুলি এখানে পাওয়া যাচ্ছে। জগন্মিথ্যাত্ববাদ বা নির্গুণ ব্রহ্মবাদের কোনও ছায়া এতে পড়েনি।

৩১। উপাখ্যান এবং উপদেশ দুটিরই আরেকটি সংস্করণ পাওয়া যায় বৃহদারণ্যকে (২।১)। এখানে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সাধনসঙ্কেত পাওয়া যায়।

৩২। পুরীতৎ নাড়ীতন্ত্রের (nervous system) প্রাচীন সংজ্ঞা। হিতা নাড়ীর কথা অন্যত্রও আছে। (বৃ. ২।১।১৯, ৪।২।৩, ৩।২০)।

৩৩। নাড়ীগুলিকে বলা হয়েছে খুব সূক্ষ্ম—একটি চুলের হাজার ভাগের এক ভাগ। তাদের মাঝে খুব সূক্ষ্ম রং খেলে। রংগুলি কালো পিঙ্গল লাল পীত এবং শুক্ল। এইখানে নাড়ীবিজ্ঞানের একটি সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। রংগুলিতে তামস হতে শুদ্ধসত্ত্ব পর্যন্ত সুষুপ্তি চেতনার ক্রমবিকাশের একটি ধারার ইঙ্গিত আছে। তু. জৈনদর্শনের 'লেশ্যা'।

৩৪। এইখানে আমরা আদি বেদান্তের আরেকটি সূত্র পেলাম—তত্ত্বজ্ঞানের সত্যকার প্রতিষ্ঠা সুপ্তিতে। প্রাকৃত সুপ্তিতে চিত্তবৃত্তি আপনি নিরুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাতে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। সজ্ঞানে যদি সুপ্তিকে প্রবর্তিত করা যায়, তাহলে তাই হয় যোগীর সমাধি। এখানে তারই ইঙ্গিত। বৃহদারণ্যকের বিবৃতিতে বিষয়টি আরও ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে।

## শান্তিপাঠ

ওঁ বাঙ্‌ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌। আবির্‌ আবীর্‌ ম এধি। বেদস্ত ম আণী স্থঃ। শ্রুতং মে, মা প্রহাসীঃ। অনেনাধী-তেনাহোরাত্রান্‌ সংদধামি। ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি।

তন্‌ মাম্‌ অবতু, তদ্‌ বক্তারম্‌ অবতু। অবতু মাম্‌, অবতু বক্তারম্‌, অবতু বক্তারম্‌।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঁ। বাক্‌ আমার মনে প্রতিষ্ঠিত, মন আমার বাকে প্রতিষ্ঠিত। হে আবিঃ, আমার কাছে আবির্ভূত হও। আমার বেদবিদ্যার কীলক হও। তুমি আমার শ্রুত, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। এই অধিগত বিদ্যার দ্বারা অহোরাত্রদের আমি যুক্ত করছি। ঋতকে আমি বাকে ব্যক্ত করব, সত্যকে বাকে ব্যক্ত করব।

তৎস্বরূপ আমায় আগলে থাকুন, তৎস্বরূপ বক্তাকে আগলে থাকুন। আগলে থাকুন আমায়, আগলে থাকুন বক্তাকে, আগলে থাকুন বক্তাকে।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

---

বিশদ ভাষ্য শ্রীমৎ অনির্বাণের ঐতরেয়োপনিষদে (উপনিষত্‌-প্রসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) দ্রষ্টব্য।

## প্রথম অধ্যায়

চিত্রো হ বৈ গাঙ্গ্যায়নির্ যক্ষ্যমাণ আরুণিং বব্রে। স হ পুত্রং শ্বেতকেতুং প্রজিঘায়, যাজয়-ইতি। তং হ-অভ্যাগতং পপ্রচ্ছ, গৌতমস্য পুত্র, অস্তি সংবৃতং লোকে যস্মিন্ মা ধাস্যসি? অন্যতমো বা-অধ্বা তস্য মা লোকে ধাস্যসি? ইতি। স হ-উবাচ, ন-অহম্ এতদ্ বেদ, হন্ত-আচার্যং পৃচ্ছানি ইতি। স হ পিতরম্ আসাদ্য পপ্রচ্ছ, ইতি-ইতি মাঽপ্রাক্ষীত্, কথং প্রতিব্রবাণি? ইতি। স হ-উবাচ, অহম্ অপি-এতত্-ন বেদ, সদসি-এব বয়ম্ অধীত্য হরামহে, যত্-নঃ পরে দদতি। এহি-উভৌ গমিষ্যাব ইতি। স হ সমিত্-পাণিশ্ চিত্রং গাঙ্গ্যায়নিং প্রতিচক্রমে, উপায়ানি-ইতি। তং হ-উবাচ, ব্রহ্মগ্রাহী[1]-অসি গৌতম, যত্-ন মানম্ উপাগাঃ। এহি ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামি-ইতি ॥ ১ ॥

১। পা. ব্রহ্মার্হোঽসি।

# প্রথম অধ্যায়

গাঙ্গ্য-তনয় চিত্র যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক হয়ে আরুণিকে পুরোহিতরূপে বরণ করেছিলেন। আরুণি তাঁর ছেলে শ্বেতকেতুকে পাঠালেন, 'তুমি যজ্ঞ করাও গিয়ে।' শ্বেতকেতু চিত্রের কাছে এলে চিত্র জিজ্ঞেস করলেন, 'হে গৌতম-পুত্র, জগতে কি এমন কোন গুপ্তস্থান আছে, যেখানে আপনি আমাকে স্থাপন করতে পারেন? বা অন্যতম কোন পথ আছে যার গন্তব্যলোকে আপনি আমাকে স্থাপন করতে পারেন?' শ্বেতকেতু বললেন, 'না, আমার এটি জানা নেই। আচ্ছা, আচার্যকে জিজ্ঞেস করে আসি।' তিনি পিতার কাছে এসে বললেন, 'চিত্র আমাকে এইরকম এইরকম সব জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি কী উত্তর দেব?' আরুণি বললেন, 'আমিও তো জানি না। চল, আমরা ওঁর বাড়ি গিয়ে শিখে এ বিদ্যা আহরণ করে আনি। সবাই তো আমাদের দেয়, (উনি দেবেন না?)। চল, আমরা দুজনে যাই।' আরুণি সমিধ্ হাতে গাঙ্গ্য-তনয় চিত্রের কাছে এলেন, 'আপনার শিষ্য হতে চাই।' তখন চিত্র বললেন, 'গৌতম, তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্যপাত্র, তুমি অভিমানী নও। এস, তোমাকে বুঝিয়ে দিই ॥ ১ ॥

স হ-উবাচ যে বৈ কে চ-অস্মাত্-লোকাত্ প্রযন্তি চন্দ্রমসম্ এব তে সর্বে গচ্ছন্তি। তেষাং প্রাণৈঃ পূর্বপক্ষে-আপ্যায়তে, তান্ অপরপক্ষেণ প্রজনয়তি। এতদ্ বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং যত্-চন্দ্রমাঃ। তং যঃ প্রত্যাহ, তম্ অতিসৃজতে। অথ যো ন প্রত্যাহ, তম্ ইহ বৃষ্টির্ ভূত্বা বর্ষতি। স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা মত্স্যো বা শকুনির্ বা সিংহো বা বরাহো বা পরশ্বা[1] বা শার্দূলো বা পুরুষো বা-অন্যো বা তেষু তেষু স্থানেষু প্রতি-আজায়তে যথাকর্ম যথাবিদ্যম্। তম্ আগতং পৃচ্ছতি, কোঽসি ইতি। তং প্রতিব্রূয়াত্—

বিচক্ষণাদ্ ঋতবো রেত আভৃতং পঞ্চদশাত্ প্রসূতাত্ পিত্র্যাবতঃ।
তন্ মা পুংসি কর্তর্যেরয়ধ্বং পুংসা কর্ত্রা মাতরি মা সিষিঞ্চ॥
স জায়মান উপজায়মানো দ্বাদশ-ত্রয়োদশোপমাসঃ।
দ্বাদশ-ত্রয়োদশেন পিত্রা সং তদ্ বিদেঽহং প্রতি তদ্ বিদেঽহম্॥

তত্-মা ঋতবোঽমৃত্যবে-আভরধ্বম্। তেন সত্যেন তেন তপসা। ঋতুর্ অস্মি। আর্তবোঽস্মি। কোঽসি? ত্বম্ অস্মি ইতি। তম্ অতিসৃজতে॥ ২॥

স এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য-অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি, স বায়ুলোকং, স বরুণলোকং, স ইন্দ্রলোকং, স প্রজাপতিলোকং, স ব্রহ্মলোকম্। তস্য বৈ-এতস্য লোকস্য-আরো হ্রদো, মুহূর্তা যেষ্টিহা, বিজরা নদী, ইল্যো বৃক্ষঃ, সালজ্যং সংস্থানম্, অপরাজিতম্ আয়তনম্, ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ, বিভু প্রমিতং, বিচক্ষণা-আসন্দী, অমিতৌজাঃ পর্যঙ্কঃ, প্রিয়া চ মানসী প্রতিরূপা চ চাক্ষুষী পুষ্পাণি-আবয়তো বৈরাজগানি অম্বাশ্ চ অম্বায়বীশ্ চ-অপ্সরসঃ অম্বা-যা[2] নদ্যঃ। তম্ ইত্থংবিদ্ আগচ্ছতি। তং ব্রহ্ম আহ, অভিধাবত মম যশসা, বিজরাং বৈ-অয়ং নদীং প্রাপত্, ন বৈ-অয়ং জরয়িষ্যতি-ইতি॥ ৩॥

---

১ পরশ্বান্।

২ অম্ব-যাঃ।

তিনি বললেন, 'যে কেউ এই পৃথিবী-লোক থেকে প্রয়াণ করে, তারা সকলে চন্দ্রলোকেই যায়। পূর্ব অর্থাৎ শুক্লপক্ষে চন্দ্রমা তাদের প্রাণের দ্বারা আপূরিত হন। আর কৃষ্ণপক্ষে (আসে যারা) চন্দ্রমা তাদের আবার এখানে জন্ম নেওয়ান। এই যে চন্দ্রমা, ইনিই স্বর্গলোকের দ্বার। যে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাকে তিনি ঊর্ধ্বতর লোকে প্রেরণ করেন, আর যে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, তাকে তিনি বৃষ্টিরূপে এখানে বর্ষণ করেন। সে তখন নিজের কর্ম ও বিদ্যা অনুযায়ী এই পৃথিবীতে কীট বা পতঙ্গ বা মাছ বা পাখি অথবা সিংহ বা বরা বা রামকুত্তা বা বাঘ বা মানুষ কিংবা অন্য কিছু হয়ে সেই সেই যোনিতে জন্ম নেয়। আগত আত্মাকে চন্দ্র জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কে?' প্রত্যুত্তরে তিনি বলবেন, 'হে মহাকাল, আমি সেই সৃষ্টির আবেগ, সর্বদর্শী (আদিত্য) হতে বিচ্ছুরিত হয়ে যা ঘনীভূত হয়েছিল, পিতৃশক্তির আধার পঞ্চদশ কলায় সম্ভূত চন্দ্রমায়। সেখান থেকে আমাকে প্রেরিত করেছিলে পুরুষ-কর্তায়। সেই পুরুষ-কর্তা আমাকে সিঞ্চিত করলেন নির্মাত্রী মাতায়। সেই আমি জন্মালাম, আবার জন্মালাম, বারো-তেরো মাসযুক্ত সংবৎসর হয়ে বারো-তেরো মাসাত্মক পিতার সঙ্গে যুক্ত হলাম, কখনো সেই তত্ত্বকে (সোজাসুজি) সম্যকভাবে জানতে, কখনো বিপরীতভাবে জানতে। তো হে মহাকাল, এবার আমায় ভরে দাও সেই সত্যে, সেই তপস্যায়। আর যেন না মরি। আমি কাল। আমি কালের সন্তান। (আমায় শুধোচ্ছ), তুমি কে? আমি তুমি-ই।' তাঁকে প্রেরণ করেন ঊর্ধ্বতর লোকে ॥ ২ ॥

তিনি এই দেবযানপথ ধরে অগ্নিলোকে আসেন। তারপর তিনি বায়ুলোকে, তিনি আদিত্যলোকে, তিনি বরুণলোকে, তিনি ইন্দ্রলোকে, তিনি প্রজাপতিলোকে, তিনি ব্রহ্মলোকে আসেন। এই লোকে আছে আর হ্রদ, যেষ্টিহা মুহূর্তসমূহ, বিজরা নদী, ইল্যবৃক্ষ, সালজ্য সংস্থান, অপরাজিত আয়তন এবং দুজন দ্বারপাল—ইন্দ্র আর প্রজাপতি। (তার মধ্যে) বিভু সভাস্থান, বিচক্ষণা মঞ্চ, অমিতৌজা পর্যঙ্ক। আর প্রিয়া মানসী ও প্রতিরূপা চাক্ষুষী-যারা বিশ্বকুসুমের মালা গাঁথে। মাতৃস্বরূপা ও মাতৃকামা অপ্সরারা এবং মাতৃগামিনী নদীরা। বিদ্বান আসছেন এগিয়ে। তাঁকে (আসতে দেখে) ব্রহ্ম বলেন, 'ছুটে যাও তোমরা। আমার ঈশনা নিয়ে সে বিজরা নদীতে পৌঁছল। আর কখনো সে জরাগ্রস্ত হবেনা ॥ ৩ ॥

তং পঞ্চশতানি-অপ্সরসাং প্রতিযন্তি। শতং ফলহস্তাঃ। শতম্ আঞ্জন-হস্তাঃ। শতং মাল্যহস্তাঃ। শতং বাসোহস্তাঃ। শতং চূর্ণহস্তাঃ। তং ব্রহ্মালঙ্কারেণ-অলঙ্কুর্বন্তি। স ব্রহ্মালঙ্কারেণ-অলঙ্কৃতো, ব্রহ্ম বিদ্বান্, ব্রহ্ম-অভিপ্রৈতি। স আগচ্ছতি-আরং হ্রদং, তং মনসা-অত্যেতি। তম্ ইত্বা সম্প্রতিবিদো মজ্জন্তি। স আগচ্ছতি মূহূর্তান্ যেষ্টিহান্ তেঽস্মাদ্ অপদ্রবন্তি। স আগচ্ছতি বিজরাং নদীং, তাং মনসা-এব-অত্যেতি। তত্ সুকৃত-দুষ্কৃতে ধুনুতে বা। তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতম্ উপযন্তি-অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্। তদ্ যথা রথেন ধাবয়ন্ রথচক্রে পর্যবেক্ষতে-এবম্ অহোরাত্রে পর্যবেক্ষতে। এবং সুকৃত-দুষ্কৃতে। সর্বাণি চ দ্বন্দ্বানি। স এষ বি-সুকৃতো বি-দুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্ম-এব-অভি-প্র-এতি ॥ ৪ ॥

স আগচ্ছতি-ইল্যং বৃক্ষং, তং ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং, তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি-অপরাজিতম্ আয়তনং, তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি-ইন্দ্র-প্রজাপতী দ্বারগোপৌ, তৌ-অস্মাত্-উপদ্রবতঃ। স আগচ্ছতি বিভু প্রমিতং, তং ব্রহ্মযশঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি বিচক্ষণাম্ আসন্দীম্। বৃহদ্-রথন্তরে সামনী পূর্বৌ পাদৌ। শ্যৈত-নৌধসে চ-অপরৌ পাদৌ। বৈরূপ-বৈরাজে অনূচ্যে। শাক্বর-রৈবতে তিরশ্চী। সা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি। স আগচ্ছতি-অমিতৌজসং পর্যঙ্কম্। স প্রাণঃ। তস্য ভূতং ভবিষ্যত্-চ পূর্বৌ পাদৌ, শ্রীশ্ চ-ইরা চ-অপরৌ। ভদ্র-যজ্ঞাযজ্ঞীয়ে শীর্ষণ্যে। বৃহদ্-রথন্তরে অনূচ্যে। ঋচশ্ চ সামানি চ প্রাচীনাতানম্। যজূংষি তিরশ্চীনানি। সোমাংশব উপস্তরণম্। উদ্গীথ উপশ্রীঃ। শ্রীর্ উপবর্হণম্। তস্মিন্ ব্রহ্ম-আস্তে। তম্ ইত্থংবিত্ পাদেন-এব-অগ্রে-আরোহতি। তং ব্রহ্ম পৃচ্ছতি, কোঽসি ইতি। তং প্রতিব্রূয়াত্ ॥ ৫ ॥

---

১ অথ-বাঃ।

তখন পাঁচশ অপ্সরা তাঁর প্রত্যুদগমন করেন। একশ জন ফল হাতে। একশজন অঞ্জন হাতে। একশ জন মালা হাতে। একশ জন বসন হাতে। একশ জন ( কুঙ্কুমাদি ) চূর্ণ হাতে। তাঁরা ব্রহ্মালঙ্কার দিয়ে তাঁকে অলঙ্কৃত করেন। সেই ব্রহ্মালঙ্কারে ভূষিত হয়ে ব্রহ্মকে জেনে তিনি ব্রহ্মের দিকে এগিয়ে চলেন। তিনি আর হ্রদে এসে পৌছন এবং মনোবলে তা পেরিয়ে যান। এখানে এসে সম্প্রতিবিদ্‌রা ডুবে যান। তারপর তিনি আসেন যেষ্টিহা মুহূর্তদের কাছে। তারা তাঁর কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তিনি আসেন বিজরা নদীর ধারে, মনোবলেই পেরিয়ে যান তাকে। তারপর যেন ঝেড়ে ফেলেন তাঁর পাপপুণ্য। তাঁর প্রিয় জ্ঞাতিরা পায় পুণ্য, অপ্রিয়রা পাপ। যেমন রথ ছুটিয়ে যেতে যেতে রথী পর্যবেক্ষণ করেন রথের চাকা দুটি, তেমনি করে তিনি দেখেন দিন ও রাত্রিকে। তেমনি করেই দেখেন পাপ আর পুণ্যকে আর সমস্ত বিপরীতের যুগলকে। এইভাবে বীতপাপ বীতপুণ্য হয়ে ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মের দিকে চলতে থাকেন তিনি ॥ ৪ ॥

তিনি আসেন ইল্য বৃক্ষের কাছে, তখন তাঁতে ব্রহ্মগন্ধ প্রবেশ করে। তিনি আসেন সালজ্য সংস্থানে, তখন তাঁতে ব্রহ্মরস প্রবেশ করে। তিনি আসেন অপরাজিত আয়তনে, তখন তাঁতে ব্রহ্মতেজ প্রবেশ করে। তিনি আসেন দুই দ্বারপাল ইন্দ্র এবং প্রজাপতির কাছে, তাঁরা তখন সরে দাঁড়ান। তারপর আসেন বিভু সভাস্থানে, তখন ব্রহ্মের ঈশিতা তাঁতে প্রবেশ করে। তিনি আসেন বিচক্ষণা মঞ্চের কাছে। তার সামনের পায়া দুটি বৃহৎ ও রথন্তর সাম, পিছনের পায়া দুটি শ্যৈত ও নৌধস সাম। বৈরূপ ও বৈরাজ সাম ঐ মঞ্চের নিচের দুটি পাটা আর শাকর ও রৈবত সাম হল আড়াআড়ি দুটি পাটা। ঐ মঞ্চই প্রজ্ঞা। তিনি এই প্রজ্ঞার দ্বারাই সম্যক্ দর্শন করেন। তিনি আসেন অমিতৌজা পর্যঙ্কের কাছে। এইটিই প্রাণ। ভূত এবং ভবিষ্যৎ তার সামনের দুটি পায়া। শ্রী এবং ইরা পিছনের দুটি পায়া। ভদ্র এবং যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম দুটি তার উপর-নিচ দুটি শীর্ষ বা প্রান্ত। বৃহৎ ও রথন্তর সাম দুটি আড়াআড়ি প্রান্ত। ঋক্ এবং সাম মন্ত্রেরা তার পূর্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ পট্টিকা আর যজুর্মন্ত্রেরা উত্তর-দক্ষিণের প্রস্থ পট্টিকা। চাঁদের কিরণগুলি তার চাদর। উদগীথ তার তাকিয়া। শ্রী বালিশ। সেখানে বসে আছেন ব্রহ্ম। বিদ্বান প্রথমে এক পা বাড়িয়ে তাতে আরোহণ করেন। ব্রহ্ম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'কে তুমি ?' প্রত্যুত্তরে তিনি বলবেন ॥ ৫ ॥

ঋতুর্ অস্মি। আর্তবোঽস্মি। আকাশাত্-যোনেঃ সম্ভূতঃ। ভার্যায়ৈ রেতঃ। সংবত্সরস্য তেজোভূতস্য-আত্মা। ভূতস্য ভূতস্য-আত্মা। ত্বম্ আত্মাঽসি। যস্ ত্বম্ অসি, সোঽহম্ অস্মি-ইতি। তম্ আহ, কোঽহম্ অস্মি? ইতি। সত্যম্, ইতি ব্রূয়াত্। কিং তদ্ যত্ সত্যম্? ইতি। যদ্ অন্যদ্ দেবেভ্যশ্ চ প্রাণেভ্যশ্ চ তত্ সত্। অথ যদ্ দেবাশ্ চ প্রাণাশ্ চ তত্ ত্যম্। তদ্ একয়া[1] বাচা-অভিব্যাহ্রিয়তে সত্যম্ ইতি। এতাবদ্ ইদং সর্বম্। ইদং সর্বম্ অসি। ইতি-এব এনং তদ্ আহ। তদ্ এতত্-শ্লোকেন-অভ্যুক্তম্ ॥ ৬ ॥

যজূদরঃ সামশিরা অসাব্ ঋঙ্মূর্তির্ অব্যয়ঃ।

স ব্রহ্মেতি বিজ্ঞেয় ঋষির্ ব্রহ্মময়ো মহান্॥ ইতি। তম্ আহ, কেন মে পৌংস্নানি নামানি-আপ্নোষি? ইতি। প্রাণেন, ইতি ব্রূয়াত্। কেন স্ত্রী-নামানি? ইতি। বাচা, ইতি। কেন নপুংসক-নামানি? ইতি। মনসা ইতি। কেন গন্ধান্? ইতি। ঘ্রাণেন, ইতি ব্রূয়াত্। কেন রূপাণি? ইতি। চক্ষুষা, ইতি। কেন শব্দান্? ইতি। শ্রোত্রেণ, ইতি। কেন অন্নরসান্? ইতি। জিহ্বয়া, ইতি। কেন কর্মাণি? ইতি। হস্তাভ্যাম্, ইতি। কেন সুখ-দুঃখে? ইতি। শরীরেণ, ইতি। কেন আনন্দং রতিং প্রজাতিম্? ইতি। উপস্থেন, ইতি। কেন ইত্যা? ইতি। পাদাভ্যাম্, ইতি। কেন ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামান্? ইতি। প্রজ্ঞয়া-এব, ইতি প্রব্রূয়াত্। তম্ আহ, আপো বৈ খলু মে লোকোঽয়ং তে লোক ইতি। সা যা ব্রহ্মণো জিতির্, যা ব্যষ্টিস্, তাং জিতিং জয়তি, তাং ব্যষ্টিং ব্যশ্নুতে য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৭ ॥

ইতি কৌষীতক্যুপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ

---

১ এতয়া।

'আমি কাল। আমি কালের সন্তান। আকাশ যোনি থেকে জন্মেছি। ভার্যার জন্য আমি রেতঃ। আমি তেজোভূত সংবৎসরের আত্মা। আমি আত্মা ভূতে ভূতে। তুমি আত্মা। যা তুমি, তা-ই আমি।' ব্রহ্ম তাকে বলেন, 'আমি কে?' তিনি বলবেন, 'সত্য'। 'কী সেই সত্য?' 'যা দেবতাদের থেকে এবং প্রাণসমূহ থেকে আলাদা, তা সৎ। আর যা দেবগণ এবং প্রাণসমূহ, তা ত্যম্। এই দুটিকে এক কথায় বলা হচ্ছে—সত্যম্। এই যা কিছু সব এর মধ্যে পড়ে। তুমিই এই সব। এই কথা বলেন তিনি তাঁকে। এটি একটি শ্লোকে বলা হয়েছে ॥ ৬ ॥

যজুঃ যাঁর উদর, সাম যাঁর শির, ঋক্ যাঁর মূর্তি, তিনি অব্যয়। তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জানবে। তিনি ব্রহ্ম (শক্তি) ময় মহান্ ঋষি।

ব্রহ্ম তাঁকে বলেন, আমার পুং-নামগুলি পেলে কি করে? তিনি বলবেন, প্রাণ দিয়ে। স্ত্রী নামগুলি? বাক্ দিয়ে। নপুংসক নামগুলি? মন দিয়ে। গন্ধগুলি? বলবেন, ঘ্রাণ দিয়ে। রূপগুলি? চোখ দিয়ে। শব্দগুলি? কান দিয়ে। অন্নরসগুলি? জিভ দিয়ে। কর্মগুলি? হাত দিয়ে। সুখ দুঃখ? শরীর দিয়ে। আনন্দ, রতি, প্রজাতি? উপস্থ দিয়ে। গতি? পা দিয়ে। ধী, বিজ্ঞাতব্য, কামনাগুলি? বলবেন, প্রজ্ঞা দিয়ে। তখন ব্রহ্ম বলেন, জলময় (প্রাণময়) আমার এই লোক এখন তোমার লোক। ব্রহ্মের যে জয় এবং যে ব্যাপ্তি, সেই জয় তিনি লাভ করেন, সেই ব্যাপ্তিতে তিনি ব্যাপ্ত হন, যিনি এইভাবে জানেন, যিনি এইভাবে জানেন ॥ ৭ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

# দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাণো ব্রহ্ম ইতি হ স্ম-আহ কৌষীতকিঃ। তস্য হ বৈ-এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো মনো দূতং, চক্ষুর্ গোপ্তৃ, শ্রোত্রং সংশ্রাবয়িতৃ, বাক্ পরিবেষ্ট্রী। স যো হ বৈ-এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো মনো দূতং বেদ, দূতবান্ ভবতি। যশ্ চক্ষুর্ গোপ্তৃ, গোপ্তৃমান্ ভবতি। যঃ শ্রোত্রং সংশ্রাবয়িতৃ, সংশ্রাবয়িতৃমান্ ভবতি। যো বাচং পরিবেষ্ট্রীং, পরিবেষ্ট্রীমান্ ভবতি। তস্মৈ বৈ-এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণে-এতাঃ সর্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি। এবং হ-এব-অস্মৈ সর্বাণি ভূতানি-অযাচমানায়-এব বলিং হরন্তি য এবং বেদ। তস্য-উপনিষদ্, ন যাচেত্-ইতি। তত্-যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বা-অলব্ধা-উপবিশেত্,-ন-অহম্ অতো দত্তম্ অশ্নীয়াম্ ইতি, তে-এব-এনম্ উপমন্ত্রয়ন্তে যে পুরস্তাত্ প্রত্যাচক্ষীরন্-ন্, এষ ধর্মোঽযাচতো ভবতি। অন্যতস্ তু-এব-এনম্ উপমন্ত্রয়ন্তে, দদাম তে-ইতি ॥ ১ ॥

প্রাণো ব্রহ্ম-ইতি হ স্ম-আহ পৈঙ্গ্যঃ। তস্য হ বৈ-এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো বাক্ পরস্তাত্-চক্ষুর্-আরুন্ধে, চক্ষুঃ পরস্তাত্-শ্রোত্রম্ আরুন্ধে, শ্রোত্রং পরস্তাত্-মন আরুন্ধে, মনঃ পরস্তাত্ প্রাণ আরুন্ধে। তস্মৈ বৈ-এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণে-এতাঃ সর্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি। এবং হ-এব-অস্মৈ সর্বাণি ভূতানি-অযাচমানায় বলিং হরন্তি য এবং বেদ। তস্য-উপনিষত্-ন যাচেত্-ইতি। তত্-যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বা-অলব্ধা-উপবিশেত্-ন-অহম্-অতো দত্তম্ অশ্নীয়াম্ ইতি, তে-এব-এনম্ উপমন্ত্রয়ন্তে যে পুরস্তাত্ প্রত্যাচক্ষীরন্-ন্, এষ ধর্মোঽযাচতো ভবতি। অন্যতস্ তু-এব-এনম্ উপমন্ত্রয়ন্তে, দদাম তে-ইতি ॥ ২ ॥

# দ্বিতীয় অধ্যায়

কৌষীতকি বলেন, প্রাণ-ই ব্রহ্ম। এই প্রাণব্রহ্মের দূত হল মন, রক্ষক হল চক্ষু, কর্ণ হল ঘোষক, বাক্ হল পরিচারিকা। যিনি মনকে এই প্রাণ-ব্রহ্মের দূত বলে জানেন, তিনি দূত পান। যিনি চক্ষুকে এঁর রক্ষক বলে জানেন, তিনি রক্ষক পান। যিনি কর্ণকে এঁর ঘোষক বলে জানেন, তিনি ঘোষক পান। যিনি বাক্‌কে এঁর পরিচারিকা বলে জানেন, তিনি পরি-চারিকা পান। এই প্রাণব্রহ্মের জন্যে এই সমস্ত দেবতা ( মন, চক্ষু, কর্ণ ও বাক্ ) অযাচিতভাবে বলি হরণ করেন অর্থাৎ নজরানা আনেন। যিনি তা জানেন, তাঁর জন্যেও সমস্ত প্রাণী না চাইতেই বলি হরণ করে। তাঁর ব্রত হল, কিছু চেও না। সে কেমন? না, কোন লোক গ্রামে ভিক্ষা না পেয়ে 'এদের দেওয়া কিছুই খাব না' বলে বসে রইল, তখন যারা তাকে আগে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারাই তাকে সাধাসাধি করতে থাকে। এই হল অযাচকের ধর্ম। অন্যেরাই তাকে পীড়াপীড়ি করবে, 'তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন' ॥ ১ ॥

পৈঙ্গ্য বলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। এই প্রাণব্রহ্মের বাক্‌কে পেরিয়ে রয়েছে চক্ষু, চক্ষুকে পেরিয়ে রয়েছে কর্ণ, কর্ণকে পেরিয়ে রয়েছে মন, মনকে পেরিয়ে রয়েছে প্রাণ। সেই প্রাণব্রহ্মের জন্যে এই সমস্ত দেবতারা অযাচিতভাবে বলি হরণ করেন অর্থাৎ নজরানা আনেন। যিনি তা জানেন, তাঁর জন্যেও সমস্ত প্রাণী না চাইতেই বলি হরণ করে। তাঁর ব্রত হল, 'কিছু চেও না'। সে কেমন? না, কোন লোক গ্রামে ভিক্ষা না পেয়ে 'এদের দেওয়া কিছুই খাব না' বলে বসে রইল, তখন যারা তাকে আগে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারাই তাকে সাধাসাধি করতে থাকে। এই হল অযাচকের ধর্ম। অন্যেরাই তাকে পীড়াপীড়ি করবে, 'তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন' ॥ ২ ॥

অথ-অত একধনাবরোধনম্। যত্-একধনম্ অভিধ্যায়াত্, পৌর্ণমাস্যাং বা অমাবস্যায়াং বা শুদ্ধপক্ষে বা পুণ্যে নক্ষত্রে এতেষাম্ একস্মিন্ পর্বণি-অগ্নিম্ উপসমাধায় পরিসমূহ্য পরিস্তীর্য পর্যুক্ষ্য উত্পূয় দক্ষিণং জানু-আচ্য স্রুবেন বা চমসেন বা কংসেন বা-এতা আজ্যাহুতীর্ জুহোতি—

বাঙ্ নাম দেবতা-অবরোধিনী, সা মেঽমুষ্মাত্-ইদম্ অবরুন্ধ্যাত্, তস্যৈ স্বাহা।

প্রাণো নাম দেবতা-অবরোধিনী, সা মেঽমুষ্মাত্-ইদম্ অবরুন্ধ্যাত্, তস্যৈ স্বাহা।

চক্ষুর্ নাম দেবতা-অবরোধিনী, সা মেঽমুষ্মাত্-ইদম্ অবরুন্ধ্যাত্, তস্যৈ স্বাহা।

শ্রোত্রং নাম দেবতা-অবরোধিনী, সা মেঽমুষ্মাত্-ইদম্ অবরুন্ধ্যাত্, তস্যৈ স্বাহা।

মনো নাম দেবতা-অবরোধিনী, সা মেঽমুষ্মাত্-ইদম্ অবরুন্ধ্যাত্, তস্যৈ স্বাহা।

প্রজ্ঞা নাম দেবতা-অবরোধিনী, সা মেঽমুষ্মাত্-ইদম্ অবরুন্ধ্যাত্, তস্যৈ স্বাহা।

ইতি। অথ ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায়,-আজ্যলেপেন-অঙ্গানি-অনুবিমৃজ্য, বাচং-যমোঽভিপ্রব্রজ্য-অর্থং ব্রূয়াত্, দূতং বা প্রহিণুয়াত্। লভতে হ-এব ॥ ৩ ॥

এবার একধন-প্রাপ্তি। যদি কেউ একধন পেতে বিশেষভাবে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথিতে কিংবা শুক্লপক্ষে বা পুণ্য-নক্ষত্রে অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করে, যজ্ঞগৃহের মেঝে পরিষ্কার করে কুশ বা দূর্বা বিছিয়ে জল ছিটিয়ে ঘি গলিয়ে ডান হাঁটু গেড়ে স্রুব ( খয়ের কাঠের চামচ বিশেষ ) বা চমস বা কাঁসায় করে ঘৃতাহুতি দেবেন—

বাক্ নামক দেবতা অভীষ্টদায়িনী, তিনি আমার জন্যে অমুকের থেকে
এইটি আনুন, তাঁকে স্বাহা।

প্রাণ নামক দেবতা অভীষ্টদায়িনী, তিনি আমার জন্যে অমুকের থেকে
এইটি আনুন, তাঁকে স্বাহা।

চক্ষু নামক দেবতা অভীষ্টদায়িনী, তিনি আমার জন্যে অমুকের থেকে
এইটি আনুন, তাঁকে স্বাহা।

কর্ণ নামক দেবতা অভীষ্টদায়িনী, তিনি আমার জন্যে অমুকের থেকে
এইটি আনুন, তাঁকে স্বাহা।

মন নামক দেবতা অভীষ্টদায়িনী, তিনি আমার জন্যে অমুকের থেকে
এইটি আনুন, তাঁকে স্বাহা।

প্রজ্ঞা নামক দেবতা অভীষ্টদায়িনী, তিনি আমার জন্যে অমুকের থেকে
এইটি আনুন, তাঁকে স্বাহা।

এরপর তিনি ধূমগন্ধ শুঁকে, যজ্ঞের ঘি সারা গায়ে মেখে, বাক্‌সংযম করে, দ্রব্যাধিকারীর কাছে গিয়ে নিজের বাসনা বলবেন অথবা দূত পাঠাবেন। পাবেন-ই-পাবেন ॥ ৩ ॥

অথ-অতো দৈবঃ স্মরঃ। যস্য প্রিয়ো বুভূষেত্-যস্যৈ বা, যেষাং বা, যাসাং বা-এতেষাম্ এব-একস্মিন্ পর্বণি-এতয়া-এব-আবৃতা-এতা আজ্যাহুতীর্ জুহোতি—

বাচং তে ময়ি জুহোমি অসৌ, স্বাহা।
প্রাণং তে ময়ি জুহোমি অসৌ, স্বাহা।
চক্ষুঃ- তে ময়ি জুহোমি অসৌ, স্বাহা।
শ্রোত্রং তে ময়ি জুহোমি অসৌ, স্বাহা।
মনস্ তে ময়ি জুহোমি অসৌ, স্বাহা।
প্রজ্ঞাং তে ময়ি জুহোমি অসৌ, স্বাহা। ইতি।

অথ ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায়-আজ্যলেপেন-অঙ্গানি-অনুবিমৃজ্য, বাচংযমোঽভি-প্রবৃজ্য সংস্পর্শং জিগমিষেত্-, অপিবাতাত্[১] বা তিষ্ঠেত্ সম্ভাষমাণঃ। প্রিয়ো হ-এব ভবতি। স্মরন্তি হ-এব-অস্য ॥ ৪ ॥

অথ-অতঃ সংযমনং প্রাতর্দনম্, আন্তরম্ অগ্নিহোত্রম্ ইতি চ-আচক্ষতে। যাবত্-বৈ পুরুষো ভাষতে, ন তাবত্ প্রাণিতুং শক্নোতি, প্রাণং তদা বাচি জুহোতি। যাবত্-বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি, ন তাবত্-ভাষিতুং শক্নোতি, বাচং তদা প্রাণে জুহোতি। এতে অনন্তে অমৃতে আহুতী-জাগ্রত্-চ স্বপন্-চ সন্ততং জুহোতি। অথ যা অন্যা আহুতয়োঽন্তবত্যস্ তা কর্মময্যো হি ভবন্তি। এতত্-হ বৈ পূর্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রুঃ ॥ ৫ ॥

---

১ √বাত চুরাদি, অর্থ সুখ এবং সেবন, সায়ণের মতে গতি এবং সুখসেবন। অপি বাতয়ামসি ঋ ১।১২৮।৮ সা. অর্থ করেছেন অা পরিতোষং সেবামহে। লেট্ আট্-আগমে অপিবাতাত্। অন্বয় কিছুটা ক্লিষ্ট। শতৃ ক্রিয়াবিশেষণে অপিবাতয়ত্ বা বিশেষণে অপিবাতয়ন্ করলে অন্বয় সহজ হয়।

এবার দৈবস্মর। যে-পুরুষ যে-নারী যে-পুরুষদের বা যে-নারীদের কেউ প্রিয় হতে চান, তিনি পূর্বোক্ত যে কোন পুণ্যদিনে অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করে আগের মতই ঘৃতাহুতি দেবেন—

তোমার বাক্য আমাতে আহুতি দিচ্ছি অমুক, স্বাহা।

তোমার প্রাণ আমাতে আহুতি দিচ্ছি অমুক, স্বাহা।

তোমার চক্ষু আমাতে আহুতি দিচ্ছি অমুক, স্বাহা।

তোমার কর্ণ আমাতে আহুতি দিচ্ছি অমুক, স্বাহা।

তোমার মন আমাতে আহুতি দিচ্ছি অমুক, স্বাহা।

তোমার প্রজ্ঞা আমাতে আহুতি দিচ্ছি অমুক, স্বাহা।

এরপর ধূমগন্ধ শুঁকে, যজ্ঞের ঘি সারা গায়ে মেখে, বাক্‌সংযম করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ( বা ব্যক্তিদের ) কাছে গিয়ে তাঁর ( তাঁদের ) সংস্পর্শ পাবার চেষ্টা করবেন বা বাক্যালাপে তুষ্ট করবেন। প্রিয় হবেন-ই হবেন। তারা এঁর কথা মনে করবেই করবে ॥ ৪ ॥

এবার প্রতর্দন-প্রবর্তিত সংযমন বিদ্যা। একে আন্তর অগ্নিহোত্রও বলে। মানুষ যখন কথা বলে, তখন দম নিতে পারে না। সে তখন প্রাণকে বাকে আহুতি দেয়। আবার যখন দম নেয়, তখন কথা বলতে পারে না। তখন সে বাক্‌কে প্রাণে আহুতি দেয়। জেগে বা ঘুমিয়ে মানুষ এই দুটি অনন্ত অমৃত আহুতি দিয়ে অনবরত হোম করে চলেছে। অন্য সব আহুতি কর্মময়, তাদের শেষ আছে। তাই আগে বিদ্বানরা অগ্নিহোত্র হোম করতেন না ॥ ৫ ॥

উক্থং ব্রহ্ম-ইতি হ স্ম-আহ শুষ্কভৃঙ্গারঃ। তত্-ঋক্-ইতি-উপাসীত। সর্বাণি হ-অস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায়-অভ্যর্চন্তে। তত্-যজুর্ ইতি-উপাসীত। সর্বাণি-হ-অস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যুজ্যন্তে। তত্ সাম-ইতি উপাসীত। সর্বাণি-হ-অস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় সন্নমন্তে। তত্-শ্রীর্-ইতি-উপাসীত। তত্-যশ ইতি-উপাসীত। তত্-তেজ ইতি-উপাসীত। তত্-যথা-এতত্-শ্রীমত্তমং যশস্বিতমং তেজস্বিতমম্ ইতি শস্ত্রেষু ভবতি-এবং হ-এব স সর্বেষু ভূতেষু শ্রীমত্তমো যশস্বিতমস্ তেজস্বিতমো ভবতি, য এবং বেদ। তম্ এতম্ ঐষ্টিকং[1] কর্মময়ম্ আত্মানম্ অধ্বর্যুঃ সংস্করোতি। তস্মিন্ যজুর্ময়ং প্রবয়তি। যজুর্ময়ে-ঋঙ্ময়ং হোতা, ঋঙ্ময়ে সামময়ম্ উদ্গাতা। স এষ সর্বস্যৈ ত্রয্যৈ বিদ্যায়ৈ-আত্মা। এষ উ এব-এতত্-ইন্দ্রস্য-আত্মা-ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬ ॥

অথ-অতঃ সর্বজিতঃ কৌষীতকেস্ ত্রীণি-উপাসনানি ভবন্তি। সর্বজিত্-হ স্ম কৌষীতকির্ যজ্ঞোপবীতং কৃত্বা-আচম্য ত্রিঃ প্রসিচ্য-উদপাত্রম্ উদ্যন্তম্ আদিত্যম্ উপতিষ্ঠতে—বর্গোঽসি, পাপ্মানং মে বৃঙ্গ্ধি,-ইতি। এতয়া-এব-আবৃতা মধ্যে সন্তম্—উদ্বর্গোঽসি, পাপ্মানং মে-উদ্বৃঙ্গ্ধি,-ইতি। এতয়ৈবাবৃতা-অস্তং যন্তং—সংবর্গোঽসি, পাপ্মানং মে সংবৃঙ্গ্ধি, ইতি। তত্-যত্-অহোরাত্রাভ্যাং পাপং করোতি[2] সং তত্-বৃঙ্ক্তে। তথো এব-এবং-বিদ্বান্ এতয়ৈবাবৃতা-আদিত্যম্ উপতিষ্ঠতে, যত্-অহোরাত্রাভ্যাং পাপং করোতি সং তত্-বৃঙ্ক্তে ॥ ৭ ॥

---

১ ঐষ্টকম্ (ইষ্টকা-সম্বন্ধী)।

২ অকরোত্।

শুষ্কভৃঙ্গার বলেন, উক্থই ব্রহ্ম। তাঁকে ঋক্‌রূপে উপাসনা করবে। যিনি তা করেন, শ্রেষ্ঠ বলে সর্বভূত তাঁকে অর্চনা করে। তাঁকে যজুঃ রূপে উপাসনা করবে। যিনি তা করেন, শ্রেষ্ঠ বলে সর্বভূত তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়। তাঁকে সামরূপে উপাসনা করবে। যিনি তা করেন, শ্রেষ্ঠ বলে তাঁর উদ্দেশে সম্যক্ রূপে নত হয় সর্বভূত। তাঁকে শ্রী রূপে উপাসনা করবে। তাঁকে যশ রূপে উপাসনা করবে। তাঁকে তেজ রূপে উপাসনা করবে। এই উক্থ যেমন শস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রীমত্‌-তম, যশস্বিতম এবং তেজস্বিতম, তেমনি যিনি তা জানেন তিনিও সর্বভূতের মধ্যে শ্রীমত্তম যশস্বিতম এবং তেজস্বিতম হন। সেই যজ্ঞসম্বন্ধী কর্মময় আত্মাকে ( আধারকে, যজমানকে ) অধ্বর্যু সংস্কার করেন, সেই আত্মাতে যজুর্ময় আত্মাকে বুনে দেন। হোতা সেই যজুর্ময় আত্মাতে ঋঙ্ময় আত্মাকে, এবং উদ্‌গাতা সেই ঋঙ্ময় আত্মাতে সামময় আত্মাকে বুনে দেন। সেই প্রাণই সমস্ত ত্রয়ী-বিদ্যার আত্মা। যিনি তা জানেন, তিনি ইন্দ্রের আত্মা হন ॥ ৬ ॥

এবার সর্বজিৎ কৌষীতকির তিনটি উপাসনা। সর্বজিৎ কৌষীতকি যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, আচমন করে, তিনবার জলপাত্র থেকে জল ছিটিয়ে উদীয়মান আদিত্যকে নমস্কার করেন , তুমি বর্গ, আমার পাপ 'বর্জন' কর। ঠিক এই একইভাবে মাঝ-আকাশের সূর্যকে—তুমি উদ্বর্গ, উন্মূল কর আমার পাপ। ঠিক এই একই ভাবে অস্তগামী সূর্যকে—তুমি সংবর্গ, আমার পাপ সম্পূর্ণ বিনাশ কর। এইভাবে সারা দিনে রাতে যে পাপ করেন, তা সম্পূর্ণ বিনাশ করেন। এটি জেনে যিনি এই একইভাবে সূর্যের উপাসনা করেন, তিনিও সারা দিনে রাতে যে পাপ করেন, তা সম্পূর্ণ বিনাশ করেন ॥ ৭ ॥

অথ মাসি মাসি-অমাবাস্যায়াং বৃত্তায়াং পশ্চাৎ চন্দ্রমসং দৃশ্যমানম্ উপতিষ্ঠেত-এতয়ৈবাবৃতা, হরিততৃণে প্রত্যস্যতি[১]—

যন্ মে সুসীমং[২] হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্।
তেনামৃতত্বস্যেশানঃ[৩] মাঽহং পুত্রম্ অঘং রুদম্॥

ইতি। ন হি-অস্মাৎ পূর্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতি-ইতি নু জাতপুত্রস্য। অথ-অজাতপুত্রস্য—আপ্যায়স্ব সম্ এতু তে, সং তে পয়াংসি সম্ উ যন্তু বাজাঃ, যম্ আদিত্যা অংশুম্ আপ্যায়য়ন্তি, ইতি-এতাস্ তিস্র ঋচো জপিত্বা, মাঽস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভির্ আপ্যায়য়িষ্ঠাঃ, যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্ তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভির্ আপ্যায়য়স্ব-ইতি, ঐন্দ্রীম্ আবৃতম্ আবর্তে,-আদিত্যস্য-আবৃতম্ অন্বাবর্তে-ইতি দক্ষিণং বাহুম্ অন্বাবর্ততে ॥ ৮॥

অথ পৌর্ণমাস্যাং পুরস্তাৎ-চন্দ্রমসং দৃশ্যমানম্ উপতিষ্ঠেত-এতয়া এব আবৃতা—সোমো রাজাঽসি বিচক্ষণঃ পঞ্চমুখোঽসি প্রজাপতিঃ। ব্রাহ্মণস্ তে-একং মুখং, তেন মুখেন রাজ্ঞোঽত্সি, তেন মুখেন মাম্ অন্নাদং কুরু। রাজা তে-একং মুখং, তেন মুখেন বিশোঽত্সি, তেন মুখেন মাম্ অন্নাদং কুরু। শ্যেনস্ তে-একং মুখং, তেন মুখেন পক্ষিণোঽত্সি, তেন মুখেন মাম্ অন্নাদং কুরু। অগ্নিঃ-তে-একং মুখং, তেন-ইমং লোকম্ অত্সি, তেন মুখেন মাম্ অন্নাদং কুরু। ত্বয়ি পঞ্চমং মুখং, তেন মুখেন সর্বাণি ভূতানি-অত্সি, তেন মুখেন মাম্ অন্নাদং কুরু। মাঽস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভির্ অবক্ষেষ্ঠাঃ।[৪] যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি, যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্ তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভির্ অবক্ষীয়স্ব[৫], ইতি, দৈবীম্ আবৃতম্ আবর্তে-, আদিত্যস্য-আবৃতম্ অন্বাবর্তে-ইতি দক্ষিণং বাহুম্ অন্বাবর্ততে ॥ ৯ ॥

অথ সংবেশ্যন্ জায়ায়ৈ হৃদয়ম্ অভিমৃশেৎ—

যৎ তে সুসীমে হৃদয়ে হিতম্[৬] অন্তঃ প্রজাপতৌ।
মন্যেঽহং মাং তদ্-বিদ্বাংসং মা ত্বং পৌত্রম্ অঘং নিগাঃ।

ইতি। ন হি অস্যাঃ পূর্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতি- ইতি ॥ ১০ ॥

১ বা প্রত্যস্যতি।

২ সুষম্।

৩ মন্যেঽহং মাং তদ্বিদ্বাংসম্।

৪ অপক্ষেষ্ঠাঃ।

৫ অপক্ষীয়স্ব।

৬ শ্রিতম্।

তারপর প্রত্যেক মাসে অমাবস্যার পর পশ্চিমদিকে দৃশ্যমান চন্দ্রমাকে ঐ একইভাবে নমস্কার করবে, দুটি সবুজ দূর্বা নিক্ষেপ করবে তাঁর উদ্দেশে—

আমার যে সুসীম হৃদয় আকাশে চন্দ্রমায় আশ্রিত,

তার বলে অমৃতত্বের অধীশ্বর হয়ে আমি যেন পুত্রশোকে রোদন না করি।' তাঁর সন্তান তাঁর পূর্বে কখনোই প্রয়াত হয় না। এ হল পুত্রবানের পক্ষে। আর যাঁর পুত্র হয় নি, তিনি 'আপ্যায়িত হও, তোমাতে সমবেত হোক…', 'তোমার সমস্ত আপ্যায়নী ধারা ও তেজ সমবেত হোক', এবং 'আদিত্যেরা যে-অংশুকে আপ্যায়িত করেন'—এই তিনটি ঋক্ জপ করে বলবেন, যে আমাদের দ্বেষ করে এবং যাকে আমরা দ্বেষ করি, তাকে আমাদের প্রাণ প্রজা ও পশু দিয়ে আপ্যায়িত কোরো না। তার প্রাণ প্রজা ও পশু দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত কর। আমি ইন্দ্রের আবর্তনে আবর্তন করি, আমি আদিত্যের আবর্তনের অনুবর্তন করি।' ব'লে ডান হাতটি ঘোরাবেন ॥ ৮ ॥

এবং পূর্ণিমায় পূর্বদিকে দৃশ্যমান চন্দ্রমাকে ঠিক আগের মতই নমস্কার করবেন—তুমি রাজা সোম, তুমি বিচক্ষণ পঞ্চমুখ প্রজাপতি। ব্রাহ্মণ তোমার একটি মুখ, সেই মুখ দিয়ে তুমি রাজাদের ভক্ষণ কর। সেই মুখ দিয়ে আমাকে অন্নাদ ( অন্নাহারী ) কর। রাজা তোমার একটি মুখ। সেই মুখ দিয়ে তুমি প্রজাদের ভক্ষণ কর। সেই মুখ দিয়ে আমাকে অন্নাদ কর। শ্যেন তোমার একটি মুখ, সেই মুখ দিয়ে তুমি পাখিদের ভক্ষণ কর। সেই মুখ দিয়ে আমাকে অন্নাদ কর। অগ্নি তোমার একটি মুখ, সেই মুখ দিয়ে তুমি এই জগৎকে ভক্ষণ কর। সেই মুখ দিয়ে আমাকে অন্নাদ কর। তোমার যে পঞ্চম মুখ, সেই মুখ দিয়ে তুমি সমস্ত প্রাণীকে ভক্ষণ কর। সেই মুখ দিয়ে আমাকে অন্নাদ কর। আমাদের প্রাণ সন্তান ও পশুদের অবক্ষয়ে অবক্ষীণ হোয়ো না। যে আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি, তার প্রাণ সন্তান ও পশুদের নিয়ে অবক্ষীণ হও। আমি দেবতার আবর্তনে আবর্তন করি। আমি আদিত্যের আবর্তনের অনুবর্তন করি। ব'লে ডান হাতটি ঘোরাবেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর সংবেশনের আগে পত্নীর হৃদয়ে হাত বোলাবেন—

তোমার সুসীম প্রজাপতি হৃদয়ে যে-অমৃত নিহিত রয়েছে,

বোধহয় আমি তা জানি, পুত্রজনিত শোক যেন তুমি না পাও।

সে-মেয়ের সন্তান কখনোই তার পূর্বে প্রয়াত হয় না ॥ ১০ ॥

অথ প্রোষ্য-আয়ন্ পুত্রস্য মূর্ধানম্ অভিজিঘ্রেত্—

অঙ্গাদ্ অঙ্গাত্ সংভবসি হৃদয়াদ্ অধিজায়সে।

আত্মা বৈ পুত্রনামাঽসি স জীব শরদঃ শতম্॥ ইতি।

নাম-অস্য দধাতি—অশ্মা ভব, পরশুর্ ভব, হিরণ্যম্ অস্তৃতং ভব, তেজো বৈ পুত্রনামাঽসি, স জীব শরদঃ শতম্, ইতি নাম-অস্য গৃহ্ণাতি। অথ-এনং পরিগৃহ্ণাতি—যেন প্রজাপতিঃ প্রজাঃ পর্যগৃহ্ণাত্ তদরিষ্ট্যৈ, তেন ত্বা পরিগৃহ্ণামি-অসৌ-ইতি। অথ-অস্য দক্ষিণে কর্ণে জপতি—অস্মে প্রযন্ধি মঘবন্-ন্ ঋজীষিন্-ন্ ইতি, ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি, ইতি। সব্যে—মা ছেত্থাঃ, মা ব্যথিষ্ঠাঃ, শতং শরদ আয়ুষো জীব[1] পুত্র তে নাম্না মূর্ধানম্ অবজিঘ্রামি[2], ইতি ত্রির্ অস্য মূর্ধানম্ অবজিঘ্রেত্[3]। গবাং ত্বা হিঙ্কারেণ-অভিহিঙ্করোমি-ইতি ত্রির্ অস্য মূর্ধানম্ অভিহিঙ্কুর্যাত্॥ ১১॥

অথ-অতো দৈবঃ পরিমরঃ। এতত্-বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে, যত্-অগ্নির্ জ্বলতি। অথ-এতত্-ম্রিয়তে যত্-ন জ্বলতি। তস্য-আদিত্যম্ এব তেজো গচ্ছতি, বায়ুং প্রাণঃ। এতত্-বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে, যত্-আদিত্যো দৃশ্যতে। অথ-এতত্-ম্রিয়তে যত্-ন দৃশ্যতে তস্য চন্দ্রমসম্ এব তেজো গচ্ছতি, বায়ুং প্রাণঃ। এতত্-বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যত্-চন্দ্রমা দৃশ্যতে। অথ-এতত্-ম্রিয়তে যত্-ন দৃশ্যতে। তস্য বিদ্যুতম্ এব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ। এতত্-বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যত্-বিদ্যুত্-বিদ্যোততে। অথ-এতত্-ম্রিয়তে যত্-ন বিদ্যোততে। তস্যা দিশ এব তেজো গচ্ছতি, বায়ুং প্রাণঃ। তা বৈ-এতাঃ সর্বা দেবতা বায়ুম্ এব প্রবিশ্য বায়ৌ মৃত্বা ন মৃচ্ছন্তে, তস্মাত্-এব পুনর্ উদীরতে ইতি-অধিদৈবতম্। অথ-অধ্যাত্মম্॥ ১২॥

---

১ জীবস্ব।

২ অভিজিঘ্রামি।

৩ অভিজিঘ্রেত্।

আর প্রবাস থেকে ফিরে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করবেন—

প্রতিটি অঙ্গ হতে সম্ভূত হয়েছ, হৃদয় হতে জন্মেছ।

পুত্র নামে তুমি আমারই আত্মা, একশ বছর বেঁচে থাক।

ব'লে তার নাম দেন—'পাথর হও, কুঠার হও, জমাট-অটুট সোনা হও। পুত্র নামে তুমি হচ্ছ তেজ, তুমি একশ বছর বেঁচে থাক।' ব'লে তার নাম ধরে তাকে জড়িয়ে ধরেন—'যেমন করে প্রজাপতি তাঁর পুত্রদের জড়িয়ে ধরেছিলেন, যাতে তাদের অকল্যাণ না হয়, তেমনি করে তোমাকে জড়িয়ে ধরছি আমি অমুক।' তারপর ডান কানে জপ করেন—'হে ঋজীষী, হে মঘবা, একে দাও। হে ইন্দ্র, শ্রেষ্ঠ ধন দাও।' বাঁ কানে—'বংশধারা বিচ্ছিন্ন কোরো না, বিচলিত হোয়ো না। শতায়ু হও, পুত্র, তোমার নাম ধরে আমি মস্তক আঘ্রাণ করছি'। ব'লে তিনবার তার মাথা শুঁকবেন। 'বৃষের হিংকারের দ্বারা তোমাকে হিঙ্কৃত করছি'—ব'লে তিনবার তার মাথায় হিং-কার করবেন ॥ ১১ ॥

এবার দৈব পরিমর ( দেবতাদের পর্যবসান বা লয় )। অগ্নি যখন জ্বলে, তখন এই ব্রহ্মই তো জ্বলেন। যখন জ্বলে না, তখন তিনি মরেন। তার তেজ যায় সূর্যে, প্রাণ বায়ুতে। এই যে দেখ সূর্য, সে তো এই ব্রহ্মই জ্বলছেন। যখন দেখ না, তখন তিনি মরেন। তার তেজ যায় চাঁদে, প্রাণ বায়ুতে। এই যে দেখ চাঁদ, সে তো এই ব্রহ্মই জ্বলছেন। যখন দেখ না, তখন তিনি মরেন। তার তেজ যায় বিদ্যুতে, প্রাণ বায়ুতে। যখন বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে, তখন এই ব্রহ্মই তো জ্বলেন। যখন ঝলসায় না, তখন তিনি মরেন। তার তেজ যায় দিকে দিকে, প্রাণ বায়ুতে। তো এই সমস্ত দেবতা বায়ুতেই প্রবেশ ক'রে, বায়ুতে মরেও মরেন না, তার থেকেই আবার উঠে আসেন। এই হল দেবতার স্তরে। এবার নিজের মধ্যে ॥ ১২ ॥

এতত্-বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যত্-বাচা বদতি। অথ-এতত্-ম্রিয়তে যত্-ন বদতি। তস্য চক্ষুর্ এব তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণঃ। এতত্-বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যত্-চক্ষুষা পশ্যতি। অথ-এতত্-ম্রিয়তে যত্-ন পশ্যতি। তস্য শ্রোত্রম্ এব তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণঃ। এতত্-বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যত্-শ্রোত্রেণ শৃণোতি। অথ-এতত্-ম্রিয়তে যত্-ন শৃণোতি। তস্য মন এব তেজো গচ্ছতি, প্রাণং প্রাণঃ। এতত্-বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যত্-মনসা ধ্যায়তি। অথ-এতত্-ম্রিয়তে যত্-ন ধ্যায়তি। তস্য প্রাণম্ এব তেজো গচ্ছতি, প্রাণং প্রাণঃ। তা এতা সর্বা দেবতাঃ প্রাণম্ এব প্রবিশ্য প্রাণে মৃত্বা ন মৃচ্ছন্তে, তস্মাত্-এব পুনর্ উদীরতে। তত্-যত্-ইহ বৈ-এবং বিদ্বাংসম্ উভৌ পর্বতৌ-অভিপ্রবর্তেয়াতাং দক্ষিণশ্ চ-উত্তরশ্ চ তুস্তূর্ষমানৌ, ন হ-এনং স্তৃণ্বীয়াতাম্। অথ যে-এনং দ্বিষন্তি, যান্-চ স্বয়ং দ্বেষ্টি তে-এব-এনং পরিম্রিয়ন্তে ॥ ১০ ॥

যখন বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে কেউ কথা বলে, তখন এই ব্রহ্মই তো ঝলেন। যখন বলে না, তখন তিনি মরেন। তার তেজ যায় চোখে, প্রাণ প্রাণে। এই ব্রহ্মই তো ঝলেন, যখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে কেউ দেখে। যখন দেখে না, তখন তিনি মরেন। তখন তার তেজ যায় কানে, প্রাণ প্রাণে। এই ব্রহ্মই তো ঝলেন, যখন কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কেউ শোনে। যখন শোনে না, তখন তিনি মরেন। তার তেজ যায় মনে, প্রাণ প্রাণে। এই ব্রহ্মই তো ঝলেন, যখন মন দিয়ে কেউ ধ্যান করে। যখন ধ্যান করে না, তখন তিনি মরেন। তার তেজ যায় প্রাণে, প্রাণ প্রাণে। তো এই সমস্ত ( ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী ) দেবতা প্রাণেই প্রবেশ ক'রে, প্রাণে মরেও মরেন না, তার থেকেই আবার উঠে আসেন। এটি যিনি এখানেই এভাবে জানেন, তাঁকে দক্ষিণ এবং উত্তর এই দুটি পর্বত মিলে চুরমার করার চেষ্টা করলেও চুরমার করতে পারে না। বরং যারা তাঁকে দ্বেষ করে এবং তিনি যাদের দ্বেষ করেন, তাঁরাই তাঁর চতুর্দিকে মরে ॥ ১৩ ॥

অথ-অতো নিঃশ্রেয়সাদানম্। সর্বা হ বৈ দেবতা অহং-শ্রেয়সে বিবদমানা অস্মাত্-শরীরাত্ উচ্চক্রমুঃ। তত্[1]-দারুভূতং শিশ্যে। অথ-এনত্-বাক্ প্রবিবেশ। তত্-বাচা বদত্-শিশ্যে-এব। অথ-এনত্-চক্ষুঃ প্রবিবেশ। তত্-বাচা-বদত্ চক্ষুষা পশ্যত্-শিশ্যে-এব। অথ-এনত্-মনঃ প্রবিবেশ। তত্-বাচা বদত্-চক্ষুষা পশ্যত্-শ্রোত্রেণ শৃণ্বত্-মনসা ধ্যায়ত্-শিশ্যে-এব। অথ-এনত্ প্রাণঃ প্রবিবেশ। তত্ তত এব সমুত্তস্থৌ। তা বৈ-এতাঃ সর্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা প্রাণম্ এব প্রজ্ঞাত্মানম্ অভিসম্ভূয় সহ-এব-এতৈঃ সর্বৈর্ অস্মাত্-লোকাত্-উচ্চক্রমুঃ। তে বায়ুপ্রতিষ্ঠা আকাশাত্মানঃ স্বর্ ঈয়ুঃ। তথো এব-এবং বিদ্বান্ সর্বেষাং ভূতানাং প্রাণম্ এব প্রজ্ঞাত্মানম্ অভিসম্ভূয় সহ-এব-এতৈঃ সর্বৈর্ অস্মাত্-শরীরাত্ উত্ক্রামতি। স বায়ু-প্রতিষ্ঠ আকাশাত্মা স্বর্ এতি। স তত্-ভবতি[2] যত্র-এতে দেবাস্, তত্ প্রাপ্য যত্-অমৃতা দেবাস্ তত্-অমৃতো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৪ ॥

অথ-অতঃ পিতাপুত্রীয়ং, সম্প্রদানম্ ইতি চ-আচক্ষতে। পিতা পুত্রং প্রেষ্যন্-ন্ আহ্বয়তি। নবৈস্ তৃণৈর্ অগারং সংস্তীর্য-, অগ্নিম্ উপসমাধায়-, উদকুম্ভং সপাত্রম্ উপনিধায়-, অহতেন বাসসা সংপ্রচ্ছন্নঃ পিতা শেতে। এত্য পুত্র উপরিষ্টাত্-অভিনিপদ্যতে। ইন্দ্রিয়ৈর্ ইন্দ্রিয়াণি সংস্পৃশ্য-অপি[3] বা-অস্য-অভিমুখত এব-আসীত। অথ-অস্মৈ সংপ্রযচ্ছতি—

১ তত্-হ শুষ্কম্ অপ্রাণত্।
২ গচ্ছতি।
৩ অপি বা-অস্মৈ-আসীনায়-অভিমুখায়-এব সংপ্রদধ্যাত্।

এবার নিঃসন্দেহে-শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকার ( অথবা, নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি )। সমস্ত দেবতা 'আমিই শ্রেষ্ঠ' এই দাবীতে ঝগড়া করতে করতে এই শরীর থেকে বেরিয়ে গেল। শরীরটা কাঠ হয়ে পড়ে রইল। তখন তার মধ্যে প্রবেশ করল বাক্। তখন শরীরটা বাগিন্দ্রিয় দিয়ে কথা বলতে লাগল, কিন্তু শুয়েই রইল। তখন তার মধ্যে প্রবেশ করল চক্ষু। তাতে সে বাক্ দিয়ে কথা কইতে লাগল, চোখ দিয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু শুয়েই রইল। তারপর প্রবেশ করল শ্রোত্র। তখন সে বাক্ দিয়ে কথা কইতে, চোখ দিয়ে দেখতে এবং কান দিয়ে শুনতে লাগল, কিন্তু শুয়েই রইল। তারপর তাতে প্রবেশ করল মন। তখন সে বাক্ দিয়ে কথা কইতে, চোখ দিয়ে দেখতে, কান দিয়ে শুনতে এবং মন দিয়ে ভাবতে লাগল, কিন্তু শুয়েই রইল। তারপর তাতে প্রবেশ করল প্রাণ। অমনি সে উঠে দাঁড়াল। তখন সব ( ইন্দ্রিয়- ) দেবতাই প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পেরে প্রাণকেই প্রজ্ঞাত্মা বলে সম্মান দিয়ে এদের ( ইন্দ্রিয়দের ) সবাইকে নিয়ে এই লোক হতে ঊর্ধ্বে গমন করলেন। তারা তখন বায়ুপ্রতিষ্ঠ এবং আকাশাত্মা হয়ে স্বর্লোকে গমন করল। এটি যিনি জানেন তিনিও সর্বভূতের প্রাণরূপী প্রজ্ঞাত্মাকে সম্মান করে এই ইন্দ্রিয়দের সকলকে নিয়েই এই শরীর থেকে উৎক্রমণ করেন। তিনি বায়ুপ্রতিষ্ঠ ও আকাশাত্মা হয়ে স্বর্লোকে গমন করেন। তিনি তাই হন—যেখানে আছেন এই দেবতারা। সেটি পেয়ে দেবতারা যে-অমৃতে অমৃত, তিনিও সেই-অমৃতে অমৃত হন, যিনি এটি জানেন ॥ ১৪ ॥

এবার পিতাপুত্র-সম্পর্কিত অনুষ্ঠান, একে সম্প্রদানও বলে। চলে যাওয়ার আগে পিতা পুত্রকে ডাকেন। ঘরে নতুন ঘাস বিছিয়ে, তাতে অগ্নি স্থাপন করে, সরা-সমেত জলের কলসী রেখে, আনকোরা কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন পিতা। পুত্র এসে পিতার শিয়রে ( অথবা সামনে ) বসেন। পিতা পুত্রের দিকে মুখ করে নিজের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে তার ইন্দ্রিয়-গুলি স্পর্শ করে তার সামনে বসেন। তারপর তাকে সম্প্রদান করেন—

বাচং মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা।
বাচং তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ।
প্রাণং মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা।
প্রাণং তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ।
চক্ষুর্ মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা।
চক্ষুষ্ তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ।
শ্রোত্রং মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা।
শ্রোত্রং তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ।
মনো মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা।
মনস্ তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ।
অন্নরসান্ মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা।
অন্নরসান্ তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ।
কর্মাণি মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা।
কর্মাণি তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ।
সুখদুঃখে মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা।
সুখদুঃখে তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ।
আনন্দং রতিং প্রজাতিং মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা।
আনন্দং রতিং প্রজাতিং তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ।
ইত্যাং মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা।
ইত্যাং তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ।
ধিয়ো মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা।
ধিয়স্ তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ।
প্রজ্ঞাং মে ত্বয়ি দধানি-, ইতি পিতা।
প্রজ্ঞাং তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ।

পিতা—আমার বাক্ তোমাতে রাখি।
পুত্র—তোমার বাক্ আমাতে রাখলাম।
পিতা—আমার প্রাণ তোমাতে রাখি।
পুত্র—তোমার প্রাণ আমাতে রাখলাম।
পিতা—আমার চোখ তোমাতে রাখি।
পুত্র—তোমার চোখ আমাতে রাখলাম।
পিতা—আমার কান তোমাতে রাখি।
পুত্র—তোমার কান আমাতে রাখলাম।
পিতা—আমার মন তোমাতে রাখি।
পুত্র—তোমার মন আমাতে রাখলাম।
পিতা—আমার অন্নরস তোমাতে রাখি।
পুত্র—তোমার অন্নরস আমাতে রাখলাম।
পিতা—আমার কর্ম তোমাতে রাখি।
পুত্র—তোমার কর্ম আমাতে রাখলাম।
পিতা—আমার সুখদুঃখ তোমাতে রাখি।
পুত্র—তোমার সুখদুঃখ আমাতে রাখলাম।
পিতা—আমার আনন্দ রতি ও প্রজাতি তোমাতে রাখি।
পুত্র—তোমার আনন্দ রতি ও প্রজাতি আমাতে রাখলাম।
পিতা—আমার গতি তোমাতে রাখি।
পুত্র—তোমার গতি আমাতে রাখলাম।
পিতা—আমার ধী তোমাতে রাখি।
পুত্র—তোমার ধী আমাতে রাখলাম।
পিতা—আমার প্রজ্ঞা তোমাতে রাখি।
পুত্র—তোমার প্রজ্ঞা আমাতে রাখলাম।

যদি-উ বৈ—উপাপ্তিগদঃ স্যাত্, সমাসেন-এব ব্রূয়াত্, প্রাণান্ মে ময়ি দধানি-, ইতি পিতা। প্রাণান্-তে ময়ি দধে-, ইতি পুত্রঃ। অথ দক্ষিণাবৃত্ প্রাক্-উপনিষ্ক্রামতি। তং পিতা-অনুমন্ত্রয়তে, যশো ব্রহ্মবর্চসম্ অন্নাদ্যং কীর্তিস্ ত্বা জুষতাম্ ইতি। অথ-ইতরঃ সব্যম্ অনু অংসম্ অভ্যবেক্ষতে, পাণিনা-অন্তর্ধায়, বসনান্তেন বা প্রচ্ছাদ্য, স্বর্গান্-লোকান্ কামান্ আপ্নুহি-, ইতি। স যদি- অগদঃ স্যাত্, পুত্রস্য-ঐশ্বর্যে পিতা বসেত্, পরি বা ব্রজেত্। যদি-উ বৈ প্রেয়াত্, তথা-এব-এনং সমাপয়েয়ুর্ যথা সমাপয়িতব্যো ভবতি, যথা সমাপয়িতব্যো ভবতি ॥ ১৫ ॥

ইতি কৌষীতক্যুপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

যদি বেশী কিছু বলতে অপারগ হন, তাহলে সংক্ষেপেই বলবেন।

পিতা—আমার প্রাণ তোমাতে রাখি।

পুত্র—তোমার প্রাণ আমাতে রাখলাম।

এরপর পিতাকে প্রদক্ষিণ করে পুত্র পূর্বদিকে চলে যান। পিতা তার উদ্দেশে অনুমন্ত্রণ করেন—'যশ ব্রহ্মতেজ ভোজ্য অন্ন ও কীর্তি তোমাকে সেবা করুক।' তখন অনুজন ( পুত্র ) বাঁ-কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখেন হাত দিয়ে আড়াল করে অথবা বসন-প্রান্ত দিয়ে মুখ ঢেকে—'স্বর্গলোকসমূহ এবং কামনার ধন লাভ কর।' পিতা যদি সেরে ওঠেন, তাহলে পুত্রের অধীনে থাকবেন কিংবা পরিব্রাজক হবেন। আর যদি মারা-ই যান, তবে তেমন করেই তাঁর শেষকৃত্য করবে, যেমন করে শেষকৃত্য করা উচিত, যেমন করে শেষকৃত্য করা উচিত ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

## তৃতীয় অধ্যায়

প্রতর্দনো হ বৈ দৈবোদাসির্ ইন্দ্রস্য প্রিয়ং ধাম-উপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ। তং হ- ইন্দ্র উবাচ, প্রতর্দন, বরং তে দদানি-, ইতি। স হ-উবাচ প্রতর্দনস্, ত্বম্ এব মে বৃণীষ, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে-, ইতি। তং হ-ইন্দ্র উবাচ, ন বৈ বরোঽ বরস্মৈ বৃণীতে, ত্বম্ এব বৃণীষ ইতি। অবরো বৈ কিল মা[১]-, ইতি হ-উবাচ প্রতর্দনঃ। অথো খলু-ইন্দ্রঃ সত্যাত্-এব ন-ইয়ায়। সত্যং হি-ইন্দ্রঃ। তং হ-ইন্দ্র উবাচ, মাম্ এব বিজানীহি-, এতত্-এব-অহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে যত্-মাং বিজনীয়াত্। ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রম্ অহনম্। অরুন্মু'খান্ যতীন্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্। বহ্বীঃ সন্ধা অতিক্রম্য দিবি প্রহ্লাদীয়ান্ অতৃণম্ অহম্, অন্তরিক্ষে পৌলোমান্, পৃথিব্যাং কালকঞ্জান্। তস্য মে তত্র ন লোম চ মামীয়ত। স যো মাং বেদ, ন হ বৈ তস্য কেনচন কর্মণা লোকো মীয়তে, ন স্তেয়েন, ন ভ্রূণহত্যয়া, ন মাতৃবধেন, ন পিতৃবধেন। ন-অস্য পাপং চক্রুষঃ[২] মুখাত্- নীলং ব্যেতি,-ইতি ॥ ১ ॥

---

১ মে।

২ চকৃষঃ।

## তৃতীয় অধ্যায়

দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন যুদ্ধ ও পৌরুষের দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয় ধামে গিয়েছিলেন। তাঁকে ইন্দ্র বললেন, প্রতর্দন, তোমায় একটি বর দিতে চাই, পছন্দ কর। প্রতর্দন বললেন, আপনিই পছন্দ করে দিন, যা আপনি মানুষের পক্ষে কল্যাণতম মনে করেন। ইন্দ্র বললেন, বড় কখনো ছোট-র জন্য বর পছন্দ করে না, তুমিই পছন্দ কর। প্রতর্দন বললেন, 'ছোট? তাই নাকি? আচ্ছা। তাহলে রইল আমার বর নেওয়া।' ইন্দ্র কিন্তু তাতে সত্য থেকে একচুলও সরলেন না। কেননা সত্যই ইন্দ্র। ইন্দ্র তাঁকে বললেন, আমাকেই বিশেষভাবে জান। আমাকে জানুক—এটাই আমি মানুষের পক্ষে কল্যাণতম বলে মনে করি। আমি ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা (তিন-মাথা)-কে বধ করেছি, লালমুখো যতিদের বরু-র মুখে দিয়েছি। বহু সন্ধি অতিক্রম করে স্বর্গে প্রহ্লাদীয়, অন্তরিক্ষে পৌলোম এবং পৃথিবীতে কালকঞ্জ (অসুর) দের বধ করেছি। তাতে কিন্তু আমার একটি লোমও খসে নি। তাই যে আমাকে জেনেছে, কোন কর্মের দ্বারা তার কোন (পুণ্য) লোক নষ্ট হয় না, চুরিতে নয়, ভ্রূণহত্যায় নয়, মাতৃহত্যায় নয়, পিতৃহত্যায় নয়। পাপ করে থাকলেও তার মুখের নীলকান্তি চলে যায় না॥ ১॥

স হ-উবাচ, প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা। তং মাম্ আয়ুর্ অমৃতম্ ইতি-উপাস্স্ব। আয়ুঃ প্রাণঃ, প্রাণো বৈ-আয়ুঃ, প্রাণ এব অমৃতম্। যাবত্-হি-অস্মিন্-শরীরে প্রাণো বসতি, তাবত্-আয়ুঃ। প্রাণেন হি-এব-অমুষ্মিন্-[1] লোকে অমৃতত্বম্ আপ্নোতি, প্রজ্ঞয়া সত্যং সঙ্কল্পম্। স যো মাম্ আয়ুর্ অমৃতম ইতি-উপাস্তে, সর্বম্ আয়ুর্ অস্মিন্ লোকে, এত্য-আপ্নোতি অমৃতত্বম্ অক্ষিতিং স্বর্গে লোকে। তত্-হ একে-আহুঃ, একভূয়ং বৈ প্রাণা গচ্ছন্তি-, ইতি। ন হি কশ্চন শক্নুয়াত্ সকৃত্-বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুং, চক্ষুষা রূপং, শ্রোত্রেণ শব্দং, মনসা ধ্যানম্। একভূয়ং বৈ প্রাণা ভূত্বা-একৈকম্ এতানি সর্বাণি প্রজ্ঞাপয়ন্তি-, ইতি। বাচং বদন্তীং সর্বে প্রাণা অনুবদন্তি। চক্ষুঃ পশ্যত্ সর্বে প্রাণা অনুপশ্যন্তি। শ্রোত্রং শৃণ্বত্ সর্বে প্রাণা অনুশৃণ্বন্তি। মনো ধ্যায়ত্ সর্বে প্রাণা অনুধ্যায়ন্তি। প্রাণং প্রাণন্তং সর্বে প্রাণা অনুপ্রাণন্তি-, ইতি। এবম্ উ হ-এতত্-ইতি হ-ইন্দ্র উবাচ, অস্তি তু-এব প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সম্, ইতি ॥ ২ ॥

[1] অস্মিন্।

ইন্দ্র বললেন, আমি প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ। সেই আমাকে অমৃত আয়ু বলে উপাসনা কর। আয়ুই প্রাণ, প্রাণই আয়ু, প্রাণই অমৃত। এই শরীরে যতক্ষণ প্রাণ বাস করে, ততক্ষণই আয়ু। প্রাণের দ্বারাই ঐলোকে (পা. এলোকে) মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। প্রজ্ঞার দ্বারা লাভ করে সত্যসঙ্কল্প। যিনি আমাকে অমৃত আয়ু বলে উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে পূর্ণায়ু এবং স্বর্লোকে অমৃতত্ব ও অক্ষয়ত্ব লাভ করেন। [ প্রতর্দন বললেন, ] তাই তো কেউ কেউ বলেন যে প্রাণেরা ( ইন্দ্রিয়েরা ) সব এক হয়ে যায়। কেউ একই সঙ্গে বাক্ দিয়ে নামকে, চোখ দিয়ে রূপকে, কান দিয়ে শব্দকে এবং মন দিয়ে ভাবনাকে জানাতে পারে না। প্রাণেরা এক হয়ে, এক এক করে এগুলিকে জানায়। বাক্ যখন বলে, তখন সমস্ত প্রাণেরা ( ইন্দ্রিয় ) তার সঙ্গে বলে। চোখ যখন দেখে, তখন সমস্ত প্রাণেরা তার সঙ্গে দেখে। কান যখন শোনে, সমস্ত প্রাণেরা তার সঙ্গে শোনে। মন যখন ভাবে, সমস্ত প্রাণেরা তার সঙ্গে ভাবে। ( মুখ্য ) প্রাণ যখন দম নেয়, তখন সমস্ত প্রাণেরা তার সঙ্গে দম নেয়। হ্যাঁ, তাই ( ঠিক বলেছ ), ইন্দ্র বললেন, 'তবে তাদের মধ্যে ( মুখ্য ) প্রাণই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

জীবতি বাগপেতঃ, মূকান্ হি পশ্যামঃ। জীবতি চক্ষুরপেতঃ, অন্ধান্ হি পশ্যামঃ। জীবতি শ্রোত্রাপেতঃ, বধিরান্ হি পশ্যামঃ। জীবতি মনোঽপেতঃ, বালান্ হি পশ্যামঃ। [জীবতি বাহুচ্ছিন্নো, জীবতি-উরুচ্ছিন্ন ইতি-এবং হি পশ্যাম,-ইতি।] অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা-ইদং শরীরং পরিগৃহ্য-উত্থাপয়তি। তস্মাদ্ এতদ্ এব-উক্থম্ উপাসীত-ইতি। সা-এষা প্রাণে সর্বাপ্তিঃ। যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা। যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ। সহ হি-এতৌ-অস্মিন্-শরীরে বসতঃ, সহ-উত্ক্রামতঃ। তস্য-এষা-এব দৃষ্টির্ এতদ্ বিজ্ঞানম্। যত্র-এতত্ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি-অথ-আস্মিন্ প্রাণে-এব-একধা ভবতি। তদ্ এনং বাক্ সর্বৈর্ নামভিঃ সহ-অপ্যেতি। চক্ষুঃ সর্বৈঃ-রূপৈঃ সহ-অপ্যেতি। শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি। মনঃ সর্বৈর্ ধ্যানৈঃ[১] সহ-অপ্যেতি। স যদা প্রতিবুধ্যতে, যথা- অগ্নের্ জ্বলতঃ সর্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্-ন্ এবম্ এব-এতস্মাদ্ আত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা, দেবেভ্যো লোকাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা-ইদং শরীরং পরিগৃহ্য-উত্থাপয়তি। তস্মাদ্ এতদ্ এব উক্থম্ উপাসীত-ইতি। সা-এষা প্রাণে সর্বাপ্তিঃ। যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা। যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ। তস্য-এষা-এব সিদ্ধিঃ, এতদ্ বিজ্ঞানম্। যত্র-এতত্ পুরুষ আর্তো মরিষ্যন্-ন্ আবল্যং ন্যেত্য সংমোহং ন্যেতি, তদাহুর্ উদক্রমীত্-চিত্তম্। ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন বাচা বদতি, ন ধ্যায়তি। অথ-অস্মিন্ প্রাণে-এব-একধা ভবতি। তদ্ এনং বাক্ সর্বৈর্ নামভিঃ সহ-অপ্যেতি। চক্ষুঃ সর্বৈঃ-রূপৈঃ সহ-অপ্যেতি। শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহ-অপ্যেতি। মনঃ সর্বৈর্ ধ্যানৈঃ[১] সহ-অপ্যেতি। স যদা-অস্মাত্-শরীরাদ্ উত্ক্রামতি সহ-এব-এতৈঃ সর্বৈর্ উত্ক্রামতি ॥ ৩ ॥

---

১ ধ্যাতৈঃ।

বাক্ ছাড়াও মানুষ বাঁচে। মূকদের দেখি তো। চোখ ছাড়াও বাঁচে। অন্ধদের দেখি তো। কান ছাড়াও বাঁচে। বধিরদের দেখি তো। মন ছাড়াও বাঁচে। শিশুদের দেখি তো। [ হাত নেই, উরু নেই, তাও তো বেঁচে আছে, দেখি ]। এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণই শরীর পরিগ্রহ করে তাকে ওঠান। তাই তাঁকেই উক্থ রূপে উপাসনা করবে। এই হল প্রাণে সব - পাওয়া। যা প্রাণ তাই প্রজ্ঞা। যা প্রজ্ঞা তাই প্রাণ। এই দুটি এই শরীরে একই সঙ্গে বাস করে, একই সঙ্গে উৎক্রমণ করে। এ-বিষয়ে এই হল দৃষ্টি, এই হল বিজ্ঞান। যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, কোনো স্বপ্ন দেখে না, তখন সে এই প্রাণের সঙ্গেই এক হয়ে থাকে। তখন বাক্ সমস্ত নাম নিয়ে এই প্রাণে প্রবেশ করে। চোখ সমস্ত রূপ নিয়ে প্রবেশ করে। কান সমস্ত শব্দ নিয়ে প্রবেশ করে। মন সমস্ত ভাবনা নিয়ে প্রবেশ করে। সে যখন জেগে ওঠে, তখন জ্বলন্ত আগুন থেকে যেমন চতুর্দিকে ফুলকি ওড়ে, তেমনি এই আত্মা থেকে প্রাণেরা ( ইন্দ্রিয়েরা ) যে যার জায়গায় চলে যায়, প্রাণ থেকে দেবতারা, দেবতাদের থেকে লোকসমূহ। সেই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণই এই শরীর পরিগ্রহ করে তাকে ওঠান। সুতরাং তাঁকেই উক্থরূপে উপাসনা করবে। এই হল প্রাণে সব-পাওয়া। যিনি প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা। যিনি প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ। এই তার সিদ্ধি, এই বিজ্ঞান ( তত্ত্ব )। যখন মানুষ আর্ত মুমূর্ষু দুর্বল হয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন লোকে বলে, চিত্ত উৎক্রমণ করেছে। তখন সে শোনে না, দেখে না, কথা কয় না, ভাবে না। তখন সে প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তখন বাক্ সমস্ত নাম নিয়ে প্রাণে প্রবেশ করে। চোখ সমস্ত রূপ নিয়ে প্রবেশ করে। কান সমস্ত শব্দ নিয়ে প্রবেশ করে। মন সমস্ত ভাবনা নিয়ে প্রবেশ করে। প্রাণ যখন এই শরীর থেকে উৎক্রমণ করেন, তখন এদের সবাইকে নিয়েই উৎক্রমণ করেন ॥ ৩ ॥

বাগ্‌ অস্মাত্‌ সর্বাণি নামানি-অভিবিসৃজতে, বাচা সর্বাণি নামানি-আপ্নোতি। প্রাণোঽস্মাত্‌ সর্বান্‌ গন্ধান্‌ অভিবিসৃজতে, প্রাণেন সর্বান্‌ গন্ধান্‌ আপ্নোতি। চক্ষুর্‌ অস্মাত্‌ সর্বাণি রূপাণি-অভিবিসৃজতে, চক্ষুষা সর্বাণি রূপাণি-আপ্নোতি। শ্রোত্রম্‌ অস্মাত্‌ সর্বান্‌ শব্দান্‌ অভিবিসৃজতে, শ্রোত্রেণ সর্বান্‌-শব্দান্‌ আপ্নোতি। মনোঽস্মাত্‌ সর্বাণি ধ্যানানি-অভিবিসৃজতে, মনসা সর্বাণি ধ্যানানি-[১]আপ্নোতি। সা-এষা প্রাণে সর্বাপ্তিঃ। যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা। যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ। সহ হি-এতৌ-অস্মিন্‌-শরীরে বসতঃ, সহ-উত্‌ক্রামতঃ। অথ খলু যথা-অস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ সর্বাণি ভূতানি-একং ভবন্তি তদ্‌ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৪ ॥

বাগ্‌ এব-অস্যাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদূঢ়ং, তস্যৈ নাম পরস্তাত্‌ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা।

প্রাণ এব-অস্যাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদূঢ়ং, তস্য গন্ধঃ পরস্তাত্‌ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা।

চক্ষুর্‌ এব-অস্যাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদূঢ়ং, তস্য রূপং পরস্তাত্‌ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা।

শ্রোত্রম্‌ এব-অস্যাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদূঢ়ং, তস্য শব্দঃ পরস্তাত্‌ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা।

জিহ্বা-এব-অস্যাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদূঢ়ং, তস্য রসঃ পরস্তাত্‌ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা।

হস্তৌ-এব-অস্যাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদূঢ়ং, তস্য কর্ম পরস্তাত্‌ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা।

শরীরম্‌ এব-অস্যাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদূঢ়ং, তস্য সুখদুঃখে পরস্তাত্‌ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা।

উপস্থ এব-অস্যাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদূঢ়ং, তস্য-আনন্দো রতিঃ প্রজাতিঃ পরস্তাত্‌ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা।

পাদৌ-এব-অস্যাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদূঢ়ং, তয়োর্‌ ইত্যা পরস্তাত্‌ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা।

মনঃ-এব-অস্যাঃ-একম্‌ অঙ্গম্‌ উদূঢ়ং, তস্য ধিয়ঃ কামাঃ পরস্তাত্‌ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা ॥ ৫ ॥

---

১ ধ্যাতানি।

বাক্ মুমূর্ষুর থেকে সমস্ত নাম বার করে দেয়, সে বাক্ দিয়েই সমস্ত নামকে পায়। প্রাণ ( ঘ্রাণেন্দ্রিয় ) তার থেকে সমস্ত গন্ধ বার করে দেয়, সে প্রাণ দিয়েই সমস্ত গন্ধকে পায়। চোখ তার থেকে সমস্ত রূপ বার করে দেয়, সে চোখ দিয়েই সমস্ত রূপকে পায়। কান তার থেকে সমস্ত শব্দ বার করে দেয়, সে কান দিয়েই সমস্ত শব্দকে পায়। মন তার থেকে সমস্ত ভাবনা বার করে দেয়, সে মন দিয়েই সমস্ত ভাবনাকে পায়। এই হল প্রাণে সব পাওয়া। যা প্রাণ তাই প্রজ্ঞা। যা প্রজ্ঞা তাই প্রাণ। এই দুটি এই শরীরে একই সঙ্গে বাস করে, একই সঙ্গে উৎক্রমণ করে। এখন এই প্রজ্ঞাতে সর্বভূত কি করে এক হয়ে যায়, তা বুঝিয়ে বলছি॥ ৪ ॥

এই প্রজ্ঞারই একটি অঙ্গ বাক্ হয়ে ফুটে উঠেছে, নাম হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ ( বিষয় )। এঁরই একটি অঙ্গ প্রাণ ( ঘ্রাণ ) হয়ে ফুটে উঠেছে, গন্ধ হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এঁরই একটি অঙ্গ চোখ হয়ে ফুটে উঠেছে, রূপ হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এঁরই একটি অঙ্গ কান হয়ে ফুটে উঠেছে, শব্দ হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এঁরই একটি অঙ্গ জিভ হয়ে ফুটে উঠেছে, রস হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এঁরই একটি অঙ্গ হাত হয়ে ফুটে উঠেছে, কর্ম হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এঁরই একটি অঙ্গ শরীর হয়ে ফুটে উঠেছে, সুখ-দুঃখ হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এঁরই একটি অঙ্গ উপস্থ হয়ে ফুটে উঠেছে, আনন্দ রতি ও প্রজাতি হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এঁরই একটি অঙ্গ পা হয়ে ফুটে উঠেছে, গতি হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ। এঁরই একটি অঙ্গ মন হয়ে ফুটে উঠেছে, ধী এবং কামনা হল তার বাইরে রক্ষিত ভূতাংশ॥ ৫ ॥

প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্বাণি নামানি-আপ্নোতি।
প্রজ্ঞয়া প্রাণং সমারুহ্য প্রাণেন সর্বান্ গন্ধান্ আপ্নোতি।
প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষা সর্বাণি রূপাণি-আপ্নোতি।
প্রজ্ঞয়া শ্রোত্রং সমারুহ্য শ্রোত্রেণ সর্বান্-শব্দান্ আপ্নোতি।
প্রজ্ঞয়া জিহ্বাং সমারুহ্য জিহ্বয়া সর্বান্ অন্নরসান্ আপ্নোতি।
প্রজ্ঞয়া হস্তৌ সমারুহ্য হস্তাভ্যাং সর্বাণি কর্মাণি-আপ্নোতি।
প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য শরীরেণ সুখদুঃখে আপ্নোতি।
প্রজ্ঞয়া-উপস্থং সমারুহ্য-উপস্থেন-আনন্দং রতিং প্রজাতিম্ আপ্নোতি।
প্রজ্ঞয়া পাদৌ সমারুহ্য পাদাভ্যাং সর্বা ইত্যা আপ্নোতি।
প্রজ্ঞয়া মনঃ সমারুহ্য মনসা সর্বাণি ধ্যানানি কামান্ আপ্নোতি ॥ ৬ ॥

ন হি প্রজ্ঞাপেতা বাঙ্ নাম কিঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত্। অন্যত্র মে মনোঽভূদ্ ইতি-আহ, ন-অহম্ এতত্-নাম প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতঃ প্রাণো গন্ধং কঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত্। অন্যত্র মে মনোঽভূদ্ ইতি-আহ, ন-অহম্ এতদ্ গন্ধং প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতং চক্ষুঃ-রূপং কিঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত্। অন্যত্র মে মনোঽভূদ্ ইতি-আহ, ন-অহম্ এতদ্ রূপং প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতং শ্রোত্রং শব্দং কঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত্। অন্যত্র মে মনোঽভূদ্ ইতি-আহ, ন-অহম্ এতং শব্দং প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতা জিহ্বা-অন্নরসং কঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত্। অন্যত্র মে মনোঽভূদ্ ইতি-আহ, ন-অহম্ এতম্ অন্নরসং প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ হস্তৌ কর্ম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েয়াতাম্। অন্যত্র মে মনোঽভূদ্ ইতি-আহ, ন-অহম্ এতত্ কর্ম প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতং শরীরং সুখদুঃখং কিঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত্। অন্যত্র মে মনোঽভূদ্ ইতি-আহ, ন-অহম্ এতত্ সুখদুঃখং প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি। ন হি প্রজ্ঞাপেত উপস্থ আনন্দং রতিং প্রজাতিং কাঞ্চন প্রজ্ঞপয়েত্! অন্যত্র মে মনোঽভূদ্ ইতি-আহ, ন-অহম্ এতম্ আনন্দং রতিং প্রজাতিং প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ পাদৌ-ইত্যাং কাঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েয়াতাম্। অন্যত্র মে মনোঽভূদ্ :ইতি-আহ, ন-অহম্ এতাম্ ইত্যাং প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতং মনঃ কিঞ্চন সিধ্যেত্,[১] ন প্রজ্ঞাতব্যং প্রজ্ঞায়েত ॥ ৭ ॥

---

১ ন হি প্রজ্ঞাপেতা ধীঃ কাচন সিধ্যেত্।

মানুষ প্রজ্ঞা দিয়ে বাকে সমারূঢ় হয়ে বাক্ দিয়ে সব নামকে পায়।
প্রজ্ঞা দিয়ে প্রাণে সমারূঢ় হয়ে প্রাণ দিয়ে সব গন্ধকে পায়।
প্রজ্ঞা দিয়ে চোখে সমারূঢ় হয়ে চোখ দিয়ে সব রূপকে পায়।
প্রজ্ঞা দিয়ে কানে সমারূঢ় হয়ে কান দিয়ে সব শব্দকে পায়।
প্রজ্ঞা দিয়ে জিভে সমারূঢ় হয়ে জিভ দিয়ে সব অন্নরসকে পায়।
প্রজ্ঞা দিয়ে হাতে সমারূঢ় হয়ে হাত দিয়ে সব কর্মকে পায়।
প্রজ্ঞা দিয়ে শরীরে সমারূঢ় হয়ে শরীর দিয়ে সুখদুঃখ পায়।
প্রজ্ঞা দিয়ে উপস্থে সমারূঢ় হয়ে উপস্থ দিয়ে আনন্দ রতি ও সন্তান পায়।
প্রজ্ঞা দিয়ে পায়ে সমারূঢ় হয়ে পা দিয়ে সব গতি পায়।
প্রজ্ঞা দিয়ে মনে সমারূঢ় হয়ে মন দিয়ে সব ভাবনা ও কাম্যবস্তু
পায়। ॥ ৬ ॥

প্রজ্ঞাবিহীন বাক্ কোনো নামই জানাতে পারে না। বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই নামটি জানতে পারিনি। প্রজ্ঞাবিহীন প্রাণ কোনো গন্ধই জানাতে পারে না। বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই গন্ধটি জানতে পারিনি। প্রজ্ঞাবিহীন চোখ কোনো রূপই জানাতে পারে না। বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই রূপটি জানতে পারিনি। প্রজ্ঞাবিহীন কান কোনো শব্দই জানাতে পারে না। বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই শব্দটি জানতে পারিনি। প্রজ্ঞাবিহীন জিভ কোনো অন্নরসই জানাতে পারে না। বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই অন্নরসটি জানতে পারিনি। প্রজ্ঞাবিহীন হাত কোনো কাজই জানাতে পারে না। বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই কাজটি জানতে পারিনি। প্রজ্ঞাবিহীন শরীর কোনো সুখদুঃখই জানাতে পারে না। বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই সুখদুঃখ জানতে পারিনি। প্রজ্ঞাবিহীন উপস্থ কোনো আনন্দ রতি প্রজাতি জানাতে পারে না। বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই আনন্দ রতি প্রজাতি জানতে পারিনি। প্রজ্ঞাবিহীন পা কোনো গতিই জানাতে পারে না। বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এই গতি জানতে পারিনি। প্রজ্ঞাবিহীন মন বলে কিছু হয় না, কোনো জ্ঞাতব্য বিষয়ই সে জানতে পারে না। ॥ ৭ ॥

ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ।

ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত, ঘ্রাতারং বিদ্যাৎ।

ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত, দ্রষ্টারং বিদ্যাৎ।

ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত, শ্রোতারং বিদ্যাৎ।

ন অন্নরসং বিজিজ্ঞাসীত, অন্নরসবিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ।

ন কর্ম বিজিজ্ঞাসীত, কর্তারং বিদ্যাৎ।

ন সুখদুঃখে বিজিজ্ঞাসীত, সুখদুঃখয়োর্ বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ।

ন আনন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং বিজিজ্ঞাসীত, আনন্দস্য রতেঃ প্রজাতের্ বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ।

ন-ইত্যাং বিজিজ্ঞাসীত, এতারং বিদ্যাৎ।

ন মনো বিজিজ্ঞাসীত, মন্তারং বিদ্যাৎ।

তা বৈ- এতা দশ-এব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞম্। দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতম্। যদ্-হি ভূতমাত্রা ন স্যুর্, ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুঃ। যদ্ বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্, ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ। ন হি-অন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেত্, নো এতত্-নানা। তদ্ যথা-রথস্য অরেষু নেমির্ অর্পিতঃ-, নাভৌ-অরা অর্পিতাঃ, এবম্ এব-এতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু-অর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা-আনন্দঃ-অজরঃ-অমৃতঃ। ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্ ভবতি, নো এব-অসাধুনা কনীয়ান্। এষ হি-এব সাধু কর্ম কারয়তি তং, যম্ এভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এব-অসাধু কর্ম কারয়তি তং, যম্ অধো নিনীষতে। এষ লোকপালঃ। এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্বেশঃ।[1] স মে- আত্মা- ইতি বিদ্যাৎ। স মে-আত্মা-ইতি বিদ্যাৎ॥ ৮॥

ইতি কৌষীতক্যুপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

১ লোকেশঃ। সর্বেশ্বরঃ।

বাক্‌কে জানতে চেয়ো না, বক্তাকে জান।

গন্ধকে জানতে চেয়ো না, ঘ্রাতাকে জান।

রূপকে জানতে চেয়ো না, দ্রষ্টাকে জান।

শব্দকে জানতে চেয়ো না, শ্রোতাকে জান।

অন্নরসকে জানতে চেয়ো না, অন্নরসের বিজ্ঞাতা ( ভোক্তা ) কে জান।

কর্মকে জানতে চেয়ো না, কর্তাকে জান।

সুখদুঃখকে জানতে চেয়ো না, সুখদুঃখের বিজ্ঞাতাকে জান।

আনন্দকে রতিকে প্রজাতিকে জানতে চেয়ো না. আনন্দ-রতি-প্রজাতির বিজ্ঞাতাকে জান।

গতিকে জানতে চেয়ো না, গন্তাকে জান।

মনকে জানতে চেয়ো না, মন্তাকে জান।

এই দশটি ভূত-মাত্রাই হল প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত। আবার এই দশটি প্রজ্ঞামাত্রাই হল ভূতাধিষ্ঠিত। যদি ভূতমাত্রা না থাকত, তবে প্রজ্ঞামাত্রা থাকত না। যদি প্রজ্ঞামাত্রা না থাকত, ভূতমাত্রা থাকত না। এ দুটির একটির দ্বারা কোনো রূপই সম্ভব নয়। আবার এটি নানান্‌-ও নয়। সে কেমন ? না, যেমন রথের চাকার বেড়ি শলাকাগুলিতে প্রবিষ্ট, আবার শলাকাগুলি চাকার কেন্দ্রে প্রবিষ্ট, তেমনি এই ভূতমাত্রাগুলি প্রজ্ঞামাত্রায় প্রবিষ্ট, প্রজ্ঞামাত্রাগুলি প্রাণে প্রবিষ্ট। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ অজর অমৃত। ইনি সৎকর্মের দ্বারা বড় হন না, অসৎ কর্মের দ্বারা ছোট হন না। যাকে ইনি এই সমস্ত লোকের চেয়ে বড় করে তুলে ধরতে চান, তাকে দিয়ে ইনিই সৎকর্ম করান। আর যাকে অধোগামী করতে চান, তাকে দিয়ে ইনিই অসৎকর্ম করান। ইনি লোকপাল। ইনি লোকাধিপতি। ইনি সর্বেশ্বর। তাঁকে আমার আত্মা বলে জানবে। তাঁকে আমার আত্মা বলে জানবে ॥ ৮ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

# চতুর্থ অধ্যায়

গার্গ্যো হ বৈ বালাকির্ অনূচানঃ সংস্পষ্ট আস। সোঽবসদ্ উশীনরেষু, স বশ-মত্স্যেষু, কুরুপঞ্চালেষু কাশীবিদেহেষু- ইতি। স হ- অজাতশত্রুং কাশ্যম্ এত্য-উবাচ, ব্রহ্ম তে ব্রবাণি-ইতি। তং হ- উবাচ-অজাতশত্রুঃ, সহস্রং দদ্মস্ তে-এতস্যাং বাচি। জনকো জনক ইতি বৈ-উ জনা ধাবন্তি, ইতি ॥ ১ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষ আদিত্যে পুরুষস্ তম্ এব-অহং ব্রহ্ম[1] উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্ মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। বৃহত্ পাণ্ডরবাসা অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা-ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা ভবতি ॥ ২ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষ চন্দ্রমসি পুরুষস্ তম্ এব-অহং ব্রহ্ম-উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। সোমো রাজা অন্নস্য-আত্মা-ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে- ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে-, অন্নস্য-আত্মা ভবতি ॥ ৩ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষ বিদ্যুতি পুরুষস্ তম্ এব-অহম্ ব্রহ্ম উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্ মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। সত্যস্য আত্মা-ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, তেজস আত্মা ভবতি ॥ ৪ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষ স্তনয়িত্নৌ পুরুষস্ তম্ এব-অহং ব্রহ্ম-উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। শব্দস্য- আত্মা-ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, শব্দস্য-আত্মা ভবতি ॥ ৫ ॥

---

অজাতশত্রু-বালাকি-সংবাদ দ্র. বৃহদারণ্যক ২।১

১ ব্রহ্ম কথাটি সর্বত্র নেই।

# চতুর্থ অধ্যায়

গর্গবংশীয় বালাকের পুত্র অধীতবেদ বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর বাস ছিল উশীনরে। তিনি বশে মত্‌স্যে কুরুপঞ্চালে এবং কাশী-বিদেহেও বাস করেছিলেন। তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুর কাছে গিয়ে বললেন, আমি আপনাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলব। অজাতশত্রু বললেন, এই কথার জন্যই আপনাকে হাজার (গাভী) দেব। লোকে খালি জনক জনক জনক বলে ছোটে ॥ ১ ॥

বালাকি বললেন, আদিত্যে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে বিরাট পাণ্ডু-রং সর্বাতীত সর্বভূতের মূর্ধারূপে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি সর্বাতীত এবং সর্বভূতের মূর্ধা হন ॥ ২ ॥

বালাকি বললেন, চন্দ্রমাতে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে সোম রাজা অন্নের-আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি অন্নের আত্মা হন ॥ ৩ ॥

বালাকি বললেন, বিদ্যুতে এই যে পুরুষ আমি তাঁকেই ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে সত্যের আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি সত্যের আত্মা হন ॥ ৪ ॥

বালাকি বললেন, মেঘগর্জনে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে শব্দের আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি শব্দের আত্মা হন ॥ ৫ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষ আকাশে[1] পুরুষস্ তম্ এব-অহম্ উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। পূর্ণম্ অপ্রবর্তি ব্রহ্ম-ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, পূর্যতে প্রজয়া পশুভির্ যশসা ব্রহ্মবর্চসেন স্বর্গেণ লোকেন, সর্বম্ আয়ুর্ এতি ॥ ৬ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষ বায়ৌ পুরুষস্ তম্ এব-অহম্ উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ অজাতশত্রুর্, মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠঃ, অপরাজিতা সেনা, ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, জিষ্ণুর্ হ বৈ-অপরাজিষ্ণুর্ অন্যতস্ তজ্জ্যায়ান্ ভবতি ॥ ৭ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষঃ-অগ্নৌ পুরুষস্ তম্ এব-অহম্ উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। বিষাসহির্ ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, বিষাসহির্ বৈ অন্বেষ[2] ( অনু-এষ ) ভবতি ॥ ৮ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষঃ-অপ্‌সু পুরুষস্ তম্ এব-অহম্ উপাসে-ইতি। তং হ উবাচ-অজাতশত্রুর্, মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। তেজস আত্মা-ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, তেজস আত্মা ভবতি। ইতি-অধিদৈবতম্। অথ-অধ্যাত্মম্ ॥ ৯ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষ আদর্শে পুরুষস্ তম্ এব-অহম্ উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। প্রতিরূপ ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, প্রতি-রূপো হ-এব-অস্য প্রজায়াম্ আজায়তে, ন-অপ্রতিরূপঃ ॥ ১০ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষ প্রতিশ্রুত্‌কায়াং পুরুষস্ তম্ এব-অহম্ উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, বিন্দতে দ্বিতীয়াদ্, দ্বিতীয়বান্ ভবতি ॥ ১১ ॥

---

১ পাঠান্তরে আগে বায়ু, পরে আকাশ।

২ অন্বেষু।

বালাকি বললেন, আকাশে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি প্রজা পশু যশ ব্রহ্মতেজ এবং স্বর্গলোকের দ্বারা পূর্ণ হন, পূর্ণ আয়ু পান ॥ ৬ ॥

বালাকি বললেন, বায়ুতে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ অপরাজিতা সেনা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি বিজয়ী অপরাজিত ও অন্য সবার থেকে বড় হন ॥ ৭ ॥

বালাকি বললেন, অগ্নিতে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে সর্বজয় বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনিও এঁরই মত সর্বজয় হন ॥ ৮ ॥

বালাকি বললেন, জলে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে তেজের আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি তেজের আত্মা হন। এই হল দেবতার স্তরে। এবার নিজের মধ্যে ॥ ৯ ॥

বালাকি বললেন, দর্পণে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে প্রতিরূপ বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাঁর সন্তানের মধ্যে হুবহু নিজেরই প্রতিকৃতি হয়ে জন্মান, অ-প্রতিকৃতি হয়ে নয় ॥ ১০ ॥

বালাকি বললেন, প্রতিধ্বনিতে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে দ্বিতীয়, অনপগত ( যে কখনো চলে যায় না ) বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাঁর দ্বিতীয় সত্তা ( অর্থাৎ পত্নী ) থেকে সন্তান লাভ করেন এবং দ্বিতীয়-যুক্ত ( অর্থাৎ পুত্রবান্ ) হন ॥ ১১ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্ য এব-এষ শব্দঃ পুরুষম্ অন্বেতি, তম্ এব-অহম্ উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, মা মা- এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। অসুর্ ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, নো এব স্বয়ং, ন-অস্য প্রজা পুরা কালাত্ সম্মোহম্ এতি ॥ ১২ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্ য এব-এষ ছায়ায়াং পুরুষস্ তম্ এব-অহম্ উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। মৃত্যুর্ ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, নো এব স্বয়ং, ন-অস্য প্রজা পুরা কালাত্ প্রমীয়তে ॥ ১৩ ॥

স হ উবাচ বালাকির্ য এব-এষ শরীরে[1] পুরুষস্ তম্ এব-অহম্ উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। প্রজাপতির্ ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, প্রজায়তে প্রজয়া পশুভিঃ[2] ॥ ১৪ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষ প্রাজ্ঞ আত্মা, যেন-এতত্ পুরুষঃ, সুপ্তঃ স্বপ্নে-আচরতি, তম্ এব-অহম্ উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। যমো রাজা-ইতি বৈ-অহম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, সর্বং হ-অস্মৈ-ইদং শ্রেষ্ঠ্যায় যম্যতে ॥ ১৫ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষ দক্ষিণেঽক্ষন্[3] পুরুষস্ তম্ এব-অহম্ উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্ মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। নাম্নঃ-আত্মা-, অগ্নের্ আত্মা, জ্যোতিষঃ-আত্মা-ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, এতেষাং সর্বেষাম্ আত্মা ভবতি ॥ ১৬ ॥

স হ-উবাচ বালাকির্, য এব-এষ সব্যেঽক্ষন্[4] পুরুষস্ তম্ এব-অহম্ উপাসে-ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, মা মা-এতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। সত্যস্য-আত্মা, বিদ্যুতঃ-আত্মা, তেজসঃ-আত্মা-ইতি বৈ-অহম্ এতম্ উপাসে-ইতি। স যো হ-এতম্ এবম্ উপাস্তে, এতেষাং সর্বেষাম্ আত্মা ভবতি-ইতি ॥ ১৭ ॥

---

১ শারীরঃ।

২ ( অতিরিক্ত ) যশসা ব্রহ্মবর্চসেন স্বর্গেণ লোকেন সর্বম্ আয়ুরেতি।

৩, ৪ অক্ষিণি।

বালাকি বললেন, এই যে শব্দ পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলে ( অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস ), আমি তাকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি একে অসু ( প্রাণ ) বলে উপাসনা করি। যিনি একে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তানেরা কাল পূর্ণ হওয়ার আগে জ্ঞান হারান না ॥ ১২ ॥

বালাকি বললেন, ছায়াতে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে মৃত্যু বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি এবং তাঁর সন্তানেরা অকালে মরেন না ॥ ১৩ ॥

বালাকি বললেন, শরীরে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে প্রজাপতি বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি প্রজায় ( অর্থাৎ সন্তানে ) এবং পশুতে বাড়েন ॥ ১৪ ॥

বালাকি বললেন, এই যে প্রাজ্ঞ আত্মা, যাঁর দ্বারা এই পুরুষ সুপ্ত অবস্থায় স্বপ্নে বিচরণ করে, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে যম ( নিয়ন্তা ) রাজা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে এই সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয় ॥ ১৫ ॥

বালাকি বললেন, ডান চোখে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে নামের আত্মা, অগ্নির আত্মা এবং জ্যোতির আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি এদের সবার আত্মা হন ॥ ১৬ ॥

বালাকি বললেন, বাঁ-চোখে এই যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, মেলা বকিও না। আমি এঁকে সত্যের আত্মা, বিদ্যুতের আত্মা এবং তেজের আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এভাবে উপাসনা করেন, তিনি এদের সবার আত্মা হন ॥ ১৭ ॥

তত উ হ বালাকিস্ তূষ্ণীম্ আস। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, এতাবত্-ন্নু বালাকা (৩)-ই ? ইতি। এতাবত্-হি, ইতি হ-উবাচ বালাকিঃ। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্ মৃষা বৈ কিল মাং সংবদিষ্ঠাঃ-ব্রহ্ম তে ব্রবাণি-ইতি। যো বৈ বালাকে-এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা, যস্য বৈ তত্ কর্ম, স বৈ বেদিতব্য ইতি। তত উ হ বালাকিঃ সমিত্পাণিঃ প্রতিচক্রমে-, উপায়ানি, ইতি। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুঃ, প্রতিলোমরূপম্ এব স্যাত্[১], যত্ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণম্ উপনয়েত[২]। এহি, বি-এব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামি-ইতি। তং হ পাণৌ-অভিপদ্য প্রবব্রাজ। তৌ হ সুপ্তং পুরুষম্ ঈয়তুঃ[৩]। তং হ-অজাতশত্রুর্ আমন্ত্রয়াংচক্রে, বৃহত্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্-ন্ ইতি। স উ হ তূষ্ণীম্ এব শিশ্যে। তত উ হ-এনং যষ্ট্যা বিচিক্ষেপ। স তত এব সমুত্তস্থৌ। তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুঃ, ক্ব-এষ এতদ্ বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট ? ক্ব-এতদ্ অভূত্ ? কুত এতদ্ আগাত্ ? ইতি। তদ্ উ হ বালাকির্ ন বিজজ্ঞৌ ॥ ১৮ ॥

তং হ-উবাচ-অজাতশত্রুর্, যত্র-এষ এতদ্ বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট, যত্র-এতদ্ অভূত্, যত এতদ্ আগাদ্ ইতি। হিতা নাম হৃদয়স্য নাড্যো হৃদয়াত্ পুরীততম্ অভিপ্রতন্বন্তি, যথা সহস্রধা কেশো বিপাটিতস্ তাবদ্ অণ্ব্যঃ পিঙ্গলস্য-অণিম্না তিষ্ঠন্তি, শুক্লস্য কৃষ্ণস্য পীতস্য লোহিতস্য-ইতি। তাসু তদা ভবতি, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি। অথ-অস্মিন্ প্রাণে-এব-একধা ভবতি। তথা-এনং বাক্ সর্বৈর্ নামভিঃ সহ-অপ্যেতি। চক্ষুঃ সর্বৈঃ-রূপৈঃ সহ-অপ্যেতি। শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহ-অপ্যেতি। মনঃ সর্বৈর্ ধ্যানৈঃ[৪] সহ-অপ্যেতি। স যদা প্রতিবুধ্যতে, যথা-অগ্নের্ জ্বলতো সর্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্-ন্ এবম্ এব-এতস্মাদ্ আত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে। প্রাণেভ্যো দেবাঃ। দেবেভ্যো লোকাঃ। তদ্ যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে হিতঃ স্যাদ্, বিশ্বম্ভরো বা[৫] বিশ্বম্ভরকুলায়ে-, এবম্ এব-এষ প্রাজ্ঞ আত্মা-ইদং শরীরম্ আত্মানম্ অনুপ্রবিষ্ট আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ ॥ ১৯ ॥

---

১ তত্-মন্যে।

২ উপনয়েত্।

৩ আজগ্মতুঃ।

৪ ধ্যাতৈঃ।

৫ অবোপহিতো বিশ্বম্ভরো বা...

তখন বালাকি চুপ। অজাতশত্রু বললেন, কি বালাকি? এই পর্যন্তই? বালাকি বললেন, হ্যাঁ এই পর্যন্তই। অজাতশত্রু বললেন, তাহলে মিথ্যেই বলেছিলেন, তোমাকে ব্রহ্ম বলব (অথবা, 'তোমাকে ব্রহ্ম বলব' এমন কথা আর মিছিমিছি বলবেন না)। তিনি আরো বললেন, বালাকি, যিনি এই সমস্ত পুরুষের কর্তা এবং এ (জগৎ) যাঁর কর্ম, তাঁকে তো জানতে হবে। তখন বালাকি সমিৎ-হাতে তাঁর কাছে এলেন—তোমার শিষ্য হতে চাই। অজাতশত্রু তাঁকে বললেন, 'ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে শিষ্য করবে, সে তো উলটো হয়ে যাবে। এস, তোমাকে বিজ্ঞান দিই।' বলে অজাতশত্রু তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেলেন। তাঁরা গেলেন একটি ঘুমন্ত লোকের কাছে। তাকে অজাতশত্রু ডাক দিলেন—হে বিরাট, হে পাণ্ডু-জ্যোতি, হে সোম, হে রাজন্। সে সাড়া না, শব্দ না, ঘুমোতেই লাগল। তখন তাকে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারলেন, সে তক্ষুনি উঠে পড়ল। অজাতশত্রু বললেন, বালাকি, এই লোকটি কোথায় শুয়েছিল? কোথায় ছিল এ? কোত্থেকেই বা এল?' বালাকি জানতেন না। (বালাকির তা জানা ছিল না) ॥ ১৮॥

অজাতশত্রু বললেন, বালাকি, এই লোকটি কোথায় শুয়েছিল, কোথায় ছিল এবং কোথা থেকে এল, শোনো। হিতা নামে হৃদয়ের নাড়ীগুলি হৃদয় থেকে হৃদয়বেষ্টনী পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। একটা চুলকে হাজার ভাগে চিরলে যেমন হয় ততখানি সূক্ষ্ম সেইসব নাড়ী পিঙ্গল সাদা কালো হলুদ এবং লালের অতিসূক্ষ্ম অণুতে পরিপূর্ণ আছে। সেইখানে থাকে পুরুষ, যখন সে ঘুমোয় কোনো স্বপ্ন না দেখে। তখন সে এই প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তখন বাক্ সমস্ত নামকে নিয়ে তার মধ্যে ঢোকে। চোখ সমস্ত রূপ নিয়ে ঢোকে। কান সমস্ত শব্দ নিয়ে ঢোকে। মন সমস্ত ভাবনা নিয়ে ঢোকে। সে যখন জাগে, তখন জলন্ত আগুন থেকে যেমন চতুর্দিকে ফুলকি ওড়ে, তেমনি এই আত্মা থেকে প্রাণেরা (=ইন্দ্রিয়েরা) যে যার জায়গায় চলে যায়, প্রাণ থেকে দেবতারা, দেবতাদের থেকে লোকসমূহ। সে কেমন? না, ক্ষুর যেমন থাকে ক্ষুরের খাপে, আগুন যেমন আগুনের ঘরে, তেমনি প্রাজ্ঞ আত্মা এই শরীর-আত্মায় প্রতিটি লোম প্রতিটি নোখ পর্যন্ত ঢুকে রয়েছে ॥ ১৯ ॥

তম্ এতম্ আত্মানম্ এতে-আত্মানঃ-অববস্তন্তে, যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বাঃ। তদ্ যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ ভুঙ্‌ক্তে, যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি-এবম্ এব-এষ প্রজ্ঞাত্মা-এতৈর্ আত্মভির্ ভুঙ্‌ক্তে। এবম্ এব-এতে-আত্মানঃ-এতম্ আত্মানং ভুঞ্জন্তি। স যাবত্-হ বৈ-ইন্দ্র এতম্ আত্মানং ন বিজজ্ঞে, তাবদ্ এনম্ অসুরা অভিবভূবুঃ। স যদা বিজজ্ঞে-, অথ হত্বা-অসুরান্ বিজিত্য, সর্বেষাং চ দেবানাং সর্বেষাং চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যম্ আধিপত্যং পর্যৈত্। তথা-উ এব-এবং বিদ্বান্ সর্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্বেষাং চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যম্ আধিপত্যং পর্যেতি, য এবং বেদ, য এবং বেদ ॥ ২০ ॥

ইতি কৌষীতক্যুপনিষদি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

## ইতি কৌষীতক্যুপনিষত্ সমাপ্তা

এই ( প্রাজ্ঞ ) আত্মার ওপর নির্ভর করে আছে এই সমস্ত আত্মারা ( অর্থাৎ ইন্দ্রিয়েরা ), যেমন কুলশ্রেষ্ঠের ওপর নির্ভর করে থাকে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন। কুলশ্রেষ্ঠ যেমন আত্মীয়দের সঙ্গে ভোজন করেন, এবং আত্মীয়রা যেমন কুলশ্রেষ্ঠের ( অন্ন ) ভোজন করে, তেমন এই প্রজ্ঞাত্মা এই সমস্ত আত্মাদের ( অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দের ) সঙ্গে ( বিষয় ) ভোগ করেন, এবং এইসব আত্মারা এই প্রজ্ঞাত্মার ( বিষয়কেই ) ভোগ করে। যতদিন না ইন্দ্র এই আত্মাকে জেনেছিলেন, ততদিন অসুরেরা তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে। যখন তিনি জানলেন, তখন অসুরদের মেরে, জয় করে সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য এবং আধিপত্য পেলেন। তেমনি যিনি এঁকে এমন করে জানেন, তিনি সমস্ত পাপ ধ্বংস করে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব স্বারাজ্য এবং আধিপত্য পান যিনি এমন করে জানেন, যিনি এমন করে জানেন ॥ ২০ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

কৌষীতকী-উপনিষদ্ সমাপ্ত

# ভাষ্য

বৈদিক সাহিত্যে শাখাভেদ ছিল। প্রত্যেক শাখার নিজস্ব সংহিতা ব্রাহ্মণ ইত্যাদি থাকা উচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এ-নিয়মের ব্যতিক্রম চোখে পড়ে।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ—এই তিনটি ভাগ ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের। যেমন ঋগ্‌বেদের ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ঐতরেয়ারণ্যক ঐতরেয়োপনিষদ্। কিন্তু কৌষীতকী উপনিষদের বেলায় এরকম কোন পরম্পরা নাই। এটি শাংখায়ন আরণ্যকের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। শাংখায়ন-ব্রাহ্মণ শাংখায়ন-আরণ্যক আর শাংখায়ন-উপনিষদের পরিবর্তে পাই কৌষীতকী উপনিষৎ।

কৌষীতকি কহোল ছিলেন শাংখায়নের আচার্য। এ উপনিষৎ তাঁর নামেই প্রচলিত। এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্যতম প্রবক্তা তিনিই।

কৌষীতকী উপনিষদের নানা পাঠভেদ আছে এবং অধিকাংশ সংস্করণই ভুলে ভরা। প্রকরণ মিলিয়ে শুদ্ধ পাঠ ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন। শঙ্করাচার্য এটির ভাষ্য করে যান নি। এর প্রখ্যাত ভাষ্যকার শঙ্করারণ্য।

উপনিষদ্‌টিতে চারটি অধ্যায়। প্রতিপাদ্য বিষয়—দেবযান পিতৃযান প্রাণবিদ্যা এবং আত্মবিদ্যা।

প্রথম অধ্যায়ে চিত্র গাঙ্গ্যায়নি কথিত ব্রহ্মবিদ্যার নাম পর্যংক বিদ্যা। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী আছে। একটু অদল-বদল করে সেটি ছান্দোগ্য (৫/৩-১০) এবং বৃহদারণ্যক (৬/২) দুটি উপনিষদেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ দুই উপনিষদেই রাজার নাম প্রবাহণ জৈবলি।

আরুণি ও শ্বেতকেতুকে আমরা ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়েও পাই। আরুণি সেখানে ব্রহ্মবিৎ, তবে দেবযান পিতৃযানের উল্লেখ সেখানে নাই। মৃত্যুবিজ্ঞান সম্পর্কে আরুণি সংক্ষিপ্ত একটা বিবৃতি দিয়েছেন, প্রবাহণ বা চিত্রের বিবরণীর মত তা বিস্তৃত ও স্পষ্ট নয়। মনে হয় আরুণি কোনও ক্ষত্রিয় রাজার কাছ হতেই দেবযান পিতৃযানের বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন।

কেউ বলেন তিনি প্রবাহণ জৈবলি, কেউ বলেন তিনি চিত্র গাঙ্গ্যায়নি। আধুনিক পণ্ডিতরা এ থেকে উপনিষদে ক্ষত্রিয়প্রভাবের কথা তুলেছেন।

কথার সূত্রটা অবশ্য প্রবাহণের একটি উক্তিতেই পাওয়া—'ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি'। বৃহদারণ্যকে কিন্তু রাজার এমন দর্পিত ভাব নাই। যাই হোক, মনে হয় এ কেবল কাহিনীতে একটু রং ফলানো। আসলে পিতৃযান-দেবযান-তত্ত্ব বহু প্রাচীন। ব্রাহ্মণরাও তা জানতেন। বৃহদারণ্যকে প্রবাহণ নিজেই শ্বেতকেতুকে বলছেন, 'আমরা ঋষির বচন শুনেছি'। সংহিতা হতে 'দ্বে স্রুতী' ( ১০।৮৮।১৫ ) মন্ত্রটির উল্লেখ করেছেন তিনি। [ বেদ মীমাংসা পৃঃ ১০৫ টী ২৯-৩০, পৃঃ ১৪০ টী ১৯৮, ২১০ ; পৃঃ ১৪৩ টী ২০৩ দ্রষ্টব্য ]।

# প্রথম অধ্যায়

১/১ ॥ **লোক** বলতে চেতনার ভূমি এবং **অন্যতম** বলায় তিনটি পথ সূচিত হচ্ছে। জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি তৃতীয়ং স্থানম্—ক্ষুদ্র প্রাণীরা কেবল আবর্তিত হয়, তাদের বিদ্যার অধিকার নাই। মনুষ্যত্ব মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষসংশ্রয়, শঙ্কর বলেছেন এ তিনটিই দুর্লভ প্রাপ্তি। মানুষ হয়ে জন্মালে তবে বিদ্যাভীপ্সা জাগতে পারে। অবশ্য সে অবস্থাতেও চ্যুতি ঘটে এবং এইটাই দ্বিতীয় স্থান বা পথ। মানুষ তখন ওখানে গিয়েও আবার এখানে ফিরে আসে। লৌকিক ভাষায় তার পুনর্জন্ম হয়। এ-ই পিতৃযান। আলোর অনুভব মৃত্যুর পরে তারাও পায় কিন্তু সে আলো ক্ষয়িষ্ণু। এই হল চন্দ্রলোক বা চন্দ্রমা। লোক-সংস্থানে ভূঃ ভুবঃ স্বর্ তিনটির উল্লেখ রয়েছে। উজ্জ্বল মনোলোকই স্বর্। মৃত্যুর পর এই আভাস্বরতার বোধ জাগলেও অবিদ্বান আবার ফিরে আসে সংসারে। একেই বলা হয়েছে সংসৃতি। আর এগিয়ে যাওয়াটা প্রেতি। কে যেন আমায় পিছন থেকে ঠেলছে অগ্রাভিযানের পথে। কে আর? ঠেলছেন জাতবেদা অগ্নি স্বয়ং। প্রেতির পরিণামে যে আর ফিরল না সংসারে তারই উৎক্রান্তি বা দেবযানে গতি। এইটাই **অন্যতম লোক**।

আরুণি শ্বেতকেতুর মুখে চিত্রের প্রশ্ন শুনে বললেন, এ তো আমিও জানি না। চল, আমরা বিদ্যা আহরণ করে আনি তাঁর কাছ থেকে।

আরুণি বেদাচার্য হয়েও নিরভিমান। বিদ্যার্থীর মতই সমিৎপাণি হয়ে উপস্থিত হলেন ক্ষত্রিয় রাজার সভায়। সাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে চিত্র বললেন, আপনি **ব্রহ্মগ্রাহী**—ব্রহ্মকে গ্রহণ করতে সত্যই উৎসুক বটে। এরপর তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন তাঁরা।

১/২ ॥ **যে বৈ কে চ**—যে কেউ, যে কোন প্রাণীই হোক না কেন, এই লোক হতে প্রয়াণের পর সে চন্দ্রমায় যায়। **প্রযন্তি** ক্রিয়াটি প্রেতির সমধাতুজ—প্র+ √ই+অন্তি। মৃত্যু ও সমাধি এক পর্যায়ে পড়ে, উপনিষদে এ ধরণের কথা আছে। নিদ্রা মৃত্যু ও সমাধি—তিনটিই যোগীর

কাছে চেতনার সংহরণ মাত্র। সজ্ঞান মৃত্যুই বৈবস্বত বা জ্যোতির্ময়। ঘুমেও সহজ মনোলয়ের অবস্থা এসে যায়। সজাগ থেকে এমনি ভাবে মনকে প্রাণে লয় করে দিলেই বলা যায় 'নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ'। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে এই রহস্যের কথাই বলেছেন। সুষুপ্তির বিজ্ঞান জানলেই মৃত্যু হয় প্রেতি—এগিয়ে চলা, চেতনার উত্তরণ। তখন √মৃ-ধাতুর অর্থ নিবে যাওয়া নয়, জ্বলে ওঠা। মৃত্যু তখন জ্যোতির্ময় একটা বিস্ফারণ বা প্রস্রোত।

সুষুপ্তিতে আমরা প্রতিদিনই সেই বৃহজ্জ্যোতিকে ছুঁয়ে আসি। উপনিষদে তাই বলা হচ্ছে প্রাণ অহরহ ব্রহ্মে নিয়ে যাচ্ছে। এ একটা সাধারণ ব্যাপার।

আলো যখন অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে যায় তখন তার জ্যোতি হয় ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর। সংহরণে সেই আলোকরশ্মি পুঞ্জীকৃত হয়ে প্রভাস্বর জ্যোতির্বিম্বরূপে জ্বলে ওঠে। তখন অন্তরে আপনিই প্রশ্ন ওঠে—কে তুমি? জীবহৃদয়ে শাশ্বতকাল ধ্বনিত হয়ে চলেছে এ-প্রশ্ন। বলা বাহুল্য যে, চেতনা অন্তরাবৃত্ত হলে তবেই এ-প্রশ্ন জাগে। বহির্মুখ চেতনায় এ প্রশ্ন জাগে না। অবশ্য কথা হল প্রত্যাহার চেতনার ধর্ম। আজ হোক কাল হোক একদিন গুটিয়ে সে আসবেই। তখন ওই প্রশ্নও উঠবে। যার জীবনে যার চিত্তে এ-প্রশ্ন জাগেনি, অন্তকালে তার হৃদয়েও এ-প্রশ্ন ধ্বনিত হয়। এ-উপনিষদে সেইটিই চন্দ্রমার বা আভাস্বর মনোলোকের প্রশ্ন।

পুরুষ-সূক্তে আছে বিরাট পুরুষের মনই চন্দ্রমা। জ্যোতির্ময় চেতনার তিনটি প্রতীক ঋষিরা গ্রহণ করেছিলেন। এক পার্থিব অগ্নি, অরণিমন্থনে তা জ্বলে ওঠে। অর্থাৎ পার্থিব চেতনা সেখানে সব চেয়ে প্রচ্ছন্ন বা নিগূহিত। এরপর আছেন চন্দ্রমা, তার হ্রাস-বৃদ্ধি রয়েছে, কলায় কলায় তা বাড়ে বা কমে। প্রাকৃত মনও এমনই। তৈত্তিরীয়ে আছে, ব্রহ্মকে যে জানে না অথবা যে জানে চেতনার সংহরণে বা মৃত্যুতে তারা উভয়েই ব্রহ্মে যায়। এ-উপনিষদে তাকেই বলা হয়েছে চন্দ্রলোকে যাওয়া। উপনিষদে প্রেত্য একটি বহুপ্রযুক্ত শব্দ—অর্থ, এগিয়ে যাওয়া। অগ্রগতি প্রাণের ধর্ম। এ-গতি ব্যাহত হয় মৃত্যুতে। অবিদ্বানও মৃত্যুর পর জ্যোতির্ময় লোকে যায়। কিন্তু সেখান হতে আবার সে ফিরেও আসে। চেতনার এ-উত্তরণ ঋক্‌সংহিতায় প্রেতি। অগ্নি তার প্রবর্তক বা নেতা। তাই তাঁর এক সংজ্ঞা 'প্রেতীষণি'।

বিদ্বানের বেলায় 'প্রেতি' লোকোত্তরে উত্তীর্ণ হওয়া। তাঁর অনুভব

চন্দ্রমার মত ক্রমক্ষীয়মাণ জ্যোতিশ্চেতনা নয়। এইখানেই পাই আদিত্য-ভাবনা। আদিত্যজ্যোতি অক্ষীয়মাণ।

এর মধ্যে একটা কথা আছে। প্রাকৃত মনের প্রতীক যে-চন্দ্রমা, তার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে নিশ্চয়। কিন্তু বিদ্বানের মন? যে-মন দিব্য? প্রাচীনেরা তাই দুটি চন্দ্রমার কথা বলতেন। একটি আদিত্যের এপারে আরেকটি আদিত্যের ওপারে (বৃ. আ. উপনিষৎ দ্র.)। এই দ্বিতীয় চন্দ্রমাই তন্ত্রের ষোড়শী নিত্যকলা। সূর্যেরও উদয়াস্ত আছে, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন আছে। কিন্তু এই চন্দ্রমার তা-ও নাই।

চিত্র বলছেন **প্রাণৈঃ পূর্বপক্ষ আপ্যায়তে।**

প্রাণও চাঁদের মত কলায় কলায় বাড়ে। তন্ত্রের কুমারীপূজা তাই শিশু সোমকলা বা উপচীয়মান প্রাণশক্তিরই আপ্যায়ন। বৈষ্ণবের চন্দ্রাবলী চাঁদের পঞ্চদশকলারই প্রতীক। শ্রীমতী ষোড়শী নিত্যা। পূর্ব বা শুক্লপক্ষে প্রাণের স্ফূর্তি এবং পূর্ণতা ঘটে। **আপ্যায়তে** ফাঁপিয়ে তোলে। আমার প্রাণ চন্দ্রের পূর্বপক্ষকে আপূরিত করে—অর্থাৎ ব্যষ্টিপ্রাণ যেন লয় হল চন্দ্ররশ্মিতে, এমনি এক দৃষ্টিভঙ্গি। এটি আহুতির, আত্মোৎসর্গের ভাব। যে-ভাব নিয়ে দেহের অগ্নি-সংকারকে বলা হয় অন্ত্যেষ্টি, শেষ আহুতি—এ তাই।

গীতায় অর্চিঃপথপ্রসঙ্গে দিবা শুক্লপক্ষ ইত্যাদি ক্রমবর্ণিত হয়েছে—এটি দেবযান। পরে এ সম্পর্কে আরও বিশদ করে বলা হবে। কিন্তু 'প্রেত' যদি কৃষ্ণপক্ষের আওতায় পড়ে তাহলে সে আবার এই মর্ত্যে ফিরে আসে। এ-ই পিতৃযান। **প্রজনয়তি** চন্দ্রমা তাকে ফিরে পাঠান।

**চন্দ্রমা** যে স্বর্গলোকের দ্বার এখানে সে কথা স্পষ্টই বলা হয়েছে। **স্বর্গলোক** এখানে ব্রহ্মলোক। উপনিষদে লোকদ্বারের কথা আছে, আছে বিদৃতি ও নান্দন দুয়ারের কথা। চন্দ্রমা এখানে যেন সেই সূর্যদ্বারের (মুণ্ডক ১/২/৫) দ্বারী।

**যঃ ত্বং প্রত্যাহ** যে তাঁর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে। এই প্রশ্নোত্তর জীবহৃদয়ে চলছেই। তন্ত্র বলছেন, 'সোঽহং-হংসঃ-পদেনৈব জীবো জপতি সর্বদা। কিন্তু এ-অজপা জপ সম্বন্ধে অবিদ্বানের কোন জ্ঞান নাই। নিজের অজানিতে তাঁর হৃদয়ে 'কে আমি' এ প্রশ্নের উত্তর অনাহত ধ্বনিতে নিত্য ছন্দিত হয়ে চলেছে। বিদ্বান এ-তত্ত্ব জানেন। মৃত্যুর পরও যাঁর সেই তত্ত্বজ্ঞান অটুট থাকে তিনিই চন্দ্রমাকে প্রত্যুত্তর দিতে পারেন। চন্দ্রমা

তখন সেই বিদ্বানকে অতিস্সৃজতে। √ সৃজ্—release, cause to flow মুক্ত করা, প্রবাহিত করা। বিদ্বান এ-জগতের সংসৃতি হতে মুক্তি পেয়ে তাঁর দ্বারা দেবযান পথে প্রেরিত হন। তাঁকে বা তাঁর প্রাণস্রোতকে চন্দ্রমা ঊর্ধ্বপরিণামের পথে, লোকোত্তরের পথে বইয়ে দেন। আর যে ওই শাশ্বত প্রশ্নের উত্তর জানে না, সে বৃষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়ে এখানে। অর্থাৎ সংসারে পুনর্জন্ম হয় তার।

বর্ষায় প্রাণ ও জীবশক্তির পুষ্টি ঘটে এ নিত্য প্রত্যক্ষ। তখন অপ্‌শক্তির ক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় চলে। তার পিছনে তেজ বা চন্দ্রমার ক্রিয়াকারিতা। জড় (পৃথিবী) নিষিক্ত হন অপ্‌শক্তিতে। চন্দ্রমা-নিঃসৃত প্রাণ বিদ্যুন্ময় করে তাকে। আরও বৈজ্ঞানিকভাবে বলতে গেলে পৃথিবী হতে রস আহরণ করে সূর্যরশ্মি সেই রসকে সৌরশক্তিতে অভিষিঞ্চিত করে। সে-রস প্রাণময় অপ্‌রূপে বর্ষায় ঝরে পড়ে। আদিত্য হতেই সে রেতঃ বা প্রাণসংবেগ আভৃত হয়, এ-কথা একটু পরেই বলা হয়েছে।

জীবজন্মের পর্যায়টি বেশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিবৃত করা হয়েছে এখানে। তবে কিনা ক্ষুদ্র প্রাণী হতে শুরু করে ক্রমে জলচর খেচর ও ভূচর প্রাণীর উল্লেখ থাকলেও এ কিন্তু অভিব্যক্তিবাদের (Evolution theory) পোষকতা করছে না কিছু। কর্ম ও বিদ্যানুযায়ী জীব এর যে কোনও বর্গে জাত হতে পারে—বক্তার বলার উদ্দেশ্য এই-ই। **কর্ম** অর্থাৎ তপস্যা এবং **বিদ্যা** অর্থাৎ সত্যোপলব্ধির বল থাকলে সে বারবার মনুষ্যজন্ম নিয়ে অবশেষে আবারও একদিন চন্দ্রলোকে গিয়ে সেই মহাপ্রশ্নের সম্মুখীন হবে, কোঽসি?

এখানে 'বিচক্ষণাত্ রেত আভৃতম্' বা 'বিচক্ষণাত্ পঞ্চদশাৎ প্রসূতাৎ রেত আভৃতম্ পিত্র্যাবতঃ' দুই রকম অন্বয়ই হতে পারে।

মরণোত্তর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিদ্বান তাঁর প্রশ্নকর্তাকে সম্বোধন করলেন ঋতবঃ। কালের প্রাচীন পরিভাষা ছিল ঋতু। ঋক্‌সংহিতায় দেবযানের সঙ্গে ঋতু বা কালের উল্লেখ রয়েছে। দেবযানের পথে চলতে হলে কাল বুঝে চলতে হয়। আর, সে-পথের পরম লক্ষ্য আদিত্য। আদিত্যই দ্বাদশ মাস বা ছয় ঋতু-সমন্বিত সংবৎসর। সংবৎসর সম্বন্ধে সচেতনতা বা কালের একটি পূর্ণমানের জ্ঞান জাগাই ঋতুচক্র-জ্ঞান। যিনি সম্যক্ প্রতিবুদ্ধ, তিনি চক্রবর্তী। কালাতীত হয়ে তিনি অহোরাত্রির আবর্তন, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নে ঋতুর আবর্তন দেখে চলেন। সুতরাং

এ-উপনিষদে 'ঋতবঃ' এই সম্বোধনের অর্থ, হে সংবৎসর হে আদিত্য (আধুনিক ভাষায়, হে মহাকাল)। চন্দ্রমার প্রশ্নের উত্তরে বিদ্বান আদিত্যকেই সম্বোধন করছেন, চন্দ্রলোকের পিছনে তাঁর জ্যোতিঃশক্তিই ক্রিয়াশীল। তিনি **বি-চক্ষণ** সর্বদর্শী বিশ্বতশ্চক্ষু। এখন বিচক্ষণ বললে আমরা কথাটায় কর্তার কৃতিত্বের আভাস পাই। তা-ও সত্য। আদিত্যের দৃষ্টিই যে সৃষ্টি। তাঁর ঈক্ষণেই বিশ্বে এই বহুর মেলা, ভুবনে ভুবনে প্রপঞ্চোল্লাস। তিনি Perennial light অক্ষীয়মাণ আলোকাধার এবং all-seeing power—একাধারে দুই-ই। তাঁর ঈক্ষাতেই রেতঃ আভৃতম্। রেতঃ রয়ি (urge to create) প্রাণসংবেগ। **আভৃতম্** ঘনীভূত হল। প্রশ্নোপনিষদে পাই 'মূর্তিরেব রয়িঃ রয়িরেব চন্দ্রমাঃ'। এখানে 'রেত আভৃত হল' বলে সেই ভাবটিই বোঝান হয়েছে। সংহিতায় আছে 'কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।' এই 'মনসো রেতঃ'-ই বিচক্ষণ হতে রেতের আ-ভরণ। ছান্দোগ্য উপনিষদে অনুরূপ উক্তি হল 'তদৈক্ষত বহু স্যাম্'—তিনি ঈক্ষণ করলেন, আমি বহু হব। তারপর তেজ অপ্ অন্ন এই ক্রমে সৃজন। এখানেও বলা হচ্ছে বিচক্ষণ হতেই রেত আভৃত হয় **পঞ্চদশ** কলাত্মক চন্দ্রমায়। চন্দ্রমা **পিত্র্যাবান্** বা পিতৃশক্তির আধার অর্থাৎ জীবের প্রজননশক্তির ভাণ্ডার ওই চন্দ্রলোক। ওকেই পিতৃলোক বলা যেতে পারে; তবে এটি মর্ত্যপিতৃগণের বাসভূমি। সংহিতায় মর্ত্য-পিতৃগণ ও দেবপিতৃগণের কথা রয়েছে (১০।৮৮।২৫)। যাঁরা মানবাবর্তে আদৌ আবর্তিত হন না তাঁরা দেবপিতৃগণ। আর যাঁরা তা হন তাঁরাই মর্ত্যপিতৃগণ।

বিদ্বান বলে যান **তৎ মা** আমি সেই প্রাণসংবেগ, বিচক্ষণ হতে আভৃত সেই রেতঃ। সে-প্রাণশক্তিকে তোমরা পাঠিয়ে দিলে **কর্তা-পুরুষে**। কর্তা ও পুরুষ সমার্থক, পিতা হলেন দেহনির্মাতা। মীমাংসাসূত্রে অবশ্য পিতাকে কর্তা বলা হয়েছে। জীববিদ্যা বলে, সন্তান পুত্র হবে না কন্যা তা পিতৃবীজেই নির্ণীত হয়। তার কারণ শুক্রেই এক্স এবং ওয়াই দ্বিবিধ ক্রোমোজোম থাকে। মাতার ডিম্বকোষে কেবল ওয়াই জাতীয় প্রাণতন্তু। অতএব সৃষ্টিব্যাপারে মাতার ভূমিকা গৌণ, পিতাই মুখ্য। কথাটা অন্যভাবেও সত্য, বীজাধান পিতাই করেন।

পুরুষ কর্তা হয়ে **মাতাতে** রেতঃ নিষিক্ত করলে সেই আমি বারবার জাত

হলাম। হতে হতে আমি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ-উপমাসাত্মক সংবৎসর হয়ে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ-উপমাসাত্মক পিতাকে পেলাম।

এই উপমাস হল স্মার্তমতে মলমাস। ওই মাসে কোন ক্রিয়াকর্ম হয় না। শৈবতন্ত্রে কিন্তু ওটির নাম অধিমাস এবং ওই মাসটি সাধনার পক্ষে প্রশস্ত। স্মার্তকর্ম বর্জন করে অন্তর্যাগে ডুবে যেতে হবে। এইভাবে দুটি মতের সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। তন্ত্রের দৃষ্টি শ্রৌত।

ঋগ্বেদে উপমাসের নাম ছিল বারুণ মাস। পাঁচটি বছরের আলাদা আলাদা নাম ছিল এবং প্রাচীনকালে যুগবিভাগে পাঁচ বৎসরেই একটা যুগ ধরা হত—যজুর্বেদে আমরা তার উল্লেখ পাই। যুগান্তে বারুণ মাস। বার মাসে সংবৎসর বা সৌর বৎসর। প্রতি তৃতীয় বছরে তের মাসে চান্দ্র বৎসর। উপমাসটিতে সৌর ও চান্দ্র বৎসর মিলে যায়। সাধনায় এই মিলনই প্রত্যাশিত। কারণ চন্দ্র হতে আমি চাই না, চাই ক্ষয়োদয় রহিত আদিত্য হতে। অতএব **দ্বাদশ-ত্রয়োদশ** বা সৌর ও চান্দ্র বৎসর দুটি মিলিয়ে যখন আমি পূর্ণ হলাম তখনই আমি পিতার সঙ্গে যুক্ত হলাম। এই পিতা বিচক্ষণ। আসল কালপরিমাণ আদিত্যকে দিয়েই। চান্দ্রমাস হল চাঁদের গতি দিয়ে সূর্যের উদয়কাল পরিমাপ করা। আদিত্যই দ্বাদশ-ত্রয়োদশ-উপমাসের অধিপতি।

বিদ্বান বলছেন, যতবার জাত হয়েছি ততবারই একবার জেনেছি আবার ভুলেছি। আমার জন্মজন্মান্তর সবই আজ ভাসছে আমার সামনে। এ সবই যে সম্ভূতির সত্য ( **পঞ্চদশাৎ প্রসূতাৎ** )। হে ঋভুগণ হে সংবৎসর-রূপী আদিত্য, এবার আমায় **অমৃত্যুতে** আপূরিত কর। আমার সমস্ত অতীত সংহত হোক এক ক্ষণশাশ্বতী চেতনায়। একটি ক্ষণে উদ্‌ভাসিত হোক জন্মজন্মান্তর। অমৃত আস্বাদ করি আমি।

এর আগে 'যথাকর্ম যথাবিত্তম্' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিদ্বান বলে চললেন, আমি তপস্যা করেছি সত্যকে জানবার জন্য। সেই তপস্যাই কর্ম আর সত্যজ্ঞানই বিদ্যা। সত্য ও তপস্যার বলে আমি জেনেছি আমিই ঋতু আমি কালরূপী সংবৎসর। আর্তবও আমি—কালজাত সবই আমি। এরপরও যদি প্রশ্ন কর কে তুমি, বলব তুমিই আমি।

তখন চন্দ্রমা সেই বিদ্বানকে জীবাবর্তের আকর্ষণ হতে মুক্ত করে পাঠিয়ে

বা ছুঁড়ে দিলেন লোকোত্তরের পথে। সোজা কথায়, তাঁকে ব্রহ্মলোকের দ্বার ছেড়ে দিলেন।

১।৩॥ কৌষীতকীর চন্দ্রলোক ছান্দোগ্যে ব্যবর্তনা বা ছাড়াছাড়ির জায়গা। এ একটা সন্ধিভূমি। যাঁরা মানবাবর্তে আবর্তিত হন তাঁরা মর্ত্য-পিতৃগণ। আর উজিয়ে যান যাঁরা, সংহিতার ভাষায় তাঁরা দেব-পিতৃগণ ( ঋ ১০/৮৮/১৫ )। দেবযান পথ এই দেবপিতৃগণের এবং চন্দ্রমা দেবযানেরই দ্বারপাল। অর্থাৎ এ-যাত্রা হল মনের ওপারে চলে যাওয়া। আমাদের মনের ব্যবহার জাগ্রতে। বেদে মনের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক। বৈদিক বলবেন স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে মন থাকে। স্বপ্নে মন অন্তর্মুখ কিন্তু তার ব্যবহার জাগ্রতের প্রায় অনুরূপ। সুষুপ্তিতে তা-ও যেন নাই। অথচ মন যদি না-ই থাকে তাহলে আমি সুখনিদ্রায় সুপ্ত ছিলাম কে তা স্মরণ রাখে? মনোলয়ের এ-ধারাকে আবৃত-চক্ষু ( ঘুমের সময় চোখ কিন্তু বোজাই থাকে !) হওয়া বলতে পারি। ব্যবহারিক মনকে ছাপিয়ে অন্তরাবৃত্তির যে-পথ, সেইটিই দেবযান। তার চরম লক্ষ্য ব্রহ্মলোক বা ধাম।

দেবযানের পথে বিদ্বান কিভাবে এগিয়ে চলেন এখানে তার একটা ধারা দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে। দেবতারা ব্রহ্মের বিভূতি। মূলে তিনি 'একং সৎ' কিন্তু 'বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ( ঋ ১/১৬৩/৪৬ )। তাই দেবযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে এখানে পরপর কয়েকটি লোকের নাম করা হয়েছে। তা থেকে সাধনার তিনটি ধারার নির্দেশ মেলে।

সংহিতার ঐ মন্ত্রে অগ্নি-ইন্দ্র-মিত্র-বরুণ এবং অগ্নি-মাতরিশ্বা-( আদিত্য ) যম, এই দুটি ক্রমের উল্লেখ পাই। অগ্নি অবশ্য সর্বত্রই আদি দেবতা। এ-উপনিষদে আবার অগ্নি-বায়ু-আদিত্য-বরুণ-ইন্দ্র-প্রজাপতি—এইভাবে দেবতা-বিন্যাস করা হয়েছে। ফলে মনে হয় গতিপথের বর্ণনায় এখানে দুটি ধারার মিশ্রণ ঘটে যাচ্ছে।

অগ্নি-ইন্দ্র-প্রজাপতি-ব্রহ্ম—যজ্ঞপথ।

অগ্নি-ইন্দ্র-মিত্র-বরুণ—প্রজ্ঞাপথ।

অগ্নি-বায়ু-আদিত্য-যম—যোগপথ।

এবার লোকের কথা। লোকভাবনার মূলে ব্যাপ্তিচেতনা, প্রাণলোক বললে বুঝতে হবে শুদ্ধ প্রাণভূমি। সাংখ্যে তন্মাত্রের কথা রয়েছে। ইন্দ্রিয়দ্বারে সাধারণত যে-মাত্রাস্পর্শ ঘটে তা ব্যামিশ্র। সাংখ্যবাদী তাকে

বিশ্লেষণ করে শুদ্ধ রস শুদ্ধ রূপ ইত্যাদি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বে ভূতগুণের ব্যামিশ্রতা নাই। যেমন, রূপতন্মাত্র বললে বুঝব তেজো-ভূতের শুদ্ধ রূপসত্তায় পর্যবসান, রসতন্মাত্র বললে বুঝব অপ্‌ভূতের শুদ্ধ রসসত্তায় পর্যবসান, এইরূপ। সাংখ্যের এই ভাবনানুযায়ী কোন একটি তত্ত্বে মনোনিবেশ করে তার শুদ্ধ সত্ত্বের বিস্ফারণ ঘটালেই লোকভাবনা আসে।

মনের ক্রিয়াপ্রণালীতে আমরা সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ দুটি দিকেরই আভাস পাই। কোনও একটা বস্তু সম্পর্কে তার রূপরসগন্ধ সব মিলিয়েই একটি অখণ্ড ধারণা জন্মায় আমাদের। আবার কিছু যখন খাই তখনও সব মিলিয়ে সেটি আস্বাদন করি অথচ নেপথ্যে তার সবগুলি গুণের পৃথক পৃথক বোধও থাকে। মাত্রাস্পর্শের যে-কোন একটিতে সংযম করলে পরিণামে তৎসম্পর্কিত বোধ আপনিই বিস্ফারিত হয়। জল জমে বরফ হয়ে নলটি ফাটিয়ে দেয় এ একটা সাধারণ নিয়ম। লোকভাবনার মূলেও এমনি একটা ব্যাপার। আগে কোন তত্ত্বে চিত্ত সমাহিত করে পরে যখন শুদ্ধ সেই তত্ত্বটি ধরেই ব্যাপ্তিবোধ জাগে তখনই আমরা মনোলোক প্রাণ বা বায়ুলোক ইত্যাদির আভাস পাই।

অগ্নি—দশম মণ্ডলে তপঃসূক্ত দ্রষ্টব্য। ক্রিয়াবিশেষ বা ভাবনা দ্বারা দেহের সাধারণ তাপ বাড়িয়ে তোলা যায়। সেই তাপ সংহত হয়ে মেরুদণ্ড পথে উজান বেয়ে মূর্ধন্যকমলে সঞ্চিত হবে—এই হল অগ্নিচয়নের মূল রহস্য। একে চলতি কথায় বলা যায় মাথা গরম হওয়া। ধ্যানধারণায় এটি সহজেই হতে পারে। তারপর ওই আগুনই যেন ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বময় এমনি বোধ জাগা স্বাভাবিক। পৃথ্বীস্থান অগ্নিই দ্যু-মূর্ধায় গিয়ে হবেন বৈশ্বানর—বৈদিকরা কথাটা এইভাবে বলতেন। তখনই অগ্নিলোক দেখা দেয় সাধকের চেতনায়।

বায়ু—ছান্দোগ্য সংবর্গবিদ্যা দ্রষ্টব্য। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যা প্রাণ অধিদৈবত-দৃষ্টিতে তা-ই বায়ু। বায়ুভাবনার সময় চিদগ্নির শিখা কোথায় যাবে? বলা হচ্ছে বায়ুতে সব লয় হয়ে যায়। বাইরের জগতে দেখি ঘরে আগুন জ্বালানোর পর তা নিভে গেলেও বাতাস গরম থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস বোঝাতে একটি ধাতু আছে অন্—আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্। ভিতরে শ্বাস টেনে নেওয়ার সময় একটা শীতলতার বোধ জাগে। বেদমন্ত্রে রুদ্রকে বলা হচ্ছে জলাষভেষজ ( ঋ ১/৪৩/৪, ৮/২৯/৫ ) রুদ্র যখন চলেছেন শীতল ভেষজে

সব অনাময় করে দিচ্ছেন তিনি। এ-ও ওই আভ্যন্তরীণ স্পর্শবোধেরই ইঙ্গিত। এই বোধ বিস্ফারিত করতে পারলেই বায়ু থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তখন একসঙ্গে আলো এবং আনন্দের উপলব্ধি আসে। এটি যুগপৎ আদিত্য ও সোমের অনুভব, দর্শনের ভাষায় চিদানন্দ। এ-ও কিন্তু থাকবে না মিলিয়ে যাবে। তারপর জাগবে শূন্যতার বোধ, ভিতরটা ফাঁকা হয়ে যাবে।

উত্তরণের ধারায় পরপর এ-ক'টি অবস্থা আসবেই। ব্রহ্ম বরুণ আর যম তিনটিই ফাঁকা। এক মহাশূন্যতা। বরুণের শুনম্ বা শূন্যতার কথা সংহিতায় অনেক আছে। কঠোপনিষদে বৈবস্বত যম বলেছেন অনিরুক্ত লোকের কথা, যেখানে কিছুই ভায় না। এইটিই ব্রহ্মলোক নয় কি? তৈত্তিরীয় উপনিষদের শান্তিপাঠে বায়ুকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলা হয়েছে এ-প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য। আবার সংহিতায় দেখি মরুদ্গণের মাতা পৃশ্নি ব্রহ্মসংস্পর্শের দেবতা। বায়ু নিরোধের পথে গিয়ে বৈবস্বত মৃত্যুর অনুভব বা ব্রহ্মবিজ্ঞান তাই প্রাচীনদের সুপরিচিত একটি পন্থা।

সংক্ষেপে বলতে গেলে পৃথিবী প্রাণ ও প্রজ্ঞা—লোক এই তিনটি। অধিদৈবত দৃষ্টিতে প্রাণলোকই বায়ু বা ইন্দ্র। বায়ুকে ধরলে পার্থিব চেতনার সঙ্গে যোগ থাকে আর ইন্দ্রকে ধরলে সেখানে যোগ ঘটবে প্রজ্ঞার সঙ্গে। এক্ষেত্রে কেনোপনিষদের সেই ইঙ্গিত স্মরণীয়—ইন্দ্রই প্রথম জেনেছিলেন ব্রহ্মতত্ত্ব। পরম ব্যোমে উমা হৈমবতীর দর্শন তিনিই পান।

কৌষীতকীতে উত্তরায়ণের বিবরণ দিতে গিয়ে পৌর্বাপর্য তেমন ভাল করে রাখা হয় নি। দেবযানে চেতনার যে-সব ভূমি রয়েছে এখানে যেন একধার থেকে তার সবই বলে যাওয়া হচ্ছে। আদিত্যলোকের পর যে বরুণলোকের কথা আছে তিনি জলের দেবতা হতে পারেন। পুরাণমতে বরুণ জলাধিপ। সংহিতায় আকাশরূপী যে বরুণ তিনি আর এই বরুণ এক নন।

কিন্তু এ-উপনিষদে **ইন্দ্র** ও **প্রজাপতিকে** যে পরপর ধরা হয়েছে এই ক্রমটি ব্যঞ্জনাবহ। ইন্দ্রলোক পর্যন্ত বিধানের ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। তারপর ঘটে ব্যক্তির বিস্ফারণ। এই বিস্ফারণেই প্রজাপতির সাধর্ম্য লাভ হয়। ইন্দ্রলোক পর্যন্ত আমি দেবযানপথে একাই চলেছি। তারপর যেন একটা জগৎ ফুটে উঠল সামনে। এটি বৃহত্তের চেতনা। সংহিতায় এজন্য অনেক

জায়গাতেই ইন্দ্রের সঙ্গে বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। একটা লক্ষ্য ধরে এগিয়ে চলতে চলতে লক্ষ্যে পৌঁছে যেন দেখলাম আরও কত-কি রয়েছে সেখানে। এই বহুত্বের বোধই প্রাজাপত্য চেতনা। 'অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়'—উপনিষদের এই প্রসিদ্ধ পদে প্রজাপতির ভাবটি পাই। এই-ই ব্রহ্মের বি-ভূতি—তিনি বহু হয়েছেন, হচ্ছেন। নির্বিশেষ ব্রহ্ম কেবল প্রতিষ্ঠা, সম্ভূতির বোধমাত্র, সেখানে শুদ্ধ সন্মাত্র—একং সৎ। প্রজাপতিলোকে ফুটছে তাঁর অনন্ত বি-ভূতি।

এরপর **ব্রহ্মলোক**।

ব্রহ্মলোকের এই বর্ণনাতেই কৌষীতকীর অনন্যতা। আর কোন উপনিষদে এ ধরণের বিবৃতি পাওয়া যায় না। এ নিয়ে পরে কেউ আলোচনাও করেন নি। একেবারে যেন লুপ্ত হয়ে গেছে উপনিষদের এ-ভাবনা। অথচ ইতিহাসপুরাণে এবং তন্ত্রে ব্রহ্মলোকের এ-বর্ণনা বিধিমতে পল্লবিত হয়েছে। শঙ্করাচার্য কৌষীতকী থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন অথচ এর ভাষ্য করেন নি। ব্রহ্মলোকের এ-বর্ণনা মানতে গেলে তাঁর অদ্বৈতবাদ টিকত না।

**আরঃ হ্রদঃ** আরাৎ…দূরে। বেদেও এ-অর্থ পাই। তাহলে আরঃ হ্রদঃ বলতে যেন অনেক দূরের এক ছবি। বহু দূর হতে বিশাল জলরাশি টলমল করছে দেখলে যেমন লাগে তেমনি একটি ব্যঞ্জনা রয়েছে শব্দটিতে (একটা shimmering light—প্রভাতরল জ্যোতি?)। সংহিতায় নীহারিকার উল্লেখ আছে, 'নীহারেণ প্রাবৃতা' (১০।৮২) সবই যেন নীহারিকায় ছাওয়া। শ্বেতাশ্বতরে ব্রহ্মদর্শনের প্রাগ্‌ভূমিক যে-জ্যোতিগুলির তালিকা রয়েছে তার সুরুতেই নীহার (২।১১)। বলা যেতে পারে ইন্দ্রিয়চেতনার সর্ববিধ চমক কাটলে তবে ব্রহ্মদর্শনের যোগ্যতা জন্মায়। অথবা, আর হ্রদকে অনন্ত অবকাশও বলা যায়। ব্রহ্ম ও আমার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, ও যেন তারই প্রতীক। কেবল মনোবলেই যে তা পার হওয়া যায় একটু পরে স্পষ্ট বলা হয়েছে সে কথা।

**যেষ্টিহাঃ মুহূর্তাঃ** যেষ্টিকে যা হনন করে তেমনি সব মুহূর্ত। √যজ ধাতু নিষ্পন্ন যষ্টি ও ইষ্টি দুয়ে মিলে যেষ্টি? ইয় উচ্চারণটি তির্যক হয়ে গেছে। যজ্ঞে যেসব লোক জয় করেছিলাম তা সবই মিলিয়ে গেল এমন একটা মুহূর্ত এল তখন। আরঃ হ্রদঃ যদি অসীম দেশ-জ্ঞানের সূচনা করে তো যেষ্টিহাঃ

মুহূর্তাঃ অনন্ত-কাল-জ্ঞানসূচক। মুহূর্ত বহুবচন কেন না কালজ্ঞান ক্ষণের সন্ততি।

মুণ্ডকে আছে, 'ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠম্ (১।২।১০) প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ' (১।২।৭) ইত্যাদি। গীতায় ইষ্টাপূর্ত সহায়ে লোকজয় সম্পর্কে রয়েছে 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'। কঠতেও আছে—'ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতেত হি ধ্রুবং তৎ। সংহিতায় কিন্তু ঠিক এ মত ছিল না। ইষ্টাপূর্ত দ্বারাও শাশ্বত লোক পাওয়া যায় এ ধরণের উক্তি আছে সেখানে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে যদি ওপারের সোমকে জানি তবে এই সোমযাগ দ্বারাই লোক-জয়ী হতে পারি। ওপারের সোম কি তা ভুলে যাওয়ার পরে সোমযাগের মান খাটো হয়ে গেছে। আবার সাংখ্যবাদীরা যজ্ঞ করতেন না। ইষ্টাপূর্তের ফল অনিত্য তাঁরাই এ-মতের প্রচারক ও সমর্থক। উপনিষদ্ দুয়ের মাঝামাঝি তাই অদৃঢ় বলেও মুণ্ডকে আবার ব্রহ্ম ও যজ্ঞ দুই-ই সত্য বলা হয়েছে।

লোকৈষণা যখন ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায় সেই কালই যেষ্টিহা। এছাড়া আরেকটা ব্যাখ্যাও সম্ভব। পার্থিব কাল বিনাশী, তার উৎপত্তি-বিলয় রয়েছে। পঞ্চদশকলাত্মক চন্দ্রমা এবং আদিত্যের অহোরাত্র পর্যায়ে আমরা ওই ক্রমক্ষীয়মাণ কালকেই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু কালের অবক্ষয় নাই যেখানে, ষোড়শী কলার ধ্রুবজ্যোতি যেখানে হৃদয়ে অনুভূত হচ্ছে, সেইটিই ব্রহ্মলোকের যেষ্টিহা মুহূর্ত হতে পারে।

**বিজরা নদী**। কৌষীতকীর মুখ্য বৈশিষ্ট্য প্রাণ ও প্রজ্ঞার আলোচনা। বিজরা নদী অনন্ত অমৃতপ্রাণের রূপক। কঠোপনিষদে নচিকেতা বলছেন ভোগের ফলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি জরাগ্রস্ত হয়। স্বর্গে যাওয়ার অন্যতম লক্ষ্য জরামৃত্যু অতিক্রমণ। যজ্ঞানুষ্ঠানের মূলেও ওই কামনা থাকে। যেষ্টিহা মুহূর্ত বা যজ্ঞফলও ত্যাগ হয়ে যাওয়া মাত্র বিদ্বান সেই জরামৃত্যুরহিত অবস্থা পেয়ে যান। যা চাই তা পাওয়া কঠিন। কিন্তু নিষ্কাম হওয়া মাত্র কাম্যবস্তু আপনি এসে উপস্থিত হয় সামনে—জীবনের এ এক গভীর রহস্য। 'অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্ (পাতঞ্জল যোগসূত্র)। তা ছাড়া আরেকটা কথা আছে এর মধ্যে। জরা-মৃত্যু প্রকৃতির ধর্ম। পুরুষ স্বরূপে জরামৃত্যুহীন। তাঁর 'বিজরো বিমৃত্যুঃ' হওয়ার কথাই ওঠে না। বিদেহ যিনি তাঁর আবার জরামৃত্যু কি? জরা ও মৃত্যু-তরণের তপস্যা প্রকৃতিই

করে চলেছে। ব্রহ্মলোকের সান্নিধ্য পাওয়া মাত্র বিজরা নদী বা অনন্ত অমৃত প্রাণস্রোতের অনুভবে সে-তপস্যা সিদ্ধ হয়। বিজরা নদী পার হওয়া যেন বৌদ্ধ পরিভাষায় স্রোতাপন্ন হওয়া। মহাজীবনের দিব্য প্রবাহে প্রাকৃত ক্লেশ সব কোথায় ভেসে গেল। বিদ্বান প্রবেশ করলেন ব্রহ্মপুরে।

আর হ্রদ হতে বিজরা নদী পর্যন্ত অবর ব্রহ্মের এলাকা বলতে পারি। ইল্য বৃক্ষ হতে পরব্রহ্মের অধিকার।

**ইল্যঃ বৃক্ষঃ** ইল্য<ইরা, অগ্নিশক্তি। ইলা পৃথিবীরূপা। আপ্রীসূক্তে ভারতী সরস্বতী ও ইলাকে আমরা পাই। তন্ত্রে ইলা অমৃতনাড়ী ইড়া। এখানকার ইল্য বৃক্ষকে বলা যেতে পারে বনস্পতি। বৈদিক যূপ বৌদ্ধ স্তূপ এই বনস্পতির প্রতীক। শিবলিঙ্গও তাই। সংহিতায় সহস্র-বল্‌শ বনস্পতির অপূর্ব বর্ণনা আছে। আসলে ওটি মেরুদণ্ডকে নির্দেশ করছে। এখানে ছবিটি এই রকম—বিজরা নদী ( মহাপ্রাণ স্রোত ) বয়ে চলেছে অব্যাহত গতিতে। তার তীরে বিরাট অগ্নিবৃক্ষ। এ গাছ উল্টে গেলেই সংসার-বৃক্ষ আর সোজা থাকলে ব্রহ্ম বা বারুণ-বৃক্ষ ( বনস্পতি প্রসঙ্গে দ্র. বেদমীমাংসা দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৮৩ প্রথম সংস্করণ )।

**সালজ্যং সংস্থানম্** বৃহদারণ্যক উপনিষদে উজ্জ্য সজ্য অধিজ্য ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। জ্যারোপণের ফলে যা সালের ( শালের ) মত হয়েছে সম্ভবতঃ তা-ই সালজ্য। শালগাছ খাড়া উঠে যায় আকাশে মাথা তুলে। মূলবন্ধ উড্ডীয়ান ও জালন্ধরবন্ধ—তিনটি যৌগিক প্রক্রিয়া একসঙ্গে করলে, জ্যারোপণে ধনুতে যেমন টান পড়ে ঠিক তেমনি একটা টান পড়ে মেরুদণ্ডে, সমকায়শিরোগ্রীব সাধকের মেরুদণ্ড শালের মত খাড়া হয়ে যায়। সংস্থান কি? একটির উপর একটি জিনিস সাজালে যা হয় তা-ই। সাধকের মেরুদণ্ড যখন 'সালজ্য', তখন চেতনার ব্যাপ্তি ঘটলে তিনি দেখবেন তাঁরই পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড সংহত। সুষুম্ণ তন্তুতে গাঁথা প্রতিটি পদ্মই তখন ভুবনসদ্ম। এই বোধ-ই সালজ্য সংস্থান।

**অপরাজিতম্ আয়তনম্** সংজ্ঞাটি বিশেষ করে চেতনার বিস্ফারণই বোঝাচ্ছে। আয়তন বলতে অনেকখানি জায়গা বোঝায়, বোঝায় ক্ষেত্র। দাক্ষিণাত্যে মন্দিরগুলিতে বিরাট এক সুপরিসর ক্ষেত্র চারিদিকে গোপুরম্ বেষ্টিত। তার মাঝখানে মূল মন্দির। ওই সবখানি নিয়ে দেবায়তন। এখানেও আয়তন বলতে সুবৃহৎ অবকাশ এবং তা অপরাজিত, কেউ তার

ইতি করতে পারে না। ছান্দোগ্যে অপরাজিতা পুরীর কথা রয়েছে। সেখানে অর ও ণ্য নামে সমুদ্র, ঐরম্মদীয় সরঃ, অমৃতস্রাবী অশ্বত্থ আর প্রভু-বিমিত হিরন্ময় মণ্ডপের কথাও আছে। ভূমিসূক্তে এই পৃথিবী অযোধ্যাপুরী।

ব্রহ্মলোকের দ্বারপাল **ইন্দ্র-প্রজাপতি**। এ দুটি দেবতা সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অপরাজিত আয়তনের মধ্যে বিভু প্রমিত। প্রমিত √মা ধাতু-নিষ্পন্ন। ব্রহ্মসূত্র ও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে চিবুক হতে এক বিঘত পরিমাণ স্থান বাদ দিলে ললাটোর্ধ্ব যে-জায়গাটি পাওয়া যায় সেইখানে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। বিশ্ব-ভুবনে যিনি পরিব্যাপ্ত তিনি আবার একটি কেন্দ্রেও সংহত আছেন। তাঁকে সীমিত বা স্থাপিত করা যেখানে সেখানেই তিনি 'প্রমিত'। কিন্তু এই প্রমিতকে বিভুশব্দে বিশেষিত করা হয়েছে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন আত্মা সেই বস্তু যার Centre is in everybody but circumferenee is nowwhere।[১] বিভু প্রমিত বলে যেন অনুরূপ ভাবটিই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। অপরাজিত আয়তনে তাঁর 'বিভু প্রমিত' যেন দেবায়তন-মধ্যবর্তী দেউল—আমাদের সীমিত মন-বুদ্ধি দিয়ে আমরা এরকম একটা উপমা দিতে পারি। ইওরোপীয়রা বলছে ওটি সভাগৃহ।

**বিচক্ষণা আসন্দী** যিনি বিশ্বতশ্চক্ষু তাঁকেই বলব বি-চক্ষণ। এই সংজ্ঞাটি নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। আসন্দী—মঞ্চ বা চৌকি। ব্রহ্ম যে-মঞ্চে অধিষ্ঠিত তা বি-চক্ষণ, বিশ্বজগতের সাক্ষী দ্রষ্টা তিনি।

**অমিতৌজাঃ পর্যঙ্কঃ** ব্রহ্ম যে পর্যঙ্কে আসীন তা অমিত ওজঃশক্তির আধার। বলা যেতে পারে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াই তাঁর অমিতৌজাঃ পর্যঙ্ক। জ্ঞান এবং শক্তি সহচরিত ব্রাহ্মী চেতনায়। বুদ্ধ ছিলেন দশবল, অমিতাভ তাঁর নামান্তর। ওজঃ শব্দটিতে তেজ ও প্রভাস্বরতা ওতপ্রোত রয়েছে। এই ব্রহ্মপর্যঙ্কে ব্রহ্ম একমাত্র পুরুষ আর সবাই নারী এটি লক্ষণীয়। পরে তন্ত্রে ও ভাগবতে এ-ভাব প্রপঞ্চিত হয়েছে।

ব্রহ্মের দুটি প্রিয়া। **মানসী** এবং **প্রতিরূপা চাক্ষুষী**। তাঁর এক প্রেয়সী তাঁর মনেই রয়েছে নিত্যকাল। আর বাইরে দৃষ্টি-সৃষ্টিতে যিনি ফুটছেন তিনি সেই মানসীর প্রতিরূপা। এঁকে চোখে দেখা যায় বলেই ইনি চাক্ষুষী। মানসীই তন্ত্রে নিত্যা ষোড়শী। ষোড়শকল সোম্য পুরুষ আর

১ কথাটি প্রথম বলেছিলেন পাস্কাল।

এই পরমা প্রকৃতির চিদ্‌বিলাসে ভাবলোকের নিত্য বৃন্দাবনধামে উচ্ছলিত হচ্ছে রসের উল্লাস। আর বিশ্বভুবনের অধিষ্ঠাত্রী কমলার কমল-সদ্মে ক্ষণে ক্ষণে তারই চকিত আ-ভাস ফুটছে। প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ নিরন্তর যেন তাঁর অন্তরের প্রতিরূপ দর্শন করে চলেছেন। বৈদান্তিক বলেন দর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্ব পড়ার মত এই দৃশ্য-জগৎ সেই বিশ্বেশ্বরের আত্ম-বিসৃষ্টি মাত্র। রাসলীলা সম্পর্কে ভাগবতেও যেন দর্পণ সম্মুখে শিশুর খেলা—এমনি এক উপমা পাই।

প্রিয়া দুটি **বৈরাজগানি পুষ্পাণি আবয়তঃ**। √বে বয়নে। উপবীত শব্দে এ-ধাতুর প্রয়োগ রয়েছে। তাঁরা দুজনে ফুলের মালা গাঁথছেন। ফুলগুলি বহন করছে বিরাটের দ্যোতনা।

পুরুষসূক্তে আছে 'তস্মাদ্ বিরাড়্ অজায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।' বিরাট্ হতেই পুরুষের উদ্ভব। এই পুরুষ বিশ্বানর (Universal man)। উপনিষদে বিরাটের চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়াকে বলা হচ্ছে বৈরাজ্য। ১ম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে সরস্বতীর উদ্দেশে ঋষি বলছেন 'মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি॥' √রাজ প্রশাসনে। তারও মূলে √ঋজ্, সোজা চলা। আলোর কিরণ ঋজুগতিতে চলে। এ থেকে ধাতুটিতে দীপ্তির ব্যঞ্জনা এসেছে। তাহলে বৈরাজ্য যেন একটি আলোককেন্দ্র। তা হতে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে দিকে দিকে। সংহিতায় বৈরাজ ও বৈরূপ সামের উল্লেখ পাই। বৈরাজ সাম বিশ্বমূলা শক্তি। তার প্রচোদনায় ফুটছে বিশ্বরূপ—বৈরূপ সাম। সপ্তম মণ্ডলের মণ্ডূক সূক্তে নাম-রূপের কথা আছে (৭।১০৩।৩)। বৈরাজ সাম নাম অথবা বাক্ অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি আর দ্বিতীয়টি রূপকৃৎ দৈবশক্তি।

মানসী ও চাক্ষুষী বিশ্বভুবনের ফুল দিয়েই মালা গাঁথছেন। তন্ত্রে ষট্চক্র বা মেরুদণ্ডে গাঁথা ছয়টি পদ্মের উল্লেখ রয়েছে। মতান্তরে এ-পদ্ম অসংখ্য। প্রতিটি পদ্মই এক একটি ভুবনের চেতনা বহন করছে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ওই ফুলের মালা তাহলে এ-দেহের নাড়ীতন্ত্রেই গাঁথা। অধিভূত-দৃষ্টিতে তা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সহস্রকমল।

**অপ্সরসঃ, নপ্তঃ**। **অম্বা** শব্দটি এখানে সাধারণ সংজ্ঞা। অম্বা, মা। নারী সম্পর্কে দুটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, প্রিয়া এবং মা। এক মানসী ও চাক্ষুষী প্রিয়া। বাকি সকলে মাতৃশক্তিস্বরূপা। তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাই

অম্বিকা শিবের বোন। বেদেও স্বসা শব্দের প্রয়োগ রয়েছে এবং দুহিতা সংজ্ঞাও আছে। যে দুহিতা সে-ই পরে প্রিয়া হল এরকম উল্লেখও রয়েছে—'স্বাযাং দেবো দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ।'

প্রজাপতির দুহিতৃগমনের রূপকটির মূলে শক্তিতত্ত্ব। শক্তি একদিকে পুরুষ হতে বিসৃষ্টা বলে দুহিতা (তাঁকে দোহন করে আবির্ভূতা হন), অন্যদিকে বিসৃষ্টির নিত্য সামর্থ্যরূপে জায়া। সূর্যাকে সংহিতায় একবার বলা হচ্ছে সূর্যের দুহিতা আবার অন্যত্র তিনিই সূর্যযোষা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে শতরূপা ভাবছেন, আমাকে 'আত্মনঃ এব জনয়িত্বা কথং নু সম্ভবতি? (১।৪।৪)। কিন্তু ব্রহ্ম তাকে তা বলে রেহাই দেননি।

অসম্ভূতিতে যে-শক্তি বন্ধ্যা—কন্যাকুমারী, সে-ই দুহিতা। ব্রহ্মের অন্তরে নিত্যকাল যে চিদ্‌বিলাস চলছে সেইটি কুমারীতত্ত্ব। বশা গৌঃ, কন্যকা। আর সে-শক্তি যখন বহির্জগতে ফুটে ওঠে তখন হয় জায়া। পুরাণে তাকে মনুর মহিষী শতরূপা বা আদি মানবী বলা হয়। রাস বাঞ্ছা করেছিল যারা, ভাগবতে তারা নন্দব্রজকুমারিকাঃ। এটি ব্রহ্মের মানস-বিলাস। এই উপনিষদের প্রিয়াযুগল যেন বৈষ্ণবের রাধা এবং চন্দ্রাবলী। একজন ষোড়শী, অন্যে পঞ্চদশী।

কৌষীতকীতে আগাগোড়া প্রজ্ঞা আর প্রাণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে বিশেষ করে প্রজ্ঞাকে ছাপিয়ে প্রাণের মহিমা খ্যাপনের ইঙ্গিত আছে। প্রজ্ঞা, মানসী চাক্ষুষী আর প্রাণ অপ্সরা, নদী। সংহিতার দশম মণ্ডলে 'গন্ধর্বাপ্সরসঃ'দের কথা রয়েছে। অপ্সরাদের তুলনায় গন্ধর্বরা হীনজাতি (এ অবশ্য মানব-গন্ধর্বদের কথা। দেবগন্ধর্ব স্বয়ং সবিতা)। 'আপো বৈ প্রাণাঃ' এই নিরুক্তি হতে অপ্সরা বলতে সোজা কথায় জল বা প্রাণ-স্রোত।

অপ্সরা ও নদী উভয়েই মা, অম্বা। সরস্বতী একাধারে অম্বিতমে নদীতমে। মানসী-চাক্ষুষী কিন্তু মাতৃত্বের উজানে। সংহিতায় প্রজ্ঞারূপিণী সরস্বতীকে চিত্রা কন্যা বলা হচ্ছে। তাঁকে অম্বিতমে বলা হয় যখন, তখন তিনি প্রাণরূপিণী।

অপ্সরাদের কিছু অম্বা কিছু অম্বায়বীঃ=অম্বায়ুর বহুবচন। যু কাম্য প্রত্যয়, অম্বাম্ ইচ্ছতি (বা যঃ) যিনি মাকে চান অথবা মা হতে চাইছেন তিনিই অম্বায়ু। তন্ত্রে পাই দেবীই মূল, তাঁকে ঘিরে রয়েছেন তাঁর অষ্ট

নায়িকা। বৈষ্ণব বলেন শ্রীরাধার কায়ব্যূহস্বরূপা অষ্টসখীর কথা। গীতায় অষ্টধা প্রকৃতির উল্লেখ রয়েছে। এঁরাই অম্বায়বীঃ। বিজ্ঞান বলে পরমাণুর কক্ষে আটটির বেশি ইলেকট্রনের স্থান হয় না। মূল কেন্দ্রকে ঘিরে একটি সহচারী শক্তিমণ্ডলের আবর্তন তাহলে স্থূলে সূক্ষ্মে সর্বত্রই আছে। এই অম্বায়ুদের আবার তন্ত্রের মাতৃকা-ও বলা যায়। আগম বলেন প্রতিটি অক্ষর একেকটি মাতৃকা ( ছোট্ট মা, বীজশক্তি )। ওর থেকেই একেকটি ভুবন বেরিয়ে আসছে।

এখানে শক্তিব্যূহের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—অম্বা—অম্বায়ু—অম্বায়া। অম্বাং যাতীতি অম্বায়া। অর্থাৎ মূল শক্তিকেন্দ্র একটি—তা হতে সক্রিয় শক্তি উৎসারণ এবং প্রণালীক্রমে প্রবাহিত হয়ে আবার মূল আধারে প্রত্যাবর্তন (Reserved force—Creative force or pressure—flowing of the stream of life as its outlet which returns in a cyclic order at the reservoir)। তু. 'যেমন জলের বিম্ব জলের উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে'—রামপ্রসাদ।

বিদ্বান বিজরা নদীর নিকটস্থ হলেই ব্রহ্মাবর্তের মহান পরিচয় লাভ করেন।

তিনি আসছেন জেনে ব্রহ্ম অপ্সরাদের বলেন তোমরা ছুটে যাও, ওকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস। তত্ত্ববিৎ বিদ্বান আসছে '**মম যশসা**' আমার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, আমার ঐশিতা নিয়ে। বিজরা নদীর সন্নিহিত হলেই ও আর জরাগ্রস্ত হবে না।

১/৪॥ ছান্দোগ্যের শান্তিপাঠে আছে 'ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি···।' বস্তুত এই যা-কিছু সবই হয়েছেন যিনি, তাঁকে পেলে দেহ-প্রাণ-মন প্রত্যেকে আপ্যায়িত না হবে কেন? তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে পার্থিব আনন্দ শতগুণিত হয় দেবলোকে, ব্রহ্মলোকে তা সহস্রগুণিত। এখানে বলা হয়েছে ব্রহ্মলোকে গিয়ে বিদ্বান মাল্য-গন্ধ-বস্ত্রালঙ্কার সবই ভোগ করছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য সবই ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপভোগের সামর্থ্য লাভ করলেন তিনি। অপ্সরাদের পূজা পেয়ে বিদ্বান মনোবলে আর হ্রদ পার হয়ে এলেন। যারা **সংপ্রতিবিদ্‌** তারা ওই আর হ্রদে ডুবে যায়। ঐতরেয় আরণ্যকে আছে যিনি দুদিকের খবর রাখেন তিনিই সংপ্রতিবিদ্‌। এই উপনিষদে রয়েছে—সং তদ্বিদে প্রতি তদ্বিদে'···জানা-অজানার পালা চলে জন্মজন্মান্তর জুড়ে।

আবার কেনোপনিষদে বলা হয়েছে 'যে মনে করে তাঁকে জেনেছি সে অল্পই জানে।' ঐতরেয় আরণ্যকের সংপ্রতিবিদ্ অবশ্যই কৌষীতকীর এই সংপ্রতিবিদ্ নন। 'কেন' যার সম্পর্কে সতর্ক করছেন এখানকার সংপ্রতিবিদ্ সেই প্রজ্ঞাভিমানী। সংপ্রতির চলিত অর্থটা অনায়াসে নেওয়া চলে এখানে। যারা শুধু বর্তমানটা দেখে, ইহলোককেই জানে, পরলোক বা লোকোত্তরের খবর রাখে না বা রাখতে চায় না, সংপ্রতিবিদ্ তারাই। এরা বলে 'প্রেত্য নাস্তি' (কঠ ১/১/২০), 'অয়ং লোকো নাস্তি পরঃ' (কঠ ১/২/৬)। অহোরাত্রের আবর্তনেই এরা আটকে থাকে।

যেষ্টিহা মুহূর্ত অতিক্রম করে বিদ্বান ক্রমে বিজরা নদীও পার হয়ে গেলেন। মানুষ জরামৃত্যুর অতীত হতে চায়। মনোবলে বিজরা নদী সে এই জীবনেই পার হয়েও হয়তো যায়। চিত্তের তারুণ্য অক্ষুণ্ণ রাখা খুব অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তবু বহির্জগতে তার পরাভব অনিবার্য, জীবনে জরার আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয় না। হয় প্রবাহনিত্যতার ভাবনায়— আমি 'বৃদ্ধ' হলাম কিন্তু আমার তারুণ্য যেন উপচরিত হল আমার সন্তান-সন্ততিতে। সমষ্টিবিচারে জরাকে আমরা নিত্যই অতিক্রম করে চলেছি। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে তা অনতিক্রম্য। যদি ওই নিত্যপ্রবাহ বা শাশ্বত তারুণ্যের উৎসে যেতে পারি তবেই একক ব্যক্তির জরামৃত্যুতরণ সম্ভব। এখানে এই **মনসা** এব তত্ত্বত অতিমানসের ভূমি। সেখানে এসে বিদ্বান তাঁর পাপ-পুণ্য সব ঝেড়ে ফেললেন। তাঁর সবাই আপন, সকলেই জ্ঞাতি। কিন্তু যারা তাঁর প্রতি প্রীতিভাব পোষণ করে, তারাই হয় তাঁর **সুকৃতের** ফলভাগী। যারা বিদ্বেষ পোষণ করে, তারা **দুষ্কৃতের** ফলভাগী হয়। তিনি স্বয়ং কালাতীত ভূমিতে উপনীত হয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন অহোরাত্র আবর্তিত হচ্ছে তাঁর পায়ের তলায়। তিনি তখন চক্রবর্তী। এরপর তিনি যে অবস্থা লাভ করলেন তাকেই বলা যায় সংজ্ঞান।

ব্রহ্মলোকের বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বন্দ্বাতীত ভাব। সে-ভূমিতে সুকৃত দুষ্কৃত নাই, অহোরাত্রের দ্বৈতবোধ নাই। পরবর্তী কালে নির্বাণষট্‌কে শঙ্কর এই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থাটিকে তুলে ধরেছেন। নির্বাণে সবই শেষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে—অশরীর হলে আর পাপপুণ্য থাকে না। কিন্তু অশরীরী হয়ে আবার যদি কেউ শরীরী হয়? কৌষীতকী ছাড়া সে-

প্রসঙ্গ আর কোথাও নাই। ব্রহ্মকে জেনে সবই ব্রহ্মময় দর্শন—এখানে তার চমৎকার বর্ণনা।

ভাগবতের মূল সুর 'সত্যং পরং ধীমহি', এই সত্যের ভিত্তিতে সমাহিত চিত্তে ইন্দ্রিয়গুলি এবং ইন্দ্রিয়সংবিৎ ফিরে আসে যদি, তখনই বলা চলে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। কৌষীতকীর আসল কথাটা এ-ই। ব্রহ্মনির্বাণের পর বিধান প্রাণ পেলেন নতুন করে। এ উপনিষদে প্রাণেরই প্রাধান্য। আকাশ-লিঙ্গ বা আকাশবৎ হওয়া হল প্রজ্ঞালাভ। তারপর আবার প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই খুব বড় কথা। একেই বলব জীবন্মুক্তি। তখন সবই ব্রহ্ম, সবই চিন্ময়।

সংজ্ঞান শব্দটা শ্রীঅরবিন্দ সম্ভবতঃ প্রথম ব্যবহার করেছেন। ঋক্-সংহিতায় দশম মণ্ডলের সর্বশেষ সূক্তটির নাম সংজ্ঞানসূক্ত। সংজ্ঞানের সাদা-মাঠা অর্থ সম্যক্‌জ্ঞান তা বোঝাই যায়। যোগদর্শনে আছে, প্রাতিভাদ্ বা সর্বম্। সংজ্ঞানই কি প্রাতিভসংবিৎ?

তা কিন্তু নয়। প্রাতিভজ্ঞানে সংবিৎ পরিশুদ্ধ হয়। যোগদর্শনেই রয়েছে প্রাতিভসংবিৎ বিবেকজ জ্ঞানের পূর্বরূপ। ওর মূলে কিছুটা প্রত্যাহার আছে, কাজেই এ-ও একরকম বিভূতি। যোগদর্শনের বিভূতিপাদেই ওর উল্লেখ।

বিধানের কাছে প্রাতিভসংবিত্‌ও সামান্য সিদ্ধি। সংজ্ঞান তা নয়। তা হল ব্রহ্মের মহাশক্তিতে অনুস্যূত অতিমানসের বৃত্তি—supramental sense। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়সংবিৎ প্রাকৃত মনের নয় বলেই তার সংজ্ঞা আলাদা। একরসপ্রত্যয়স্বরূপ ব্রহ্মপারাবারে গিয়ে এপারের সব দ্বন্দ্বই লোপ পেল; পায়ের তলায় অহোরাত্র আবর্তিত হচ্ছে বলে ঋষি এইটি বোঝাতে চেয়েছেন। কালিক পর্যায়বোধ বা অহোরাত্রকে প্রাচীনরা অনেক ক্ষেত্রে দ্বৈতবীজরূপে উপস্থাপিত করতেন। ব্যক্তির দ্বন্দ্ববোধ বা রাগদ্বেষ পরিহার করলেও বিশ্বব্যাপারে দ্বৈত ভাবনা ছাড়া কঠিন। বহুদূর পর্যন্ত তার এলাকা। কিন্তু ব্রহ্মলোকে গিয়ে বিধান সেই দ্বৈতবোধকেও ছাড়িয়ে এলেন। তারপর? তারপর সেই নাম-রূপহীন ব্রহ্মসদ্‌ভাব হতেই সব কিছু উৎসারিত হতে দেখা গেল। এ-ই সংজ্ঞান।

সংজ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে হলে মনের উজানে অন্তরাবৃত্ত চেতনার পরম গঙ্গোত্রীতে যেতে হবে। তখন প্রত্যক্ষ করি গুহাহিত নিস্পন্দ আত্মারামতা হতেই উছলে পড়ছে বিশ্বপ্রপঞ্চ। তখন মাত্রাস্পর্শ (presentation of Sense)

হয়ে দাঁড়ায় ব্রহ্মসংস্পর্শ (representation of Idea)। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সংবিতের মত সংজ্ঞানেও বিষয়ী ও বিষয় সন্নিকর্ষের একটা হেতু থাকে। ফলে প্রাকৃত বোধের মতই প্রত্যয়ের ত্রিপুটি সৃষ্টি হয়। অথচ তিনটিকে জারিত করে রাখে তাদাত্ম্যবোধের অখণ্ডতা। তখন ভাব আগে বস্তু পরে এ বুঝতে আর ধাঁধা লাগে না। ইন্দ্রিয়দ্বারে বস্তুর আস্বাদনে রূপের যে খণ্ডতা, তাকে স্বীকরে করেও সংজ্ঞান দেখে, অখণ্ড অসীমের আনন্ত্যে বস্তুর অন্তর্গূঢ় শক্তি এবং ঐশ্বর্য জারিত হয়ে রয়েছে। ঋষি এখানে একটু পরেই ব্রহ্মগন্ধ ব্রহ্ম-রসাদির কথা তুলছেন। এ কিন্তু রূপক নয়, চিন্ময় বৃত্তির চিন্ময় প্রত্যক্ষ। ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—কথাটা অত্যন্ত গভীর। ব্রহ্মবিদের কাছে সবই ব্রহ্মচৈতন্যে অনুবিদ্ধ। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এ তাঁর অন্তরতম অভিমানসভূমিরই সংজ্ঞান।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদে সব চেতনাই নাকি স্বপ্নভূমিতে সক্রিয়। বৈষ্ণব বলেন এ-জগৎ ভাবলোকের ছায়া অথবা ভাবলোকই সত্য। আমরা এ যা দেখছি এ দৃষ্টি মিথ্যা—

চিন্তামণিময়ী ভূমি কল্পবৃক্ষ বন<br>
চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম।<br>
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ॥

চৈ : চঃ

কথা হল স্বপ্নে আমরা নিজের মনগড়া ইন্দ্রিয়সংবিতের প্রতিরূপ দেখি। যদি এমন হয় যে ঘুমের ঘোর নাই অর্থাৎ অবশে স্বপ্ন দেখাটা নাই কিন্তু স্বপ্নময় ভূমি আছে? স্বপ্নের তাই দুটি বিভাগ—মনোময় ও বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞানভূমির স্বপ্ন সত্য। ছান্দোগ্যে সনৎকুমার একটি কথা ব্যবহার করেছেন, 'স্মর'। স্মৃতি না বলে প্রাচীনরা 'স্মর'-ই বলতেন। নৈয়ায়িক বলছেন স্মৃতি মিথ্যা। কিন্তু সে যদি ধ্রুবা স্মৃতি হয়? এই ধ্রুবা স্মৃতিই উপনিষদে 'স্মর'। ঈশোপনিষদে 'ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।' স্মর বা স্মৃতির মূলে স্মৃ ধাতু—অর্থ ঝলসে ওঠা (flash)। অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে সংহিতায় আছে স্মরাথঃ (১০।১০৬।২) ঝলসে ওঠ। [তাঁদের প্রসঙ্গে মধুমতী কশার কথা বলা হয়েছে। কশা, চাবুক ওঠে আর নামে। যে-স্মৃতি হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত চিত্ত ভরে তোলে অনির্বচনীয় মাধুর্য্যে তা-ই মধুমতী কশা।]

বিজ্ঞান সত্ত্ব স্বপ্ন স্মৃতি বুদ্ধি—এসব চেতনার একই ভূমির বস্তু। স্মৃতি

অ-যোগীর। আর স্মর যোগীর আকাশচেতনায় কোটা 'ধ্রুবা স্মৃতি', শৈবদর্শনে প্রত্যভিজ্ঞা। যোগীর স্মর দিব্যস্বপ্ন, হিরণ্যগর্ভের স্বপ্ন। স্বপ্নে আমরাও সৃষ্টি করি কিন্তু তা অলীক। সংজ্ঞানে যোগীর স্বপ্ন অমোঘ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট বলছেন বিজ্ঞানময় পুরুষের স্বপ্ন হয় প্রস্বপ্ন। প্রাকৃত স্বপ্নে জাগ্রতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান নিয়ে সৃষ্টি আর প্রস্বপ্নে অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের উপাদান নিয়ে। স্বপ্ন ও নিদ্রাজ্ঞান অবলম্বনেও যোগের সাধনা (যোগদর্শন, সূত্র ১/৩৮) চলতে পারে এটি এ দেশের সাধকদের বিশেষ আবিষ্কার।

মাণ্ডূক্য উপনিষদে 'স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ' অবস্থার কথা আছে এবং সুষুপ্তিস্থান প্রজ্ঞানঘন আনন্দভুক্ প্রাজ্ঞের কথাও সেখানে পাই। আমাদের ঘুম অজ্ঞানঘন। সজ্ঞানে সুপ্তি প্রবর্তিত করতে পারলেই সমাধি হল। সুষুপ্তির আনন্দঘন একরসপ্রত্যয়ই ব্রহ্মবোধ। হৃদয়ের গভীরে অহরহ সুবিশ্রান্ত সুষুপ্তির অনুভব যিনি পান তাঁর সংজ্ঞা সম্প্রসাদ (ছা. ৮ / ১১)। এই জাগ্রৎ সুষুপ্তিতে ডুবলে দেখা যায় বিশ্রান্তি হতেই সব কিছুর উৎসারণ। সংজ্ঞান এমনি করেই সব কিছুকে দেখে—দেখে অনন্তের মধ্যে সান্তকে। তবে সুষুপ্তিস্থান প্রজ্ঞানঘন তা যেন নিজবোধ-রূপ, apprehensive। আর সংজ্ঞান সম্যক্ সম্বোধি, comprehensive। অর্থাৎ সংজ্ঞান একাধারে অন্তঃপ্রজ্ঞ আর বহিঃপ্রজ্ঞঃ দুই-ই। প্রজ্ঞানঘন সুষুপ্তি হতে সে অনায়াসে নেমে আসে বিজ্ঞান স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ভূমিতে। তেমনি আবার জাগ্রতাবস্থা হতে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সংবিতে ডুব দিতেও পারে। ব্রহ্ম যে-দৃষ্টিতে তাঁর সৃষ্টিকে দর্শন করেন, এককথায় সেই দৃষ্টিই সংজ্ঞান।

অসম্ভূতিতে গিয়ে সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বিচ্ছুরণ দেখলে তাকে বলতে পারি অতিমানস সংজ্ঞান। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এ-উপনিষদের বিবৃতি এই রকম—

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।

১।৫॥ কৌষীতকীর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বর্ণনা অভিনব এবং অনন্য। পরবর্তী বেদান্তে কোথাও এর আভাস নাই।

ব্রহ্মলোকে উপনীত বিদ্বান ব্রহ্মগন্ধ ব্রহ্মরস ব্রহ্মতেজ এবং ব্রহ্মযশ লাভ করলেন যথাক্রমে। সংজ্ঞানের তুরীয় দর্শন লোকাত্মক অথচ লোকোত্তর। সবই আছে সে-ভূমিতে। যিনি সর্বযোনি তিনি কি রূপ-রস-গন্ধ-বিবর্জিত?

তা নয় মোটেই। তবে এই সবই সেখানে ব্রহ্মভূত এইমাত্র বিশেষ। আর ওই বৈশিষ্ট্যেই তা লোকোত্তর। সেখানে ‘প্রাণরসনায় চাইখ্যা দেখি রসের সাঁই খাঁটি’।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ‘আপ্নোতি মনসস্পতিম্…’ (১।৬।২) ব্রহ্মকে পেয়ে পুরুষ বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন ও বিজ্ঞানের পতি হন শুনলে কৌষীতকীর ব্রহ্মগন্ধ ইত্যাদির ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আকাশশরীর সত্যাত্ম প্রাণারাম মন-আনন্দ শান্তিসমৃদ্ধ অমৃতস্বরূপ হয়ে রূপ-রস-গন্ধ সম্ভোগ নিশ্চয়ই আমাদের বিষয়ভোগ নয়।

[গোপালতাপনীর প্রশ্ন মনে পড়ে, কথং ব্রহ্মচারী কৃষ্ণঃ? আমাদের কাছে তা সুদুর্জ্ঞেয় রহস্য বৈকি!]

বিদ্বান ব্রহ্মলোকে গিয়ে পঞ্চমহাভূতকে পেলেন, বলতে গেলে সাদা কথাটা এ-ই। এখানে গন্ধ রস তেজ ও যশের উল্লেখ রয়েছে। গন্ধ ক্ষিতি-তত্ত্ব। রস অপ্। তেজ রূপ। এবং বায়ুতত্ত্বের জায়গায় বলা হচ্ছে যশ। আকাশ বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্ম স্বয়ং আকাশশরীর। সম্ভবতঃ এজন্য তার আর পৃথক উল্লেখ নাই।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে মহাভূতের সৃষ্টিক্রম দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে—আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ…(২।১।৩) ইত্যাদি। এ-বর্ণনা আধিভৌতিক। ভূতগুণগুলি সাধারণত আমরা যে চোখে দেখি সেইভাবেই তার ক্রম নির্ণয় করা হয়েছে। কেবল শব্দ আকাশের গুণ কিনা এ নিয়ে প্রাচীনরা যথেষ্ট বিচার করেছেন। আর গন্ধ যে পৃথিবীর গুণ এটি পরিশেষন্যায়ে সিদ্ধ।

মোট সাতটি উপাদান তাহলে—গন্ধ রস রূপ (তেজঃ) বায়ু (যশঃ) আকাশ (ব্রহ্ম) প্রাণ ও প্রজ্ঞা। কৌষীতকীতে প্রাণের স্থানটি অ-সামান্য এ প্রথম হতেই দেখা যাচ্ছে। ব্রহ্মলোকে গিয়ে এই যে ব্রহ্মগন্ধাদি সম্ভোগ, প্রাণহীন দেহে তা কি সম্ভব? সমাধিদশাতেও বেঁচে আছি বলেই না আমার ভিতর হতে আবার সব বার হয়। এ-দর্শনের ধারা কিন্তু তাহলে ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে গেল। মাণ্ডুক্যে পাই ‘অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্য-মব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে’। আপাতদৃষ্টিতে এখানে যেন তার উল্টা কথা বলা হচ্ছে। প্রজ্ঞার চেয়ে প্রাণেরই শ্রেষ্ঠত্ব এখানে। আর ব্রহ্মতত্ত্ব ওই প্রাণ ও প্রজ্ঞার একাত্মতা।

মহাভূতগুলি তাহলে প্রাণের বিস্ফুরণ। কিভাবে তা দেখা যাক। বলা

হচ্ছে আপো বৈ প্রাণাঃ। আবার বায়ুও প্রাণ। প্রশ্নোপনিষদে রয়েছে, আদিত্য প্রাণস্বরূপ।

প্রাণ যখন অরূপ তখন তা বায়ু। যখন অপ্‌ তখন তা রূপ ধরেছে, যদিও নির্দিষ্ট আকার নেয়নি। প্রশ্নোপনিষদে মূর্তিরেব রয়িঃ, একটা কথা আছে। রয়ি প্রাণসংবেগ। নিঘণ্টুতে রয়িকে 'জল' বলা হয়েছে। প্রশ্নোপনিষদের উক্তি মিলিয়ে এতে ওই অরূপ প্রাণের রূপ ধরার ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অরূপ প্রাণ বা বায়ু আকাশসম্ভব এ-উক্তিও উপনিষদের। সেই সঙ্গে আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ, অতএব প্রাণঃ। ব্রহ্মসূত্রের এই প্রসিদ্ধি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে আকাশ ও প্রাণ একটি মিথুন। ব্রহ্ম প্রাণশরীর আকাশাত্মা এ-উক্তি ছান্দোগ্যের। আকাশ নাম-রূপের নির্বহিতা। সেই আকাশ ঘনীভূত হলেই পৃথিবীকে পাই। [ আকাশে ময়লা পড়েই ক্ষিতির উৎপত্তি। পুরাণে আছে মেদিনী বিষ্ণুর কর্ণমল ]। এমনি করে দেখছি প্রাণই আদ্যন্ত অনুস্যূত রয়েছে। আবার অপ্‌ অব্যাকৃত রূপ, সংহিতায় থাকে বলে বপুষ্‌—তেমনি এক জ্যোতির্বাষ্প (Shimmering light )।

ভূতগুণগুলির অনুভব কিভাবে হয়, জীববিজ্ঞান সহায়ে তার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। প্রথমে বেদনা—feeling মাত্র। প্রাণোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আকার-প্রকারহীন একটা অনুভব জাগে। তারপর সে অনুভব দানা বাঁধে। তাকে বলতে পারি সংজ্ঞা। নবজাতক গন্ধে মাকে চেনে এটা দেখা যায়। মাতৃস্তন্যে রসের আস্বাদ পায়। তারও পরে আসে রূপের চেতনা। স্পর্শ বা তাপের বোধ গোড়া থেকেই থাকে।

কৌষীতকীতে তেজ শব্দটি রূপ বা জ্যোতির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। রূপে স্থূল অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা বেশি। জ্যোতি শব্দটিতে আবার অতীন্দ্রিয় ভাবের ইশারাই বেশি, ও ঠিক ভূতগুণবাচী নয়। তাই হয়তো ও দুটির বদলে তেজ শব্দটিই বেছে নেওয়া হয়েছে। তেজ বলতে রূপকৃৎ শক্তি (light as energy)-ও বোঝায়, আবার ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ কিছু (physical sense)—এ আভাসও মেলে।

বায়ুর পরিবর্তে রয়েছে যশঃ। যশ ঈশনাশক্তি, বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে 'যশো বীর্যম্'। এইটি প্রাণ অথবা বায়ু। ব্রহ্মের মহাপ্রাণনের লক্ষণ তাঁর ঈশনা, তিনি 'ঈশানো ভূতভব্যস্য'।

প্রাচীনেরা জড়ের রূপান্তর প্রসঙ্গে ভূতশুদ্ধির কথা বলতেন। সাধন-

কৌশলে এই দেহে ভূতগুণগুলিকে যোগগুণরূপে অনুভব করা সম্ভব। ভূতকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান সম্ভব নয় আবার ভূত শুদ্ধ না হলে বিজ্ঞানের স্ফূর্তি ঘটে না। তাই থেকে ভূতশুদ্ধির সাধনা বা পঞ্চভূতের ক্রমিক সূক্ষ্মতার জ্ঞানলাভের কথা উঠেছিল। প্রতিটি ভূতের মৌল প্রকৃতি তার আন্তর পরিচয়। সেই গুণের ভাবনা দ্বারা ভূত বা জড়ের উৎকর্ষ ঘটানো যায়। প্রথমে অন্ন বা পৃথিবীতত্ত্ব, তার যোগগুণ স্থৈর্য। পাতালফোঁড়া শিবের মত এ-দেহ অচল অটল হয়ে বসে রয়েছে পৃথিবীর বুকে—এই স্থৈর্যগুণ হতে স্বভাবত ব্যষ্টি বা পিণ্ডদেহের সীমিত গণ্ডীর বোধ ফিকে হয়ে আসে। তখন পার্থিব শরীর হয়ে দাঁড়ায় আপ্য শরীর। অপের যোগগুণ সাবলীলতা। দেহে তখন স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ জাগে। প্রাণস্রোত যেন অবলীলায় বয়ে চলেছে। বাধা-বন্ধ নাই কোথাও। স্থূলের জাড্য তখন অনেকটাই বিগলিত। বৈষ্ণবরা সাত্ত্বিক বিকাশের মধ্যে 'গলিতা বৃত্তি' বলে একটা অবস্থার উল্লেখ করেছেন। কথায় বলে 'গলে জল হয়ে যাওয়া'। ওই অবস্থায় প্রাণের বোধ যেন নাড়ীতন্ত্রে অবাধে সঞ্চারিত জলস্রোতের মত।

এরপর জলস্রোত হয়ে উঠবে অগ্নিস্রোত—বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে জ্বলিতা বৃত্তি। ভূতগুণের বিকিরণশক্তি ক্রমেই বাড়ছে। স্থূল ক্রমসূক্ষ্মতার দিকে চলেছে। সাধনশাস্ত্রের ভাষায় দেহ তখন যোগাগ্নিময়। তারও উজানে বায়ব্য শরীর। দেহ তখন শুদ্ধ তপোময় (pure energy = তপস্)। মৃত্যুর পর জীব বায়ুভূত হয়ে যায়। এ দেহেই কারও যদি সে অনুভব জাগে, তাহলে বিশ্বব্যাপ্ত স্পর্শবোধের অলৌকিক অনুভূতি পাওয়া সম্ভব। সে-অবস্থায় দেহধারী হয়েও বিদেহ-ধারণা অবাস্তব কল্পনা থাকে না। অবশেষে আসে মহাশূন্যের বোধ। আকাশশরীর ব্রহ্ম তখন বলতে গেলে সাধকের প্রত্যক্ষ সত্য। সত্ত্বশুদ্ধির ফলে ধ্রুবাস্মৃতিলাভের এই হল মোটামুটি ছক। 'ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ' বলে উপনিষদে এরই সংকেত দেওয়া হয়েছে। এটিই ভূতশুদ্ধি। শ্রীঅরবিন্দের physical transformation।

এদেশে বাউল গেয়েছেন, 'কারে বলি কেবা শোনে কে করে প্রত্যয়। এই দেহেতে মানুষ আছে সত্য চিদানন্দময়। এ-সত্য অনিঃশেষে জানা-ই যোগ-যাগের একমাত্র লক্ষ্য।

অনূচ্য বোধ হয় চৌকির নীচে কাঠের পাটা। তিরশ্চী তাহলে আড়াআড়ি ভাবে দেওয়া পাটা (cross-bar)।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৪।১১-তে সামের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সামের মূল **বৃহৎ** ও **রথন্তর**। 'সামের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম'—গীতা। ঋক্-সংহিতায় বৃহৎ সাম না থাকলেও বৃহৎ শব্দের ব্যবহার রয়েছে 'ঋতং বৃহৎ'। আর ১।১৬৪।২৫-এ 'রথন্তরে সূর্যং পর্যপশ্যত'।

ব্রহ্ম সামময়। **সাম**=সুর, ছন্দোময় বাণী। তাহলে ব্রহ্ম বা বৃহৎ যিনি তিনি ঋতচ্ছন্দে বিবৃত নিত্য কাল। কোথাও তার তাল কাটে না। পাইথাগোরাসের প্রোপরশন ও হারমনি থিয়োরী এবং মিউজিক্যাল স্ফিয়ারের ধারণা ভারত থেকেই নেওয়া, এমন হতে পারে। বৃহৎ তাহলে দ্যুলোক, রথন্তর পৃথিবী।

**রথন্তর** শব্দটি কিন্তু অসূর্যম্পশ্য ন্যায়ে সিদ্ধ নয়—ওতে তৃতীয়া বিভক্তি, রথেন তরতি। দেহরথ দ্বারা বাহিত হয়ে সূর্যলোকে পৌছাই। এই রথ ছুটিয়েই লোকোত্তরে উত্তীর্ণ হলাম—রথন্তর শব্দটিতে এই ব্যঞ্জনা রয়েছে। রথন্তর সাম তাহলে যেন আমাদের জীবনবীণা। 'রথংতরে সূর্যং পর্যপশ্যত'—এই রথে পথ পাড়ি দিয়েই সূর্যকে (বৃহৎকে) দেখলাম। (রবীন্দ্রনাথের 'তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো' স্মরণীয়)। বৃহৎ সাম তার রাগিণী, আর জীবনকুঞ্জে তার অনুরণনই রথন্তর সাম।

ব্রহ্ম যে-মঞ্চে আসীন, বৃহৎ ও রথন্তর সাম তার দুটি পূর্বপাদ। অন্য দুটি হল শ্যৈত ও নৌধস।

**শ্যৈত**—তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে সপ্তম অধ্যায়ে আছে শ্যেন পশুর (প্রাণের) সঙ্গে যাবে না রথন্তরের সঙ্গে যাবে? প্রাণশক্তি সম্ভূতির দিকে চলেছে। শ্যৈত শব্দের সঙ্গে শ্যেনের কোন সম্পর্ক আছে কি?

বাজসনেয়ী সংহিতায় শ্যেত একটি শব্দ আছে। মহীধর ও উবট বলছেন শ্যেত=শ্বেত। তাহলে শ্যৈত কি শ্যামলা রং? ছান্দোগ্যে শ্যাম ও শবল দুটি শব্দ আছে। শ্যাম সেখানে লোকোত্তর, পরঃকৃষ্ণ।

আর শবল এই বিশ্বজগৎ, চিত্রবর্ণ। শ্যাম+শ্বেত দুটির সন্ধিতে যদি শ্যৈত শব্দের উদ্ভব হয় তবে ওর অর্থ শ্যামলা রঙই হবে।

**নৌধস**—নোধসের আবিষ্কৃত হতে পারে। নোধা গৌতমবংশীয় একজন ঋষি। ঋক্সংহিতায় (১।৫৮-৬৪) তাঁর সূক্ত রয়েছে। নোধা সম্বন্ধে এক জায়গায় এই রকম উল্লেখ পাওয়া যায়—ব্রহ্মকে ভাগ ভাগ করা হচ্ছে সেখানে,

এবং বলা হচ্ছে সর্ববৃহৎ ভাগটি নোধাকে দাও। ইনি হয়তো প্রাচীন এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন।

সামগুলি সবই জোড়ায়-জোড়ায় রয়েছে। অতএব একটি বৃহৎ অন্যটি রথন্তর—মোটামুটি এই দুই শ্রেণীতে সবগুলিকে ভাগ করা যেতে পারে। তাহলে শ্যৈত = রথন্তর ; নৌধস = বৃহৎ সাম।

**বিচক্ষণাসন্দীর** চারটি পায়ার কথা হল। এবার বলা হচ্ছে ওই আসন্দীর নীচের পাটা দুটি **বৈরাজ** ও **বৈরূপ সাম**—বিশ্বমূলা শক্তি ও তার রূপকৃৎ নির্মাণ-প্রজ্ঞা, আর আড়াআড়িভাবে দেওয়া পাটা দুখানি শাক্বর ও রৈবত।

**বৈরূপ** ইউরোপীয়ান অর্কেস্ট্রা। অরণ্যানীসূক্তে এর রূপ ফুটেছে।

**বৈরাজ** বিরাট পুরুষকে মনে পড়িয়ে দেয়। আগেই এ দুটি সামের আলোচনা হয়ে গেছে। মূল শ্রেণীবিভাগানুযায়ী বৈরূপকে রথন্তর এবং বৈরাজকে বৃহৎ সাম বলে ধরা যেতে পারে।

**শাক্বর** শক্বরী নামে ছন্দ আছে। বুৎপত্তিতেই প্রকাশ ( √ শক্ ) এটি শক্তির সাম। বিশ্বশক্তির ব্যাকৃত রূপ শাক্বর সাম বা শক্বরী ছন্দ। এটি রথন্তর।

**রৈবত**—রয়ি-বৎ, রয়ির ব্যাখ্যা আগে গেছে। পুরাণে রেবতী বলদেবের পত্নী। রৈবত তাঁর জনক। রৈবত হল বৃহৎ সাম।

ব্রহ্মের **বিচক্ষণা আসন্দীই** প্রজ্ঞারূপা। প্রজ্ঞাবলেই তিনি বি-চক্ষণ বা বিশ্বতশ্চক্ষু।

কয়েকটি দুর্বোধ্য শব্দ আছে এখানে। **শীর্ষণ্য** বোধ হয় সিঁথান। **আস্তান**—রজ্জু বা চন্দ্রাতপ ? রজ্জু হওয়াই সম্ভব। নেয়ারের খাটের মত টানা দেওয়া ফিতাই আস্তান। **উপশ্রয়** তাকিয়া এবং **উপবর্হণ** হল বালিশ।

প্রজ্ঞারূপী বিচক্ষণা আসন্দীর উপর **অমিতৌজা পর্যঙ্ক**। এটি প্রাণরূপা। প্রজ্ঞার উপরে প্রাণের প্রতিষ্ঠা—কৌষীতকীর মূল কথা এ-ই।

অমিতৌজা পর্যঙ্কের দুটি পাদ **ভূত ও ভবিষ্যৎ**। কালের পশ্চাদ্‌বর্তিতা ও পূর্বগামিতা ব্রহ্ম-পর্যঙ্কের দুটি চরণ—এ এক আশ্চর্য কল্পনা। মহাকালকে (Eternal Timelessness) অনুভব করলে একটি বিন্দুতে ত্রিকাল সম্পুটিত এই বোধ জাগে। তখন ভূত ও ভবিষ্যৎ নিত্যবর্তমান ক্ষণ-শাশ্বতীর দুই

পদক্ষেপ—এ কল্পনা অবাস্তব মনে হয় কি? আজকাল অ্যান্টি-ম্যাটার থিয়োরিতে এ ধরনের সম্ভাবনার কথা আলোচিত হচ্ছে।

শ্রী এবং ইরা ব্রহ্ম-পর্যঙ্কের অন্য দুটি পাদ। শ্রী বিষ্ণু বা সৌরশক্তি, দ্যুলোক; বৃহৎ সাম। ইরা অগ্নিশক্তি বা পৃথিবী, রথন্তর। ভদ্র ক্রতু will-power √ভদ্ জলা। যজ্ঞাযজ্ঞীয় উৎসর্গভাবনা।

উদ্গীথ অবশ্যই সামের সার, প্রণব। বলা হচ্ছে এটি ব্রহ্মের যেন তাকিয়া। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসতে হয় অর্থাৎ ওঙ্কার তাঁর অবলম্বন। 'কঠ'তে ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ আলম্বন। শ্রী তাঁর উপবর্হণ—দুপাশে দুটি পাশবালিশ কি? এই শ্রী তাঁর প্রিয়াযুগল—মানসী ও চাক্ষুষী।

১।৬॥ ব্রহ্ম হতে জাত কাল মহাকাল। সাংখ্যের পরিভাষায় এ হল কালের সদৃশ পরিণাম। সেই কাল জগতে অভিব্যক্ত হল যখন, তখন তা-ই বিশ্বজগতের কালপরিণাম। বহুধা বিসৃষ্টি বা বি-ভূতির জন্য যে-কাল তা-ই সংবৎসর। বি-ভূতির মূলে সম্ভূতি। বীজ হতে গাছের উদ্ভব একটা ইতিহাস। এটা কালে ঘটছে। যে-বীজভাব হতে তার উৎপত্তি তাকেই বলব সম্ভূতি। যে কালমানে সম্ভূতির বিস্তার বা প্রপঞ্চন সেটি কালমাত্রা সংবৎসর। অঘমর্ষণসূক্তে ঋত এবং সত্যের কথা আছে। ঋত হতে ঋতু। সংহিতায় 'ঋতং বৃহৎ' পদগুচ্ছ বহুপ্রযুক্ত। বৃহৎ শব্দ জগতের মত শতৃ-প্রত্যয়ান্ত। জগৎ চলছে চলছে। বৃহৎ-ও নিত্য পরিবর্ধমান কাল। ঋতু—ব্রহ্মযোনি।

ঋতু হতে আর্তব। বীজে যত কাল সংপুটিত আছে তার প্রতিটি বৃক্ষ হলে একটি বীজ হতে অরণ্য সৃষ্টি হত। এই যে ঘন সংনদ্ধ সমষ্টিপ্রাণ (পুরাণে সগরজায়ার অলাবু প্রসব স্মরণীয়) এইটি ঋতু। বীজগুলি আর্তব। ঋতু ও আর্তব সৃষ্টির প্রাক্‌কালীন অবস্থা সূচিত করছে। বীজ ফেটে গেলেই এল চলমান কাল, কালচক্রের আবর্তন শুরু হল।

এখানে যে অবস্থার কথা বলা হচ্ছে তা মৃত্যু নয়, প্রেতি বা সমাধির অবস্থা। যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার মত। বিদ্বান এখানে সম্ভূতির সত্য জেনেছেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র (ঋ ২/৪৩/২)। ইনিই ব্রহ্মা বা ঋত্বিক্-শ্রেষ্ঠরূপে সমগ্র বেদবিদ্যার ধারক। তাঁর নির্দেশে যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের অঙ্গহানি ঘটলে তিনি নিজশক্তিতে তা পূরণ করতে সক্ষম। সুতরাং জ্ঞান ও শক্তি দুইই তাঁর আছে। কৌষীতকীতে বিদ্বানকে সেই ভূমিকাতে দেখছি। এ যেন দেহ-প্রাণ-মন সব নিয়ে ব্রহ্মের সামনে দাঁড়িয়ে

উদাত্ত ব্রহ্মঘোষ 'ঋতুরস্মি আর্তবোঽস্মি…তেজোভূতস্ত আত্মা ভূতস্ত ভূতস্যাত্মা।

ছান্দোগ্যে ভূতবীজ বলে একটা কথা আছে। অনেকে সেখানে জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি নানা ভূতের কথা তুলেছেন। কিন্তু এই ভূতের অর্থ প্রাণী। ছান্দোগ্যে ভূত নয়, বলা হয়েছে ভূতবীজের কথা। এখানে **তেজোভূত** বা **ভূতস্ত ভূতস্ত** বলে কিন্তু মহাভূত বা ওই জরায়ুজ অণ্ডজ ইত্যাদি কোনও ভূতের কথাই বলা হয়নি। তিনটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হচ্ছে সবশুদ্ধ—(১) আকাশ বা দ্যৌঃ পিতা। (২) আকাশাদ্ যোনেঃ সম্ভূতঃ—এই যোনি, দ্যৌষ্পিতার ভার্যা বা মাতা পৃথিবী। মা এবং ভার্যাকে একসঙ্গে ধরলেই মহাপ্রকৃতিকে ভাবরূপ দেওয়া (idealise করা) যায়। আকাশযোনি একাধারে মাতাপিতৃতত্ত্ব বা উভলিঙ্গ (দ্রঃ ঋ ১০/৫/৭)। শাকপূণির সংশয় ছিল দেবতা নারী না পুরুষ। দেবতা তাঁকে দেখা দিলেন অর্ধনারীশ্বররূপে। (৩) বিদ্বান এখানে যেভাবে নিজের জন্মবিবরণ দিয়েছেন তাতে অগ্নির জন্মকথা মনে পড়ে। সংহিতায় অনেক জায়গাতেই পাই অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র। আবার তিনি একাধারে পিতা মাতা এবং পুত্র ত্রিতত্ত্ব অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ বিশ্বসম্ভূতি—এ-ও আছে। বিদ্বান নিজেকে ঠিক যেন সেই 'বিশ্বস্ত কেতুর্ ভুবনস্ত গর্ভ আ রোদসী অপৃণাজ্ জায়মানঃ' (ঋ ১০/৪৫/৬) বলে অনুভব করছেন।

'প্রত্নঃ পিতা' দ্যৌঃ বলে ধরলে আকাশকে উভলিঙ্গ ভাবা যায় স্বচ্ছন্দে। সংহিতায় দ্যৌঃ স্ত্রীলিঙ্গও হয়। একটি অগ্নিসূক্তে দেবতাকে উরঃ এবং উর্বঃ এ-দুটি পুং ও স্ত্রীচিহ্নবিশিষ্ট বলা হয়েছে। আকাশ হতে যে যোনি তাই মায়া, ব্রহ্মের নির্মাণপ্রজ্ঞা। 'তে মায়িনো মমিরে সুপ্রচেতসঃ' (ঋ ১।১৫৯।৪)। মা নির্মাতা বলেই তাতে মা-ধাতুর প্রয়োগ। মায়া তার পরম সৃষ্টিকৌশল (master plan), তাঁর কল্পনা (idea)। অর্ধনারীশ্বর নিত্যমিথুন হতে জাত হয়েছেন ব্রহ্মপুত্র অগ্নি বা নিত্যজীব—গীতায় যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' (১৫।৭)। ইনিই প্রথম অবতার বা 'পুরুষ'। ভাগবতে—'জগৃহে পৌরুষং রূপম্'। শৈবদর্শনেও জীবসম্পর্কে তিনটি তত্ত্বের অবতারণা করে আণব, মায়ীয় ও কার্মণ মলের কথা বলা হয়েছে। প্রথম অবতার পুরুষ বা অণুর (নিত্য জীব) উৎপত্তির পর কাল উৎপন্ন হয়।

উপনিষদে সংবৎসরকে প্রজাপতি বলা হয়েছে। এখানে ওই পুরুষাবতারই সংবৎসর। তেজ তাঁর চিৎ-তপস্ (energy)—'তেজো রসো নিরবর্তত' (বৃ. উপ ১।২।২)। তেজোভূত=সূর্যরশ্মি। আদিত্যবিম্বই প্রাকৃত কালমানের মাত্রা (unit)। পুরুষ এই সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থ—তার আত্মা বা মৌল তত্ত্ব (main principle)।

সংবৎসররূপী প্রজাপতি আবির্ভূ'ত হতেই ভূতবর্গ ব্যাকৃত হল। অঘমর্ষণসূক্তে এ-প্রসঙ্গ আছে।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ দেখানো হল তাহলে—ব্রহ্ম, ব্রহ্মপুত্র সংবৎসর বা পুরুষ এবং সমষ্টি ভূত। প্রথমটি অসম্ভূতি। দ্বিতীয় স্তরে সম্ভূতি, তার পরের ধাপে বি-ভূতি।

আত্মা শব্দটি আসলে অত্মা=অৎ মা (√অত্-চলা) আ+অৎমা= আত্মা—আধারে যিনি আ-গত বা আবিষ্ট। (গূঢ়োত্মা, বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী—বে. মী.)।

বিদ্বান বললেন, তুমি আত্মা। তুমি যা আমিও তাই। তু. ইয়ং মে নাভির্ ইহ মে সধস্থম্ ইমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ (ঋ ১০।৬১।১৯)।

সত্যমিতি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে সৎ বলতে যা মূর্ত তা-ই। আর যা অমূর্ত তা-ই ত্যৎ বা ত্যম্। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও অনির্বচনীয় তত্ত্ব তৎ। কঠে, এতদ্বৈ তৎ। এখানে ঠিক তার উল্টা বলা হচ্ছে।

সংহিতায় 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'…বলা যেতে পারে এইটি এখানকার সতের নির্বচন। দেবতা প্রাণ। এ-সবই যদি সতের অভিব্যক্তি হয় তাহলে তারাও অনির্বাচ্য বৈকি। সৎ এখানে ঈশ্বর আর তৎ হিরণ্যগর্ভ বা প্রাজাপত্য সূর্য।

১।৭॥ কৌষীতকীতে ব্রহ্ম শব্দ তার ব্যুৎপত্তিলভ্য মূল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সংহিতায় ব্রহ্ম মন্ত্র ও মন্ত্রশক্তি দুই-ই। বৃহতের চেতনা ও শক্তি উভয়ই ব্রহ্ম। ঋগ্বেদে ব্রহ্ম বিশেষ করে প্রজ্ঞা, অথর্বসংহিতায় প্রাণ। বিশ্বামিত্রের ব্রহ্ম ভারতজনকে রক্ষা করছে—এ মন্ত্রেও ব্রহ্ম প্রজ্ঞা এবং শক্তি। শৈবদর্শনে মন্ত্রবীর্য একটি সংজ্ঞা রয়েছে। পরে ওটি হয়ে দাঁড়িয়েছে শব্দব্রহ্ম—'শব্দব্রহ্মাতিবর্তত' (গীতা)। মূলে পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম যে এক 'যজুর্দরঃ সামশিরাঃ' ইত্যাদি বলে এখানে সেই ইঙ্গিতই করা হচ্ছে। সংহিতার প্রসিদ্ধ উক্তি 'যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্'।

তিনি ও তাঁর জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তি যে একই, আধুনিক অরবিন্দদর্শনে এর উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে।

এখানে ব্রহ্মের যে বর্ণনা দেওয়া হল তন্ত্রের ভাষায় তার সংজ্ঞা মন্ত্রমহেশ্বর। তিনি মন্ত্রময় বিগ্রহ। পরাবাক্ হতেই বিশ্বোৎসৃজন—গৌরী র্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী, অষ্টপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ (ঋ. ১।১৬৪।৪১)। ব্রহ্ম এখানে সেই তাৎপর্যেই ব্রহ্ম বা মন্ত্রময়। **ময়ট্** প্রত্যয়ে তাঁর শক্তিরূপ (energy) বোঝান হচ্ছে। **মহান্** বলে বোঝান হচ্ছে পুরুষতত্ত্ব। **ইতি** তাঁর বি-ভূতি।

যজুর্বেদে যাঁকে মহাপুরুষ বলা হয়েছে উপনিষদে 'পুরুষং মহান্তম্'—তিনিই ব্রহ্ম।

**নাম** তাঁর অবতরণ (descent) noumen বা প্রভাব, আবেশ। একটি মন্ত্রে রয়েছে, প্রথমচ্ছদ্ অবরাঁ আবিবেশ—তিনি এক হয়েও নাম-রূপে বিশ্বকে আবিষ্ট করে রেখেছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে নাম-রূপের আলোচনায় পাই বাক্ নামের, ব্রহ্ম বা বৃহত্ত্বের সাধক। ব্রহ্ম ও বাক্ একটি মিথুন। নামে তাহলে ব্রহ্মেরই আবেশ। প্রতিটি রূপের অর্থ তার নামে। নাম হতে মন্ত্র। মন্ত্র জীবের আত্মা বা তার ভাবরূপ। আগম বলেন জীবমাত্রেরই যন্ত্র ও মন্ত্র পূর্বনির্দিষ্ট। সুতরাং নাম ব্রহ্মবীজ। ব্রহ্ম যেন পরাক্‌বৃত্ত (objective), নাম তাকে প্রত্যক্‌বৃত্ত (subjective) করে। কথাটা বড় গভীর। পঞ্চদশীকারের 'বিষয়ানন্দই ব্রহ্মানন্দের দ্বার'—উক্তি স্মরণীয়। ব্রহ্মের **পুংবাচী নাম** অবগত হই প্রাণসহায়ে। প্রাণ অতএব পুরুষ। **বাক্ স্ত্রী** আর **মন নপুংসক** বা অব্যক্ত লিঙ্গ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে অনুরূপ উক্তি—প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। বৈষ্ণবের সহজিয়া-দর্শনে রস ও রতির কথা আছে। আনন্দ রসস্বরূপ। এটি পুরুষত্ব বা পুরুষের ভাব—রসো বৈ সঃ। আর প্রকৃতিভাব ফুটছে রতিতে। Sex function-এর তত্ত্ব সূত্রাকারে বলা হয়েছে। এই ভিত্তিতে একসময়ে এদেশে দুঃসাহসীরা অনেকগুলি সাধনা পত্তন করেন।

কথাটা হল মনের সাক্ষিসত্তায় জোর দেওয়া। পশুর অনুভব ব্যামিশ্র। মানুষ যে-কোন জৈব ভোগ পৃথক্ থেকে আস্বাদ করতে পারে জৈব ও ভাববৃত্তিকে একাকার করে না ফেলে। আহার একটা স্থূল ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাপার। কিন্তু মানুষ তাকে শুদ্ধ রূপ (Sublimation) দিয়ে বলতে পারে

'প্রসাদ পেলাম'। গীতায় এই প্রসাদতত্ত্বের সুন্দর বিবৃতি রয়েছে। এ ঠিক স্থূল ভোগ নয়, রসের তর্পণ—pure bliss। আর রতি তৈত্তিরীয়ের ভাষায়—সৌম্য আনন্দ (Beautitude)। রস ও রতি বা আনন্দ ও অমৃত সম্ভোগই সহজ সাধনার মূল কথা।

জিতি শব্দটি অনন্য। কেবল বেদেই পাওয়া যায়। জিতি অর্থে সব কিছু জয় করা—প্রভুত্ব (mastery)। ঈশনা কথাটিতে যেমন তাঁর অকুণ্ঠ বীর্য সূচিত হয় জিতিও তেমনি। ব্যষ্টি তাঁর সম্ভোগ—ব্যাপ্ত বা বৃহৎ হয়ে নিত্যকাল বেড়ে চলার ভাব। ব্রহ্ম সর্বজিৎ।

প্রজ্ঞা মৌল তত্ত্ব (basic idea), তার শক্তিরূপ (dynamic force) প্রাণ। প্রজ্ঞা বলবন্ত ও প্রাণবন্ত হওয়া চাই। প্রাণের দুটি বৈভব, সর্বজয়ী শক্তি ও সর্বভোগ ( সম্ভোগ )। ব্রহ্ম=সৎ চিৎ এবং আনন্দ। সৎ কূটস্থ ভাব (neutral)। প্রজ্ঞা=চিৎ; আনন্দ ও শক্তি=প্রাণ। অসৎ—লোকোত্তর তত্ত্ব (Transcendence)।

সৎ+চিৎ তত্ত্বে শিব, আনন্দই শক্তি।

পুনরাবৃত্তি অধ্যায় সমাপ্তি সূচক।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

কৌষীতকীর দ্বিতীয় অধ্যায়টি প্রকীর্ণ। ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যকেও এ-ধরণের কিছু কিছু কথা আছে।

প্রথমে প্রাণবিদ্যার কথা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলা হচ্ছে আমার মধ্যে যে-প্রাণ সেই ব্রহ্ম। অন্য সব উপনিষদে প্রাণ গৌণ, কেবল প্রশ্নোপনিষদে ও এখানে প্রাণব্রহ্মের কথা।

প্রাণবিদ্যার প্রবক্তা এখানে যথাক্রমে কৌষীতকি ও পৈঙ্গ্য। দুজনেই এ-প্রসঙ্গে বাক্ চক্ষু শ্রোত্র এবং মনের কথা তুলেছেন। ছান্দোগ্যে এরা ব্রহ্মের দ্বারপাল বলে পরিচিত (৩/১৩)। উপনিষদের অনেক জায়গাতেই এদের উল্লেখ আছে। প্রাণের সঙ্গে স্পর্ধা করে শেষে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে—এ তথ্যও অন্যান্য উপনিষদে পাই।

কৌষীতকীতে দেখানো হয়েছে প্রাণের পরিকররূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয় তার সেবানিরত। তার মাঝখানে প্রাণ সম্রাটের মত বসে আছে। আপনি ফুটে চলেছে আপন আনন্দে—সে অযাচমান। বেদেও প্রাণের এই রূপ—রূপের জগৎ প্রাণ হতে যেন স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে প্রপঞ্চিত হচ্ছে। কথাটি খুব গভীর আর প্রাণব্রহ্ম ( বৃহৎ )-বাদের মূল ভাবই হল এই। প্রাচীনরা বলতেন প্রাণের সঙ্গে ঝগড়া করে শুধু মনই। বাকী সব ইন্দ্রিয় তার বশ্যতা স্বীকার করে চলে, তার শাসন লঙ্ঘন করে না।

'একং সদ্ বিপ্রাঃ' মন্ত্রটিতে দুটি ধারার সাধন-সঙ্কেত রয়েছে। একটিতে ইন্দ্রের প্রাধান্য, এটি মনঃপ্রধান ; অন্যটিতে মাতরিশ্বাই মুখ্য, এই ধারায় রয়ি বা প্রাণই প্রধান। পরে এই সাধনার ধারা দুটি রাজযোগ এবং হঠযোগে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে প্রাচীনদের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল। কেউ হঠযোগকেই সমাদর দেখিয়েছেন, কেউ-বা রাজযোগকে। হঠযোগের মান পরে খাটো হয়ে গেছে। তখন হঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে হঠকারিতা, দেহের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। কিন্তু প্রথমে এর ভাবটি উঁচু দরের (noble idea) ছিল। প্রাচীনরা বায়ু সম্বন্ধে যা বলেছেন তা পরবর্তীকালের হঠযোগীদের ধারণার সঙ্গে মেলে না।

বৈদিকরা বলতেন আমাদের যে মনোজগৎ তা জাগ্রতে প্রকট। মন যেখানে লয় হয়ে যায় সেই অবস্থাটি ধরে সমাহিত হতে হবে। ধ্যানে তা-ই হয়, এ রাজযোগীর মত। কিন্তু মনোলয়ের স্বাভাবিক ধারা এ নয়। সেটি হয় ঘুমের সময়। প্রশ্নোপনিষদ যেমন গুছিয়ে বলেছেন, 'ঘুমের সময় সমস্ত ইন্দ্রিয় মনোরূপী পরম দেবতায় একীভূত হয়। দেহপুরে তখন জেগে থাকেন প্রাণাগ্নিরা।' নিদ্রাকালে মন স্বভাবত বৃত্তিশূন্যতার দিকে ঝোঁকে। উদান-সহায়ে তাকে উপরের দিকে ঠেলে দেওয়া যোগের একটা রহস্য। প্রশ্নে ঠিক এই সঙ্কেতটিই আছে। 'স এনং যজমানমহরহ ব্রহ্ম গময়তি।' পরম তেজে অভিভূত মন তখন আর স্বপ্নও দেখে না। এইটি যথার্থ মনোলয়ের ভূমি।

বেদান্ত বলছেন সুষুপ্তি ব্রহ্মের আনন্দময় অবস্থা। মনোলয় হলেও সুষুপ্তিদশায় শরীরে যে সুখবোধ—ওইটি প্রাণব্রহ্ম। রাজযোগে আসন-ভাবনায় এই সুখবোধ অনুশীলিত হয়—'স্থিরসুখমাসনম্'। প্রযত্ন শিথিল করে দাও, কোন আয়াস বা চেষ্টা থাকিবে না কোথাও। কেবল প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত স্পর্শ অনুভূত হবে। পতঞ্জলিও তাহলে সাধন সৌকর্যার্থে বৈদিক প্রাণব্রহ্ম-বাদের কিছুটা নিয়েছিলেন।

সাধারণ কৌশলটি এইরকম—ঘুমের আগে বেশ আরামে গা ছেড়ে দিয়ে মন যখন ধীরে ধীরে বৃত্তিশূন্য হয়ে আসে সেই সন্ধিক্ষণটা ধরা চাই। তাহলেই প্রাণব্রহ্মের অনুভব মেলে। আমার মধ্যে ব্যামিশ্র ক্রিয়ায় প্রাণশক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। ওই শক্তির মধ্যে আবার যা স্বতঃস্ফূর্ত তা-ই প্রাণ আর যেটি আয়াসসাধ্য বা প্রচেষ্টাময় তা বাক্, মন। একটু বিবিক্ত হয়ে লক্ষ্য করলেই ধরা যায় আমাদের মনের উপরতলায় অনবরত ঢেউ উঠছে পড়ছে—ওটা বাক্য ও মনের প্রয়াস। কিন্তু তার তলে তলে অন্তঃ-স্রোতের (undercurrent) মত একটি শান্ত অবিক্ষুব্ধ ভাব একটানা বয়ে চলেছে। ও-ই প্রাণ। প্রাণ কেবল জীবনযোনিপ্রযত্ন (life force) নয়, মননহীন প্রজ্ঞাকেও সে পুষ্ট করে চলে অমোঘ শক্তিতে।

২।১॥ অযাচক প্রাণ রাজমহিমায় আসীন—মন বাক্ চক্ষু শ্রোত্র, এরা তার অনুচর। এদের দিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে তার যা-কিছু কারবার চলছে। ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া বিক্ষিপ্ত কিন্তু প্রাণ অবিক্ষিপ্ত।

সমস্ত বিক্ষোভের পিছনে প্রাণ নিঃশব্দে বয়ে চলেছে এটি ধরতে পারলে



ব.বি./উপনিষৎ/৮৬-৭

মৃত্যুও সহজ হয়ে যায়। প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্‌......স্পন্দমান প্রাণই সর্ব-প্রস্রবণ। 'মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে'। ওই প্রশান্ত অস্তিতায় পৌঁছবার উপায় হিসাবে রাজযোগী মনের বিক্ষোভকে আয়ত্তে আনার কথা তোলেন। প্রাণব্রহ্মবাদের ধারা তার চেয়ে সহজ। **মন দূত**, বাইরে থেকে সে খবর বয়ে আনছে আর ক্ষণে ক্ষণে লয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'আপূর্যমাণম্‌ অচলপ্রতিষ্ঠম্‌' উপমাটি প্রাণ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

**পরিবেষ্ট্রী** পরিচারিকা—যে পরিবেশন বা সেবাবিধান করে। ব্রহ্ম ও বাক্‌ অবিনাভূত। অভিব্যক্তির পর্বে ব্রহ্মের বহির্মুখী যে শক্তিবিচ্ছুরণ তা-ই **বাক্‌**। বাক্‌ নানাবিধ। সংহিতাতেই তার চারটি পাদের সঙ্কেত রয়েছে। প্রাণ হতে সঙ্কল্পরূপে যা ফোটে তা পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীতে অভিব্যক্ত হয়। প্রাণের radio-activity-ই বাক্‌। প্রাণ সৃষ্টিমূলা শক্তি আর যা সৃষ্টি হচ্ছে তা বাক্‌। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে প্রাণ ও বাক্‌কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন আকাশ ও প্রাণ একটি মিথুন, ব্রহ্ম ও বাক্‌ আর একটি, তেমনি প্রাণ ও বাক্‌ একটি মিথুন এ-ও আছে। প্রাণব্রহ্মবাদে বাক্‌ তাঁর শক্তি। সংহিতায় এই বাক্‌ গৌরী, তা হতেই সৃষ্টিপ্রকরণ।

**চক্ষু** বাইরের সবকিছু দেখে একটা প্রত্যয় উৎপন্ন করে। সে গ্রহণযন্ত্র (receiver)। কৌষীতকি তাকে **গোপ্তা** বা গোপা বলছেন, সব রক্ষণা-বেক্ষণ করছে দর্শনেন্দ্রিয়। রাখাল যেমন গোযূথকে হারিয়ে যেতে দেয় না, চোখও তেমনি রূপের জগতে হারিয়ে যেতে দেয় না আমাদের। তাকিয়ে কত কিছুই মানুষ দেখে। চক্ষু তার মধ্যে পারম্পর্য আনছে, গুছিয়ে তুলছে বাইরের বিভিন্ন দৃশ্যাবলীকে।

**শ্রোত্র** তেমনি **সংশ্রাবয়িতৃ**, সম্যক্‌রূপে শোনাচ্ছে। জগৎ ধ্বনিময়। কত কি শুনছি, কিন্তু শ্রোত্র তার অর্থ আবিষ্কার করে। বিশেষ বিশেষ শব্দও সে-ই শোনে, কেবল বাইরে নয় অন্তরে। এদিক থেকে শ্রোত্রের এক অসামান্য ব্যঞ্জনা রয়েছে। ব্রহ্মকে যখন আমরা শুনি তখনই তাঁকে পাওয়া গভীর হয়। নাদানুসন্ধান সাধনার অন্যতম একটা ধারা। এটি শ্রোত্রের ক্রিয়াকারিতার উপরেই নির্ভর করে। চক্ষুর তুলনায় শ্রোত্র কিন্তু অনেকটা তটস্থ (passive) এবং বাকের সঙ্গে সংপৃক্ত।

কৌষীতকি বলেছেন প্রাণের সাধনাই মুখ্য। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-গুলিকেও যারা প্রাণের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে, তারাই ওগুলি দ্বারা সম্যক্‌

উপকৃত হয়। মনের সাধনা ধ্যান-ধারণা, বাকের জপযজ্ঞ, চক্ষুর সাধনা জ্যোতির্দর্শন এবং শ্রোত্রের নাদানুসন্ধান। কিন্তু প্রাণই ব্রহ্ম এ-ভাব যাঁর ধারণা হবে তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয়বৃত্তিই যে পূর্ণত্ব (perfection) লাভ করবে তা সহজেই অনুমেয়। কারণ বাক্ প্রাণেরই পরিবেষ্ট্রী, মন দূত—ইত্যাদি। প্রাণই ব্রহ্ম—এ জানলে সর্বেন্দ্রিয় দিব্য হয়ে যায়। তখন ইন্দ্রিয় মাত্রেই দেবতা। বলা বাহুল্য যে এ কেবল যোগীরই হতে পারে।

বাসনা কামনা মনের, প্রাণের নয়। প্রাণ আত্মারাম, সংহিতার ভাষায় স্বধায় প্রতিষ্ঠিত। এ-প্রাণ অধ্যাত্ম শুধু নয়, অতিমানস মহাপ্রাণ। অধিদৈবত দৃষ্টিতে বায়ু ও মাতরিশ্বার সঙ্গে এক। এ-অনুভব যাঁর জেগেছে, নিখিল ভূত তাঁর বলি আহরণ করে।

২।২॥ রুধ্ ও রুহ্ ধাতুর অর্থমিশ্রণ ঘটেছে **আরুন্ধে** পদটিতে। সংহিতায় আরোধন শব্দের প্রয়োগ একটু অদ্ভুত ধরণের। পুরুষসূক্তে পাই 'অন্নেন অতিরোহতি'—এখানে অতিরোহণ লোকোত্তর স্থিতি (transcendental existence)। আবার শ্বেতাশ্বতরে অধিরোধন একটি ক্রিয়াপদ রয়েছে যার অর্থ অধিরোহণ—বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে, বায়ু মাথায় চড়া। চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিতে বাঁধ দিলে তা উর্ধ্বগামী হয়। তা থেকেই 'রোধন' ও 'রোহণ' দুটি ক্রিয়ার যৌগপদ্য ঘটেছে। 'আরুন্ধে' ক্রিয়াটিতে দুটি অর্থই খাটবে।

প্রাণব্রহ্মবাদের আলোচনায় দুই ঋষি দুটি ধারা নির্দেশ করছেন। কৌষীতকি দেখাচ্ছেন সম্প্রসারণের ধারা—এই মন দিয়ে অতিমানসকে পাওয়ার কথাই তিনি বলছেন। অগ্নি-ইন্দ্র-মিত্র-বরুণ—সে পথে দেবতার ক্রম এই। পৈঙ্গ্যের পথ বায়ুনিরোধ বা হঠযোগের, দেবতা যথাক্রমে অগ্নি-মাতরিশ্বা-আদিত্য-যম।

সব কিছুর মূলে সেই নিস্পন্দ প্রাণ, জৈন পরিভাষায় যা নিঃসত্ত্ব নির্জীব। সেই অনুভব জীবনে নামিয়ে আনা চাই। নাগার্জুন তাই বললেন—ভব ও নির্বাণ এক। মূলত তিনি এক মহা-বৈনাশিক। বিনাশ শব্দটি শ্লিষ্ট, হারিয়ে যাওয়া বা চরম পাওয়া দুই-ই বোঝায়। ব্রাহ্মণে রহস্য-ভাষায় বিনশন-তীর্থের কথা আছে—সরস্বতী সেখানে অন্তঃসলিলা। এমন এক ভূমি রয়েছে যেখানে গেলে সংজ্ঞা থাকে না। কিন্তু সে ভূমিতে যে যায় সে ফিরে আসে দিব্যচেতনা নিয়ে। মরমীয়া এ-অবস্থা বোঝাতে বললেন 'সব ছোড়ে সব

পাওয়ে।' ওই নিঃসত্ত্ব নির্জীব প্রাণের অনুভব জীবনে সত্য হলে, তখন 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' নিতান্ত কবিকল্পনা থাকে না। অথবা স্বচ্ছন্দে বলা যায়, 'জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ যেন পাই মরণে'।

জাগ্রতে যে-প্রাণ, সুষুপ্তিতেও সেই প্রাণই অচঞ্চল হয়ে বিরাজমান। প্রাকৃত জীবনে প্রাণকে আশ্রয় করেই মন এবং বাকের স্ফুরণ হচ্ছে। তাদের ক্রিয়া চঞ্চল। এটি জীবনে প্রবৃত্তির দিক। তার গভীরে আছে নিবৃত্তির প্রতিষ্ঠা। প্রাণ সেখানে স্তব্ধ। এই স্তব্ধতায় ডুবতে না পারলে প্রবৃত্তিরও স্ফূর্তি হয় না। মানুষকে তাই প্রাণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়াটা শিখতে হয়। ওই স্তব্ধ প্রাণ সর্বাধার।

**মনঃ পরস্তাৎ প্রাণ আরুন্ধে**—সচেতন থেকে মনকে প্রাণে লয় করে দিতে পারলে তা-ই হয় যোগীর 'নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ'। মনকে প্রাধান্য দিলে সহজে এ-অনুভব মেলে না। তাই তার মূলে প্রাণকে মুখ্য বলে অনুভব করা।

প্রাণের এ-মহত্ত্ব বা বৃহত্ত্ব যিনি জানেন সর্বভূত তাঁর **বলি আহরণ** করে। বলি উপহারে ওই নিস্পন্দ প্রাণের আর কি প্রয়োজন—একথা বলা যাবে না। মনকে শূন্য করে দিলে তখন বোঝা যায় প্রাণেরও বাসনা রয়েছে। অবশ্য মনের মত তা অর্থহীন নয়। ন্যায়ের ভাষায় তা হল জীবনযোনি-প্রযত্ন। তাকে রুদ্ধ করা যায় না। অথচ শুদ্ধ প্রাণ স্থূল অর্থে কিছু চায়ও না, তার মৌল লক্ষ্য জীবনের বিস্ফারণ। তাই সে না চাইলেও নিখিল ভূত তার প্রযত্নের আনুকূল্য করে চলে।

২।৩॥ কামনাসিদ্ধির উদ্দেশে প্রাণবিদ্যার দুটি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে এরপর। প্রথমটি **একধনাববোধন**। **একধন** লক্ষ্য বা কাম্য-বস্তু। তাকে **অভিধ্যান** করতে হবে। পতঞ্জলি চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের জন্য যথাভিমত ধ্যানের কথা বলেছেন। 'কি আমার চাই' সে-সম্বন্ধে সজাগ থাকাই হল প্রথম কথা। বৌদ্ধরা অভিদ্ধাকে ( =অভিধ্যান ) আসক্তির হেতু হিসাবে চিত্তমল বলেছেন। আবার ওকে ধ্যানভূমির সহায়কও বলেছেন। যাই হোক, মোট কথা হল যা চাই একাগ্রচিত্তে তা কামনা করে সংকল্পশক্তিকে সুতীব্র করে তুলতে হবে। ইচ্ছার জোরেই অভীষ্ট লাভ হয় যেন। সেই উদ্দেশ্যেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করে তাদের ও প্রজ্ঞার উদ্দেশে হোম করতে হবে। প্রাণের সঙ্গে প্রজ্ঞাকেও যে আহুতি

দিতে হবে, এতে বোঝা যায় প্রজ্ঞাবানেরই কাম্যকর্মে সিদ্ধিলাভ হওয়া সম্ভব। আসল শক্তি হল প্রজ্ঞার। গীতায় আছে—অখিল কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে জ্ঞানে।

অনুষ্ঠানটি অনেকটা ইন্দ্রজাল বা সিমপ্যাথেটিক রাইট-এর মত। মারণের বেলায় যেমন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কল্পিত মূর্তিকে উদ্দেশ করেই অভিচার করা হয়, অনেকটা যেন তেমনি। কোনও লেখক যেমন আদিবাসীদের রীতিনীতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যুদ্ধ নাচ ও গলা ছেড়ে চিৎকার গালাগালি ইত্যাদি উদ্যোগপর্ব সম্বন্ধে বলছেন—ও হল মনটাকে চেতিয়ে তোলা। মনে একটা ভাব জোর ধরলে দেহে তার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক; পড়ে যাব ভাবলে অনেক সময় দেহ টলমল করে ওঠে। সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে ইচ্ছাশক্তি বা মনের উদ্দীপন আসল কথা। Ideo-motor activity বলে একটা কথা আছে—যার তাৎপর্য হল সব কাজের মূলে আছে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য। ভাবই কর্মে রূপ ধরে। আবার কর্মও ভাব জাগায়। অনুষ্ঠান সহায়ে ভাবোদ্দীপন নিতান্ত একটা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয় তাহলে। মনোবল সম্পাদনের জন্য মন্ত্রোচ্চারণ আর শারীর সক্রিয়তার জন্য আচার—রহস্যানুষ্ঠানগুলিতে এই জিনিস থাকে।

জ্যোতিষবিজ্ঞানও ক্রিয়াকাণ্ডের অঙ্গ। যা করতে যাচ্ছি তার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগ রয়েছে এই বিশ্বাসে দিনক্ষণ কালের বিচার। দৈবীশক্তিগুলি আমার অনুকূল, মনে এ ধারণা নিয়ে ক্রিয়া করতে হয়।

**অগ্নিম্ উপসমাধায়** নিজের হৃদয়ে এবং বাইরে বেদিতে অগ্নি সমিদ্ধ করতে হবে।

**পরিসমুহ্য**=সংবাহন—মাটিতে ঝাঁটা বুলানো।

**পরিস্তীর্য** কুশ ছড়িয়ে দিয়ে।

**পর্যুক্ষ্য** জল ছিটিয়ে।

**উৎপূয়** ঘি গলিয়ে। ঘৃতের বৈদিক অধ্যাত্মব্যঞ্জনা ধরলে বলা যায় তা উৎপবিত, অর্থাৎ উর্ধ্বস্রোতা হবে। এতে সোম-সম্পর্ক সূচিত হচ্ছে।

**অবরোধিনী**—দেবতা আমার ভিতরে ওই বস্তু অবরুদ্ধ করুন। বাধা যা কিছু আছে তার চেয়ে আমার ইচ্ছা বলবতী। বাকের মধ্যে আমার প্রাণ ঢেলে দিয়ে ইষ্টবস্তুর সঙ্গে আমি এক হয়ে যাই যাতে তার ও আমার চাওয়া এক হয়। দেবতা বা ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞা মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদি আমার ইন্দ্রিয়

দিয়ে অনুকূল করে তুলব—এরকম ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগই এ-অনুষ্ঠানের সারমর্ম।

পাতঞ্জলে ভূতজয়ের পদ্ধতি আছে।

২।৪ ॥ দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটির নাম **দৈব স্মর**। স্মর এখানে স্মৃতি। দেবতার সহায়তায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্মরণীয় হওয়া এর লক্ষ্য, তাই হয়তো এই নাম। ব্যাপারটা এক ধরনের তন্ত্রোক্ত মোহন বা বশীকরণ।

২।৫ ॥ আমাদের সমস্ত প্রাচীন সাধনারই মূল ছিল বেদে। অজপা জপ বা যোগাদি বাইরের থেকে আমদানী হয়েছে ইউরোপীয়রা বলেন। তা যে নয় প্রতর্দনের এই আন্তর অগ্নিহোত্র প্রসঙ্গে তার প্রমাণ মেলে।

**প্রতর্দন** প্র + তর্দন— √তৃদ্ ধাতুর অর্থ ছিদ্র করা। উপনিষদে 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ'—মন্ত্রটিতে √তৃদ্ ধাতুর প্রয়োগ মেলে। যিনি ছেঁদা করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন; তিনিই প্রতর্দন। অর্থাৎ বাইরের আবরণ ভেদ করে ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার ধারাই প্রতর্দনের সাধনা।

প্রতর্দন প্রাণ-উপাসক। সংযমন—বাক্ ও প্রাণ-সংযম তাঁর সাধনার বৈশিষ্ট্য। প্রতর্দনের অনুসৃত প্রাণবিদ্যাই **সাংযমন**। ইনি কাশীর রাজা ছিলেন। এই উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে আবার তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

প্রতর্দনের সাধনাটি সংক্ষেপে এই—মানুষ যখন কথা বলে তখন সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। এই তত্ত্বটুকু ভিত্তি করে ভাবনা করতে হবে, কথা বলার সময় প্রাণকে বাকে আহুতি দিচ্ছি এবং নির্বাক্ থাকাকালে বাক্‌কে আহুতি দিচ্ছি প্রাণে। তুলনীয়: শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহবতি। শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহবতি। গীতা ৪।২৬

আন্তর অগ্নিহোত্রে আহুতির ভাবটি সবসময় মনে জাগিয়ে রাখতে হবে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। কালীকে রসনা দংশন করিয়ে প্রাচীনরা বাক্‌সংযম বা বাক্‌কে প্রাণে আহুতি দেওয়ার ভাবটিই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আর শ্বাসপ্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখা থেকে এসেছে প্রাণায়াম। প্রাণের আয়মনই প্রাণায়াম। যম শব্দের অর্থ গুটিয়ে যাওয়া আবার বাইরে ছড়িয়ে পড়াও বটে। যম যখন প্রাকৃত মৃত্যু তখন সবই সংহৃত হয়ে গুটিয়ে আসছে। কিন্তু এই যম যখন বৈবস্বত বা বিজ্ঞানীর মৃত্যুতরণ তখন সবই মহাব্যাপ্তিতে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে, দিগন্তব্যাপ্ত সূর্যরশ্মির মত। বৈদিক

প্রাণায়াম এই ব্যাপ্তির পথই নির্দেশ করত। ছান্দোগ্যে সংবর্গবিদ্যাতেও প্রাণায়ামের কথা রয়েছে। সে কিন্তু লয় বা গুটিয়ে আসা।

সাতটি শ্রৌতযজ্ঞের আদিতে অগ্নিহোত্র আর শেষে সোমযাগ। এইটির নাম ছিল অগ্নিষ্টোম। অগ্নি-সোমই যাজ্ঞিকের প্রধান দেবতা।

অগ্নিহোত্রে দুটি আহুতি দিতে হত—সন্ধ্যায় এবং সকালে। তার মন্ত্র অতি সরল। সায়ংসন্ধ্যায় 'অগ্নির্জ্যোতি র্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা'। আর প্রাতঃসন্ধ্যায় 'জ্যোতিঃ সূর্যঃ সূর্যো জ্যোতিঃ স্বাহা'। কিন্তু প্রতর্দন যে-অগ্নিহোত্রের কথা বলছেন, ঘুমে জাগরণে সর্বদাই মানুষের অন্তরে তার অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে। এই-ই সত্যিকারের অগ্নিহোত্র। এভাবে বাক্ ও প্রাণের সংযমন যার অনায়াসসাধ্য তাঁকে আর বাইরের অগ্নিহোত্র করতে হয় না।

তন্ত্রে অন্তর্যাগ বা মানস যজ্ঞের কথা আছে। কিন্তু বৈদিকরাও যে কেবল বাইরের যাগযজ্ঞ নিয়ে থাকতেন না, মানসযাগের খবরও রাখতেন—কৌষীতকীর মত সুপ্রাচীন উপনিষদে এই সংযমনবিদ্যায় তার সাক্ষ্য রয়েছে।

বাক্ ও প্রাণের উপরেই এখানে জোর দেওয়া হচ্ছে। আন্তর অগ্নিহোত্রে এ-দুটি আহুতিই মুখ্য। সুতরাং বৈদিকের দৃষ্টিতে বাক্ ও প্রাণের তত্ত্ব কি তা নিয়ে সংক্ষেপে এখানে একটু আলোচনা করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না নিশ্চয়ই।

সংহিতার প্রসিদ্ধ উক্তি—'যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্' (১০। ১১৪। ৮)। বাক্ প্রাণ বা ব্রহ্মেরই বিস্ফূর্তি। ভিতরে অনির্বাণ শিখায় যে-প্রাণাগ্নি জ্বলছে বাক্ তারই প্রকাশ। এই প্রকাশকে প্রাচীনরা শ্রদ্ধাভরে বলেছেন ব্রহ্মঘোষ। মেঘের স্তনিত নিঃস্বনে ঝড়ের হুঙ্কারে বজ্র গর্জনে রুদ্রের যে রোদন তা অন্তরিক্ষচারিণী মাধ্যমিকা বাক্ বা গৌরী। এ-ও ব্রহ্মঘোষ। এই বাক্ হতেই 'গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী। অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্॥

তস্যাঃ সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ। ততঃ ক্ষরত্যক্ষরং তদ্বিশ্বমুপজীবতি॥' (ঋ ১।১৬৪।৪১-৪২)। আকাশ ব্রহ্ম, বাক্ তার শক্তি। সংহিতায় দুটিকে যথাক্রমে পরম ব্যোম ও সহস্রাক্ষরা গৌরী বলা হয়েছে। আকাশে বাক্ নিগূহিত। যখন স্ফোট বা শব্দ মধ্যমা বাক্‌কে অভিব্যক্ত করে তখনই বাক্ ও প্রাণের মিথুন দেখা দেয়। মহাশূন্যে চিন্ময়

আদিস্পন্দই একপদী বাক্ বা প্রণব, ওঙ্কার-রূপী শব্দব্রহ্ম। আর এইটি শোনাই 'শ্রুতি'।

শৈবদর্শন বলেন সৃষ্টির আদিমাবস্থা ময়ূরাণ্ডরসবৎ। ভিতরে যা রয়েছে তা একরস হলেও তার সম্ভাবনা বিচিত্রবর্ণ ময়ূর হওয়ার দিকে। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে বর্ণবৈচিত্র্য আকাশের প্রতীক। সংহিতায় সূর্যাশ্বকে ময়ূররোমা বলা হয়েছে। পুরাণে ময়ূর কার্তিকেয় বা কুমারের বাহন। কার্তিক রুদ্রপুত্র, অগ্নিশিশু। সব মিলিয়ে এ-কল্পনার মর্মার্থ হল এক ও বহুর সমন্বয় সাধন। একপদী বাক্ বা ওঙ্কার হতেই বিশ্ব প্রপঞ্চিত হচ্ছে। ময়ূরের ডাক সঙ্গীত-শাস্ত্রমতে ষড়্জধ্বনি, আদিস্বর। সপ্তস্বর তাতে নিহিত রয়েছে। প্রণবও তাই। কার্তিক তারকাসুর বধ করেন। এই তারকাসুর অনন্ত কোটি বিশ্ব বা নক্ষত্রখচিত আকাশ। তারকাসুর সংহিতায় বৃত্র। ইন্দ্র বৃত্রবধ করেন অর্থাৎ এই দৃশ্যমান বিশ্ব বা জগৎপ্রপঞ্চ মুছে দেন। তাতে ব্রহ্মবধের পাপ হয় তাঁর, পুরাণ বলছেন। উত্তার পন্থায় নেতিবাদে বিশ্বজগৎকে অস্বীকার করা অনিবার্য। কিন্তু তার পরে অবতরণের পর্বকে অস্বীকার করলে হয় মতুয়ারি। জগন্মিথ্যাত্ব সাধনজীবনের আংশিক সত্য মাত্র।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম এখানে বিশ্বাত্মক। কিন্তু বিশ্বেই নিঃশেষিত নন তিনি, তাকে ছাপিয়েও রয়েছেন। শাণ্ডিল্যবিদ্যাতেই তার সংকেত দেওয়া আছে। এ তত্ত্ব না বুঝলে বৃত্রবধে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ তাঁকে সম্যক্‌রূপে না জানায় অখণ্ডবোধ বাধিত হয়। বিশ্বাতীত আকাশাত্মাকে জেনেও যিনি অনুভব করেন এ-আকাশ নিঃশক্তিক নয় তা মহাপ্রাণে স্পন্দিত, তাঁর অনুভবই সম্যক্ জ্ঞানে পর্যবসিত।

ব্রহ্ম স্বরূপত চেতনার বিস্ফারণ। বাক্ তারই স্ফূর্তি, অতএব ব্রহ্মশক্তি। সংহিতায় আছে বাকের চারটি পদ। তার তিনটি পদ গুহাহিত। মানুষের মুখে যা উচ্চারিত হয় তা এই বাকের চতুর্থ পদ মাত্র। বাক্‌সংযমে তার নিগূহিত শক্তি সাধকের অনুভবে সত্য হয়ে ওঠে।

প্রাণকে শ্বাসবায়ু বলতে পারি। দশম মণ্ডলে ১৮৯ সূক্তে পাই 'অস্য প্রাণাদ্ অপানতী'। 'অস্য' এখানে সূর্যস্য। সূর্য হতে প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে। সর্পরাজ্ঞী (কুণ্ডলিনীশক্তি) তাকে টেনে এনে কুণ্ডলিত করছেন। কিন্তু সেই কুণ্ডলিত শক্তি অহরহ মুক্তিকামী। 'অপানো বৈ মৃত্যুঃ'—প্রাণকে সীমাবদ্ধ করতে চাইলে মৃত্যুগ্রস্ত হওয়াই নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। ব্রহ্মসূত্রে

রয়েছে 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ, অত এব প্রাণঃ।' প্রাণের অধিষ্ঠান আকাশ অর্থাৎ প্রাণ আকাশের স্পন্দ মাত্র। এদিক থেকে বাক্ ও প্রাণ তাহলে অভিন্ন। তাই প্রাচীনরা আকাশ ও প্রাণ অথবা প্রাণ ও বাক্ দুটি মিথুন বলে ধরতেন।

প্রাণই যে ব্রহ্ম তা এই উপনিষদে আমরা পেয়েছি। প্রাণন বলতে তাহলে বুঝব দেবতার প্রাণশক্তি তিনি সঞ্চারিত করছেন আমার মধ্যে। বাক্ও তাঁর শক্তি। যখন কথা বলি আমরা, ব্রহ্মশক্তি বহির্বিশ্বে বিচ্ছুরিত হয়। সংহিতায় এটি তুরীয়া বা চতুর্থী বাক্। বাকের এ-তত্ত্ব সম্যক অবগত হয়েছেন যিনি তাঁর কথা ও আমাদের কথা এক নয়। বিদ্বান্ অনুভব করবেন কথা বলার সময় তাঁর সমগ্র প্রাণশক্তি ঢেলে দিচ্ছেন সেই কথায়। তখনই বাক্ হয়ে দাঁড়ায় ব্রহ্মঘোষ। উপনিষদে আদেশ বা প্রচোদিকা বাকের কথা রয়েছে। বৈখরী বা অভিব্যক্ত বাকে শক্তি সঞ্চারিত হলেই তা অনুজ্ঞা হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্বান্ তখন সিদ্ধবাক্—তাঁর অনুজ্ঞা অমোঘ।

মীমাংসাদর্শন বলেন বেদের প্রতিটি মন্ত্রই অনুজ্ঞাবাচী—প্রচোদনাই তার লক্ষ্য। তাঁদের মতে উপনিষদ্‌গুলি অর্থবাদ। ব্রহ্ম বা তত্ত্বালোচনায় তাঁরা জোর দেননি। ইষ্টার্থের প্রচোদক বলে বেদবাণীই মন্ত্র-পদবাচ্য। দিব্য শক্তির আবেশে ঋষির হৃদয়ে বাক্ বা ব্রহ্মঘোষ স্ফুরিত হয়েছে। যিনি তা শুনবেন তিনি স্বতঃই প্রবৃত্ত হবেন বাক্ বা ওঙ্কাররূপী নাদানুসন্ধানে অথবা বিদ্যার সাধনায়। অতএব মন্ত্র যেন বাকে প্রাণ বিচ্ছুরিত হওয়া। আর প্রাণে যদি এই ব্রহ্মশক্তিরূপী বাক্‌কে আহুতি দিই তা হবে প্রশম—শান্তং শিবমদ্বৈতম্ অবস্থা।

বাক্ ও প্রাণে যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে তা নিয়ত ধরা পড়ে—তন্ত্রের এ মত কৌষীতকীর সংযমনবিদ্যা হতেই হয়তো প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। 'সোঽহং-হংসঃ-পদেনৈব জীবো জপতি সর্বদা'।

২।৬॥ এরপর শুষ্কভৃঙ্গারের উক্থবিদ্যা। এটিও প্রাণবিদ্যার অন্তর্গত। ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।২ ; ৩।৮) যে-বিদ্যার কথা বলা হয়েছে এখানে তারই উপনিষদরূপ পাই। ঐতরেয় আরণ্যকের মাঝখানে ঐতরেয় উপনিষদ্। সুতরাং উপনিষদ্ আরণ্যকের পরে এ-যুক্তি সুপ্রযুক্ত নয়। ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদে একই ভাবনা ও সাধনার অনুবৃত্তি চলেছে এটি মনে করাই সঙ্গত।

গবাময়ন নামে সংবৎসরব্যাপী একটি সোমযাগ আছে। তার উপান্ত দিনে মহাব্রত নামে একটি যাগের অনুষ্ঠান ছিল। বৈদিক যাগের মধ্যে মহাব্রতের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এর মধ্যে এমন অনেক অনুষ্ঠান ছিল যা পরবর্তীকালে তন্ত্রের নানা ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভব বলে মনে হয়। ঐতরেয় আরণ্যকের প্রথম ও শেষে মহাব্রতের রহস্যভাবনা আছে। মহাব্রতের আগে তিন দিনে তিনটি উপসদ্ যাগে তিনটি গ্রন্থি বিদারণ—আয়স রাজত ও হিরণ্য। তারপর দিবসসাধ্য মহাব্রত যাগ। শেষ দিন সোমপান। এই সোম ভাঙ্ হতেও পারে। 'গোভিঃ ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্'—এরকম উক্তি এক জায়গায় মেলে। পাঁচদিনে পূজা এবং শেষদিন বিজয়া—সেদিন সিদ্ধি বা ভাং খাওয়া, এই ছকটা আজও আমরা অনুসরণ করি।

মহাব্রতের দিন হৌত্রকর্ম ছিল। চতুর্বিংশ যাগ বলে একটি যাগ মহাব্রতের প্রকৃতি। বারটি শস্ত্র ও বারটি স্তোত্র পাঠ ও গান হত তাতে। শস্ত্রগুলি দীর্ঘাকৃতি সূক্ত। আগে স্তোত্র গান তারপর শস্ত্র পাঠ। সারাদিন ধরে এগুলি ছড়ানো। প্রাতঃসবনের পর মাধ্যন্দিন সবন হতে ইন্দ্রের উদ্দেশে তখন মরুত্বতীয় শস্ত্র পাঠ হত। ইন্দ্র মরুত্বান, মরুদ্‌গণসহযোগে যুদ্ধ জয় করেছেন। তারপর তিনি একা। মরুত্বতীয় শস্ত্রের পর তাঁকে উদ্দেশ করে নিষ্কেবল্য শস্ত্র পাঠ হয়। নিষ্কেবল্য—একক, দ্বিতীয় কেউ নেই (তু. দ্বিতীয়া কা মমাপরা-দেবীর উক্তি)। এই নিষ্কেবল্য ইন্দ্র অভিজিৎ, নক্ষত্রচক্রের বাইরে অষ্টাবিংশ নক্ষত্র। ওটি উদয়াস্তরহিত সূর্য। এই নিষ্কেবল্য শস্ত্রের একাংশ উক্‌থ।

ঐতরেয় আরণ্যকে আছে **উক্‌থই ব্রহ্ম**। মহীদাস ঐতরেয় সুন্দর করে বলেছেন একথা। তিনি বেদমন্ত্র ও ঋষিদের প্রত্যেককে উক্‌থ বলে শেষে বলছেন উক্‌থই প্রণব। তারপরই 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-আসীৎ' এই প্রসিদ্ধ উক্তি।

উক্‌থ ( < √বচ্ তু. বিদথ—বিদ্যা ) বাকের নামান্তর। বিদথ যেমন বিদ্যার সাধনা, উক্‌থ তেমনি বাকের সাধনা। বাকের সাধনা অর্থে জপ। উক্‌থ জপযজ্ঞ। ঐতরেয় আরণ্যকে যাগে যা সম্পন্ন হত এখানে তা-ই অধ্যাত্মযোগে পরিণামিত হয়েছে। ঋগ্বেদ ১০।৮২।৭-এ উক্‌থের কথা আছে [ 'নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্‌থশাসশ্চরন্তি' ॥ ]

শুকভৃঙ্গার বলছেন উক্‌থ-ই ব্রহ্ম, ঋক্ যজুঃ সাম তিনটিরই পর্যবসান উক্‌থে। প্রণবও ত্রয়ীবিদ্যার সার [ ছা. ১।১।৭ ; ২।২৩।২-৩ ]।

এরপরই উক্‌থকে শস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধনু বলা হচ্ছে।[১] এতে স্পষ্টই বোঝা যায় উক্‌থ প্রণব। [ মু. ২।২। ৪ —প্রণবো ধনুঃ ]। সুতরাং উক্‌থ বাকের সাধনা এবং এই বাক্ প্রণব। প্রাণই উক্‌থ—প্রাণ ও বাক্ যে একটি মিথুন উপনিষদে তা অনেকবারই বলা হয়েছে। ছান্দোগ্যের প্রথম অধ্যায়ে এই ইঙ্গিত দিয়ে সূত্রাকারে জপযজ্ঞের রহস্য বলে দেওয়া হয়েছে। বাক্ প্রকৃতি, প্রাণ পুরুষ —একটি মন্ত্র আরেকটি সুর—দুয়ে মিলে ওঙ্কার। এখানে তেমনি বলা হয়েছে উক্‌থই ব্রহ্ম। একদিকে তা ধনু অর্থাৎ প্রণব বা বাক্ অন্যদিকে প্রাণই উক্‌থ। এই প্রাণই ত্রয়ীবিদ্যার আত্মা। অতএব উক্‌থং ব্রহ্মেতি।

যিনি এ-তত্ত্ব জানেন তাঁরই ঋগ্‌বেদ জ্ঞান হয়েছে এবং বেদের মধ্যে যেমন ঋগ্‌বেদ শ্রেষ্ঠ, তিনিও তাই। আবার যজুঃ ও সামবেদের জ্ঞানও তাঁর অধিগত হয়। বিদ্বান্ তখন সর্বময় হয়ে নিখিল ভূতের সঙ্গে যুক্ত হন। সামবেদের বৈশিষ্ট্য যে সমন্বয় তা তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে বলে বিশ্বের ঋত-চ্ছন্দের সঙ্গে তাঁর কোথাও বিরোধ বাধে না।

সমগ্র বেদ এমনি করে যাঁর আত্মভূত হয়ে যায় তাঁর শ্রী ও যশোলাভ অবশ্যম্ভাবী। **শ্রী** ও **যশ** কে বলতে পারি জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্যোতি। সংহিতায় একে বৃহদ্দিবা বলা হয়েছে। বেদমীমাংসা ২য় খণ্ড টী. ৩৭ দ্রষ্টব্য।

২।৭॥ এবার সর্বজিৎ কৌষীতকির ত্রিসন্ধ্যা আদিত্য-উপাসনা। এর ফলে সাধকের পাপ দূর হয়, নির্মল হন তিনি।

**সর্বজিৎ**—নামও হতে পারে বিশেষণও হতে পারে। কৌষীতকি গোত্রের সর্বজিৎ নামে কোন এক ঋষি এ-উপাসনা প্রবর্তন করেন। এটি সংহিতায় বা ব্রাহ্মণে নাই।

**যজ্ঞোপবীতের** নাম আমরা সর্বপ্রথম এইখানেই পাই। যজ্ঞের জন্য যে উপবীত পরতে হবে তা-ই যজ্ঞোপবীত। এর আগে সম্ভবতঃ উপাসনা-

---

১ মনে হয় শস্ত্র শব্দটি শ্লিষ্ট—(১) পাঠ্য স্তুতিবিশেষ (২) অস্ত্র। উক্‌থ-রূপ স্তুতি শস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই উক্‌থ বলতে মহাব্রতের নিষ্কেবল্য শস্ত্র। দ্র. উপনিষৎ-প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, অনির্বাণ। উক্‌থ-রূপ ধনু অর্থাৎ প্রণব অস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—( তু. ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্ মন্ত্রই আমার আন্তর বর্ম, ভেতরের রক্ষাকবচ )। আত্মা মানে শরীর-মন-প্রাণ ইত্যাদি যুক্ত সমগ্র আধার।

কালে উত্তরীয় ধারণের বিধিই প্রচলিত ছিল। অধোবাস এবং উত্তরীয়ই সে-যুগের পরিচ্ছদ। উপবীতের রহস্যভাবনার (mystic form) মূলে তিন গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ)। ত্রিগুণিত করে ধারণ করতে হয় এটি। মনে হয়, প্রথমে এ কেবল যজ্ঞের সময়ই ব্যবহার করা হত। পরে সব সময়ের জন্য হয়ে গেল। যজ্ঞকালে ওটি ডান কাঁধ থেকে বামে ঝুলিয়ে ব্যবহার করা হত। পিতৃকার্যে পরা হত ঠিক উল্টা করে—তখন তার নাম নিবীত। উপবীত যদি সর্বদা ধারণ করা হয় তাহলেও যজ্ঞকালে যথাবিধি পরতে হবে।

**ত্রিরুদপাত্রং প্রসিচ্য** তিনবার প্রসিক্ত করে। **উদপাত্র** অর্থে জলপাত্র, কোশাকুশি। ইওরোপীয়রা প্রসিক্ত বলতে wash করা বুঝেছেন তা কিন্তু নয়। **প্র** সামনের দিকে। কুশি থেকে জল নিয়ে তিনবার সামনে ফেলতে হবে। উপাসনাকালে এইভাবে তিনবার জল দেওয়া এক ধরনের আহুতি। নিজেকে সম্পূর্ণ আহুতি দিচ্ছি জলসেক দ্বারা।

**আদিত্যমুপতিষ্ঠতে**—সূর্যের উপস্থান বলতে উপাসনার মতই দেব-পূজা বোঝায়। মৌলিক অর্থ তাঁর কাছে থাকা। তা হলে তিনটি ভাবনা পাচ্ছি। প্রথম যজ্ঞোপবীত ধারণে অগ্নি-ভাবনা, পরে তিনবার আহুতি দ্বারা বৈশ্বানর অগ্নির ভাবনা। তারপর উদীয়মান আদিত্যের উপস্থান। সূর্যোদয়কালে জপ করতে হবে।

**বর্গ, উদ্‌বর্গ, সংবর্গ**—বর্গ শব্দটি সংহিতায় আছে। √বৃজ্—মোচড় দেওয়া। মুচড়িয়ে কোন কিছুকে উলটে দিচ্ছি। √বৃজ্ ধাতুর বর্জন আবর্তন আবর্জন এই ধরণের ব্যবহার পাওয়া যায়। নুয়ে পড়া to bend double—এ অর্থও আছে। আর নোয়াতে গিয়ে ভেঙে গেল এরকম ব্যঞ্জনাও অনেক সময় মেলে। বে. মী. ২য় খণ্ড টী. ২৩৭।

এষণাত্রয়কে ছাপিয়ে উঠতে হবে। এষণাই চিত্তের আবর্জনা। তার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যিনি পারেন তিনি ধীর (কঠ. ২।১)। সেখানে ইচ্ছন্ শব্দটি আছে। পরম বস্তুকে চাইছি অথচ চিত্ত বহির্মুখ এ হয় না। হলে বলতে হবে চাওয়াতেই ফাঁকি আছে কিছু। ধীর আবৃত্ত চক্ষু হয়ে চিত্তবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দেন—এইটি আ-বর্জন, সংহিতায় উর্জ্, চেতনার মোড় ফিরিয়ে দেবার শক্তি।

শক্তির মোড় ফিরিয়ে দেন যিনি তিনি আদিত্য। আদিত্যের উপস্থান আলোর আবাহন। সব ফেলে তাঁর দিকে যেতে হবে। বিদ্বান্ তাই জপ

করবেন—তুমি বর্গ, আমার সব পাপ তুমি মুচড়িয়ে ভেঙ্গে দাও, পাপ্‌মানং মে বৃঙ্‌গ্‌ধি বা প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দাও। সন্তদের মধ্যে একটা কথা আছে উলট্‌ যা। প্রকৃতির ধারা উলটিয়ে দিতে হবে। 'অশনায়া বৈ পাপ্‌মা'—ক্ষুধাই পাপ। আবার ছান্দোগ্যে রয়েছে দ্বৈতবুদ্ধিই পাপ। অনুকূল ও প্রতিকূল বেদনা (feeling)-মূলক যে দ্বন্দবোধ তা-ই পাপ। বিশ্বব্যাপ্ত চিন্ময়প্রাণে এই দ্বন্দবোধ নাই। সে-প্রাণ অপহত-পাপ্‌মা—অজর অমৃত ব্রহ্ম। এই শুদ্ধ প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হলে আর সু-কু-র ভেদ থাকে না। চেতনার সঙ্কোচই পাপ। বুদ্ধদেব তণ্‌হাকে (তৃষ্ণা, বাসনা) পাপ বলছেন। সংহিতায় আছে অংহঃ—এও চেতনার সঙ্কোচ, পাতঞ্জলে অস্মিতা ও রাগকে ক্লেশ বলা হয়েছে। ও দুটিও পাপ। যা অশুভ, আলোর দিকে চলার যা বাধা তা-ই পাপ।

**মধ্যে সন্তম্‌**—মধ্যাহ্ন সূর্য কিছুক্ষণ যেন স্থির থাকে। ঋগ্বেদে ঋভুদের কথা আছে, সেখানে বিষুব কালের কথা উঠেছে। অয়ন চলন বা সংক্রান্তি-কালে সূর্য যেন দশ-বারো দিন একই জায়গায় থেকে যায়। একটা গতির শেষে যে ক্ষণিক বিশ্রাম তাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত। একেই অবস্থান বা 'মধ্যে সন্তম্‌' বলা হয়েছে। ওর আরেক তাৎপর্য, ওই অবস্থান হতে সূর্য আর হেলে পড়বে না স্থিরই থেকে যাবে। আদিত্যের এই ধ্রুবাস্থিতিতেই অমৃতত্ব লাভ। আর তার অবক্ষয়ে পুনরাবর্তন।

**মধ্যে সন্তমুদ্বর্গোঽসি**—মধ্যে থাকলেই তুমি উদ্বর্গ। উৎ উপসর্গটি সব সময় ঊর্ধ্ব গতি বোঝায়। আদিত্য যখন উদ্যিত হচ্ছেন, দিগন্ত হতে তাঁর গতি একটা curve বা বৃত্তচাপ সৃষ্টি করছে। মধ্যগগনে তা সরলরেখা হয়ে যায়, আর বৃত্তচাপ থাকে না। ব্যাসার্ধ ছোট হলেই তা বক্র থাকে। অনন্ত Infinite হলে রেখা ঋজু হয়ে যায় (বা একটি বিন্দুতে গিয়ে মেলে)। 'অপাম সোমম্‌…কিং নূনম্‌ অস্মান্‌ কৃণবদ্‌ অরাতিঃ কিম্‌ উ ধূর্তির্‌ অমৃত মর্ত্যস্য।' ৮।৪৮।৩। ধূর্তি বাঁকা চাল। অধ্বর অকুটিল গতি। চেতনার অবক্রতাই অধ্বর গতি, তা-ই যজ্ঞের তাৎপর্য। আদিত্য যতই ঊর্ধ্বে উঠছেন ততই চাপ বা বক্ররেখা ঋজু হয়ে যাচ্ছে। এইটি মধ্যগগনের বিন্দু। বিষ্ণু যুগপৎ ব্যাপ্তি এবং ক্রিয়াশক্তি। তাঁর মধ্যগগনে অবস্থানকালেই শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে। তিনি অনন্তব্যাপ্ত ও শক্তিসম্পন্ন। এখান থেকে আর নীচে নামবার ভয় নাই, কারণ চেতনা তখন পরা গতি লাভ করবে। সম্মুখে

আকাশানন্ত্যের বিস্তার (infinite progress)। ভিতরের সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেলে নিউটনের Law of Motion-এর ভাষায় friction যদি না হয় তো motion অনন্তকাল চালু থাকবে। উৎ উপসর্গ দ্বারা এই বোঝান হয়েছে। সংহিতায় আছে উদ্ বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্ পশ্যন্ত উত্তরম্ ১।৫০।১০—এখানে জ্যোতি উত্তর জ্যোতি উজ্জ্যোতি হতে উত্তম জ্যোতিতে যাওয়ার কথা আছে। তান্ত্রিকরা পরে একেই অনুত্তর জ্যোতির পর্যায়ে ঠেলে নিয়ে গেছেন। অনন্ত গতি যদি নিঃসীম বেগসম্পন্ন হয় তাহলে সর্বব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব। এই ব্যাপ্তিবোধ হতে পরাগতির কথা ওঠে। এইটি উদ্বর্গ।

পাপের মোড় ফিরিয়ে তার শক্তিকে বিপরীতমুখী করাই তার প্রকৃতির রূপান্তর ঘটানো। পুরাণে এই ভাবটি প্রাধান্য পেয়েছে। অসুর-নিধন করে তাকে দেবত্ব দেওয়া পুরাণে সুপ্রচলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'ষড়রিপুর মোড় ঘুরিয়ে দাও।'

এরপর সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সন্ধ্যায় আদিত্যগতি শুব্ধ হয়ে যায়। তা কিন্তু নয়। সোমযাগের ধারায় এই সত্য পরিস্ফুট হয়। মাধ্যন্দিন সবনের দেবতা ইন্দ্র। সায়ংসবনের বৈশিষ্ট্য, তার দেবতা বিশ্বদেবগণ। তখন একটি স্তোত্রপাঠ করতে হয়। সেটি ঋভুদের পাওনা। সব দেবতা তখন সায়ন্তন সূর্যের সঙ্গে এক হয়ে যান। দ্র. ঋ. ৫।৬২।১, সূর্যের দশ শত অশ্ব সহ 'তস্থুস্ তদ্ একম্'। এখানে বরুণতত্ত্বই বিবৃত হয়েছে।

আদিত্যের রশ্মি সংহৃত হওয়ায় চেতনার পরিনির্বাণ ঘটছে অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে। এই বৌদ্ধ নির্বাণ। তখন চলতে হবে অন্ধকার বা বারুণী রাত্রির গহনে। সোমযাগে এ হল অতিরাত্রের পর্ব।

'ঋতেন ঋতম্ অপিহিতং ধ্রুবং বাং সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্য্ অশ্বান্ দশ শতা ...শ্রেষ্ঠং বপুষাম্ অপশ্যম্—(ঐ)—এ সূর্যাস্তের বর্ণনা স্পষ্টই বোঝা যায়। ছান্দোগ্যে মধুবিদ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আদিত্যগতি অনুসরণের কথা। প্রতীচী মধুনাড়ীর মধু আদিত্যরা বরুণের মুখ দিয়ে পান করেন। সূর্যের রূপ তখন কৃষ্ণ। উদ্ধৃত মন্ত্রটিতে দেবতাদের পরমাশ্চর্য যে রূপের কথা বলা হয়েছে তা-ই হল এ উপনিষদের **সংবর্গ**।

ছান্দোগ্যে রৈক্ক বায়ুকে বলছেন সংবর্গ। সংবর্গ সেখানে লয়স্থান। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ ও অধিদৈবত দৃষ্টিতে বায়ুই সংবর্গ। বৃ. উপনিষদে দেখি

সূর্য অস্ত গেলে কোথায় যায় যাজ্ঞবল্ক্য জনককে সেই কথা বলেছেন। যাবতীয় সব আলোর লয়স্থান বায়ুতে বা বিশ্বপ্রাণে। এই বিশ্বপ্রাণই সংবর্গ। আমার ক্ষুদ্র প্রাণ চলে যায় কিন্তু বস্তুত তা বিশ্বপ্রাণে সংগুপ্ত থাকে। তেমনি সন্ধ্যায় সূর্যরশ্মি গুটিয়ে এলে বিশ্বদেবতাদেরও সায়ংসূর্যে অবস্থান ঘটে। তাঁরা একীভূত হয়ে থাকেন সেখানে।

যাঁরা মর্ত্য হয়েও অমৃত লাভ করেছিলেন তাঁরাই ঋভু। মর্ত্যমানব অমর্ত্য পদবীতে আরূঢ় হলেই ঋভুপদবাচ্য হন। ঋভ্ বা রভ্ ধাতুর অর্থ আঁকড়িয়ে ধরা। তাঁরা যজ্ঞের ভাগ চান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে দেবতাদের দিক থেকে অনেক বাধা অতিক্রম করে তাঁরা যজ্ঞে সোমপানের অধিকার লাভ করেছিলেন। ঋভু তাঁরাই যাঁরা ওপারে গিয়ে হারিয়ে যান না।

উক্থ (নিষ্কেবল্য) শস্ত্র দোলায় দুলে পাঠ করা হত। উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নের দোলা। আমাদের দোলযাত্রা বস্তুত হওয়া উচিত সংক্রান্তিতে। এটি যে আসলে সূর্যের দোলায়িত গতি তা দেখানোর জন্য [দেবতার] প্রেঙ্খারোহণের আগে যজমানের সোপানারোহণ দেখানো হত। প্রথম তিনটি ধাপ—ভূর্ভুবঃ স্বর্। তারপর ঋত্বিক্‌রা যজমানকে নামিয়ে আনতেন (মহাব্রতের শেষ অনুষ্ঠান) অবতরণের ধারাটি দেখাবার জন্য। এটি ঋভুদেরই বৈশিষ্ট্য। দেবতারাই ত্রিভুবন। মানুষের বিশেষ লক্ষণ দেবতা হয়েও মর্ত্যে নেমে আসা। সর্বশেষ সবনটি ঋভুদের উদ্দেশ্যে সম্পাদনের এ-ই তাৎপর্য। ঊর্ধ্বে যা পেলাম তার সবটুকু নিয়ে যখন ফিরে আসছি তখনই সংবর্গ। বিশ্বচেতনার জ্যোতির্ময় ব্যাপ্তি নিয়ে মর্ত্যে ফিরলেই সোমযাগ সার্থক। তৃতীয় সবনে তাই তুমি **সংবর্গ**। রৈক্কের সংবর্গ আর এ—একই।

পাপ্‌মানং মে সংবৃঙ্‌গ্‌ধি—আমার পাপ বা অন্ধকার আলো হয়ে যাক এবার। আদিত্যের শুক্লং ও নীলং দুটি ভাঃ-কে জানা চাই। এটি নিঃশ্রেয়সের সাধনা বলে এখানে পাপক্ষয়ের ভাবনা রয়েছে। এরপর অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সাধনা।

২।৮॥ অমাবস্যার পর চাঁদকে যখন পশ্চিমে দেখব তখনকার কথা বলা হচ্ছে এখানে। তাহলে তিথিটি শুক্লা প্রতিপদ। এরপর দিনে দিনে চাঁদ পূবে দেখা দেবেন।

**হরিত তৃণ** প্রাণের উপাসনা বলে সবুজ রঙটি নির্বাচন করা হয়েছে। অথর্ববেদে বৃক্ষদের বলা হয়েছে, ব্রহ্মের রূপে তারা 'হরিতস্রজঃ'। আর ঘাস

যেমন করে বাড়ে চাঁদ তেমনি ধীরে ধীরে বাড়ছে। হরিত তৃণ দূর্বাঙ্কুর। প্রাণের বৃদ্ধি বা অভ্যুদয় সূচিত করা হচ্ছে তা দিয়ে। বাক্ মন্ত্ররূপা বাণী। দূর্বাঙ্কুর সহ একটি মন্ত্র **প্রত্যস্যতি** নিক্ষেপ করবে চন্দ্রমার উদ্দেশে।

**যন্মে সুষমং হৃদয়মধি চন্দ্রমসি শ্রিতম্** উপাসক বলছেন, আমার সুষম হৃদয় চন্দ্রমাশ্রিত। জ্যোৎস্নাধৌত হৃদয়ই চন্দ্র ( √চদ্—আহ্লাদন )। তার ফলে তিনি অমৃতত্বের ঈশান হয়েছেন, সমুদ্রের গভীরতা ও পর্বতের অটলতা নিয়ে।

এরপর, যিনি পুত্রবান তিনি প্রার্থনা করছেন পুত্রসম্পর্কিত পাপ অর্থাৎ তার অকালমৃত্যু যেন না ঘটে তাঁর জীবনে। আর যিনি অপুত্রক তাঁর জন্য বিহিত হয়েছে ওজঃ ও আপ্যায়নী শক্তি। এখানে তিনটি ঋক্-মন্ত্রের উচ্চারণ—

(১) আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্…১।৯১।১৬

(২) সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজাঃ…১।৯১।১৮

(৩) যমাদিত্যা অংশুমাপ্যায়য়ন্তি
যমক্ষিতম্ অক্ষিতয়ঃ পিবন্তি।
তেন নো রাজা বরুণো বৃহস্পতির্
আ প্যায়য়ন্তু ভুবনস্য গোপাঃ॥ তৈ. সং ২।৪।১৪।২

অংশু আদিত্যরশ্মি। এই চন্দ্রমা আদিত্যের নীচে। ইনি সোম নন, মৃত্যুর অধিপতি। তিনটি মন্ত্র জপ করে বলা হচ্ছে, আমার প্রাণ প্রজা বা পশুদের দ্বারা তুমি আপ্যায়িত হয়ো না। আপ্যায়িত হবে শত্রুদের প্রাণ প্রজা বা পশু নিয়ে। 'দ্বিষো জহি'—এ-ভাব অবৈদিক নয়। সংহিতার বহু জায়গায় এরকম প্রার্থনা আছে।

শুক্লপক্ষে সন্ধ্যা হলেই চাঁদের আলো দেখা যায়। ক্রমে তা বেড়ে চলে আর তার দৃশ্যমান আদি বিন্দু পশ্চিমাকাশ হতে পূর্বের দিকে আবর্তিত হয়। একেই বলে **ঐন্দ্রী আবৃৎ**। ইন্দ্র পূর্বদিকের রাজা। তৈ সং ২।৪।১৪।৩।

কৃষ্ণপক্ষে সন্ধ্যা হতে অন্ধকার ক্রমে বেড়ে চলে, যেন পুবাকাশ হতে পশ্চিমাকাশে তার গতি। এই আবর্তন দৈব বা বারুণ। আদিত্যের গতি কিন্তু একরকমই থাকে।

এখানে যা বলা হচ্ছে তার অভিপ্রায় হল, আমাদের শত্রুপক্ষ চন্দ্রকে

অনুসরণ করুক। আমরা করব আদিত্যগতিকে। এখানে ইন্দ্র এবং আদিত্য একটি মিথুন। মধ্যস্থান দেবতা হয়েও ইন্দ্র যে একজন আদিত্য Keith তা লক্ষ্য করেছেন। আদিত্যের আলোক-বর্ষণ ইন্দ্রের একটি বিশেষ কাজ।

সাধক নিজে চান্দ্রী গতি বা জন্মমৃত্যুর আবর্তন মেনে নিয়েও অন্তরে অমৃতের পুত্র। চান্দ্রী ও সৌরী গতিকে এইভাবে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনে। তাই **ঐন্দ্রী আবৃৎ** ও **আদিত্য আবৃৎ**—দুটির উল্লেখ করেই দক্ষিণ-বাহু আবর্তিত করা হচ্ছে।

২।৭॥ এবার পূর্ণিমার সাধনা। পূর্বদিকের পূর্ণচন্দ্র অমৃতের দেবতা সোম। **সোম** যে **রাজা** এ-ভাবনা সংহিতায় সুপরিচিত, 'তরৎ সমুদ্রং পবমান উর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ' (৯।১০৭।১৫), 'ঋতেন য ঋতজাতো বিবাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ (৯।১০৮।৮)।

সোমের **এক মুখ ব্রাহ্মণ**। সেই মুখ দিয়ে তিনি রাজাকে আহার করেন। অর্থাৎ ক্ষাত্রবীর্য লয় হয়ে যায় প্রজ্ঞায়। অতএব তোমার প্রজ্ঞা আমার পৌরুষকে গ্রাস করুক—এই প্রার্থনা। প্রজ্ঞার অধীন হলেই বীর্য সুপ্রযুক্ত হয়।

**রাজা** সোমের **আরেক মুখ**। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও একথা আছে। সেই মুখ দিয়ে তিনি বিশ্‌কে আহার করেন। বৈশ্যশক্তি ক্ষাত্রশক্তির অধীন থাকাই সমাজব্যবস্থার অনুকূল। উপাসক বলছেন আমিও যেন এইভাবে সমাজকে শাসনে রাখতে পারি।

সোমের অন্য দুটি মুখ অধ্যাত্ম। **শ্যেন** সোমের প্রতীক, সে অমৃত আহরণ করে। মাধ্যন্দিন সূর্যকে ভেদ করে পক্ষীরাজ শ্যেনই অমৃত আনতে পারেন।

**অগ্নি** সোমের **আরেকটি মুখ**। সেই মুখে সোম সর্বলোককে আহার করেন। অগ্নি সর্বভুক্—তিনি আধারে আহিত চিদ্‌বীজ। ইন্ধন বা আধারের সবখানি আত্মসাৎ করে অগ্নিময় করে তোলাই তাঁর কাজ। এখানে সোমের দুটি মুখে অগ্নি-সোম দেবতা-দ্বন্দ্বকেও পাচ্ছি।

**পঞ্চম মুখে** সোম সর্বগ্রাসী মৃত্যু। অবক্ষয়কালে সোম মৃত্যুগ্রস্ত হয়ে সর্বজীবকেও নিয়ে চলেন মৃত্যুর গহ্বরে। সেই মুখে শত্রুদের প্রাণ প্রজা ও পশু যেন গ্রাস করেন সোম। আমরা থাকব অমৃত সোমের অধিকারে।

২।১০॥ ধর্মপত্নীর কাছে বসে আর্য গৃহপতি তাঁর বুকে **অভিমর্শন** হাত বুলিয়ে উপরোক্ত মন্ত্রটি উচ্চারণ করবেন।

গর্ভাধান দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। সন্তানের মধ্যে বিত্থার ধারাটি যেন অব্যাহত থাকে ঋষিদের এ-কামনা সবসময়ই থাকত। প্রজার অর্থ প্রকৃষ্টরূপে জাত উত্তর পুরুষ। আর বিত্থা সন্তত (সতত) রক্ষা করে বলেই সে সন্তান। প্রজা সৃষ্টি হতে হতে শেষে বিজ্ঞা উৎপন্ন হয় কুলে। বিশিষ্ট একটি জাতক বা কোনও মহামানবের জন্ম হলেই বংশলোপের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এটা আমাদের দেশে একটা সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত। মহাপুরুষদের যোনিবংশ থাকে না। অনেক সময় তাঁদের পিতৃবংশও শেষ হয়ে গেল এমন দেখা যায়।

এই অনুষ্ঠানটি নিঃশ্রেয়স্‌ সম্পর্কিত নয়, অভ্যুদয়বাচী।

**সুসীমে হৃদয়ে** শোভন সীমাযুক্ত হৃদয়ে। এটি শুনলেই মনে পড়ে 'স এতমেব সীমানং বিদার্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত (ঐ. উ. ১।৩।১২)। আবার ছান্দোগ্যে আছে—হৃদয় হতে একটি নাড়ী 'মূর্ধানমভিনিঃসৃতা'—আদিত্যরশ্মি অবলম্বনে সূর্যবিম্বে প্রবেশ করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—এই নাড়ীটির নাম হিতা, কারণ ওই পথেই আদিত্যমণ্ডলস্থ অমৃত ব্রহ্মরন্ধ্রপথে জীবহৃদয়ে 'আহিত' হয়। ঋগ্বেদে মরুদ্‌গণ বা জ্যোতির্ময় মহাপ্রাণের বাহন নিযুত। 'পূর্ণা নিযুত' একটি নাড়ী কারণ 'একয়া পূর্ণয়া নিযুতয়া' এরকম উল্লেখ থাকায় বিশেষ একটি নাড়ীর কথাই বলা হয়েছে মনে হয়। এ-ই হল হিতা নাড়ী। পরে এ-সম্পর্কে আরও আলোচনা করা যাবে। আসল কথা হল, জীবদেহে সীমা তাহলে দুটি, একদিকে হৃদয়, অন্যদিকে মূর্ধা। ভার্যার হৃদয়ে বৈদিক আর্য দেখছেন জীবচেতনার অধ্যাত্ম-সীমা আর মূর্ধায় অধিদৈবত। এই সীমার মধ্যেই দিব্যপ্রাণের যাতায়াত। আদিত্যরশ্মি হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই হৃদয়ে যে জীব তিনিই ভূমিষ্ঠ হবেন প্রজারূপে। তাই গর্ভাধান এক পবিত্র অনুষ্ঠান।

ভাগবতে আছে, বাসুদেব ভূমিষ্ঠ হলেন বসুদেব ও দেবকীর 'মনস্তঃ'। মন হতে তেজ আহরণ করে পিতামাতার হৃদয়ের যোগে সন্তানের জন্ম। মিলনকালে উভয়েই যদি যোগযুক্ত থাকেন তাহলে সন্তানও দিব্য সংস্কার নিয়ে প্রজাত হবে। এদেশে সুপ্রজননবিত্থার খুব আদর ছিল বৈদিক যুগে। সন্তানের জন্ম তাঁরা সামান্য জৈব ব্যাপার বলে মনে করতেন না। পরবর্তী-

কালে শৈব সম্প্রদায়ে এ ধারা কিছুটা ছিল বলে মনে হয়। অভিনবগুপ্ত দাবি করেছেন তিনি যোগিনী-ভূ সন্তান।

পিতার সমাহিত চিত্ত হতে মাতা সমাহিত হয়ে আদিত্যতেজ ধারণ করলেন, এখানে এই ধরনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। দ্যুৎ।। দ্যুৎ তেজোমণ্ডল বা জ্যোতিঃপিণ্ড। বিদ্বান্ তাঁর সহধর্মিণীকে বলছেন, সেই আলো তোমার সুসীম হৃদয়ে নিহিত আছে। সে-আলো জ্যোতির্ময় প্রজাপতির। তিনিই জীবের জনক ও পরিপালক। তোমার অন্তরে প্রজাপতি রয়েছেন। আমার মনে হয় আমিও তাঁকে জানি। যজুঃসংহিতায় গর্ভাধানের মন্ত্র, প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে অন্তঃ। প্রাচীনেরা মনে করতেন প্রতি জন্মই দেবজন্ম। দেবতাই প্রজাত হচ্ছেন নবজাতকরূপে।

দশ মাস মা গর্ভ পোষণ করেন দেহ ও প্রাণ দিয়ে, পিতা পোষণ করেন ভাবনা দিয়ে। ঐতরেয় উপনিষদে আছে 'সোঽস্যায়মাত্মা' পুত্র পিতার আত্মস্বরূপ। আত্মার তিনটি স্থিতির কথা পাই সেখানে, আপনাতে, পুত্রে এবং দ্যুলোকে। উজান বেয়ে যিনি পিতৃলোকে যান ( প্রৈতি ) পুত্র তাঁরই তর্পণ করে। জীবনের এক প্রবাহ বইছে পুত্র পৌত্রাদি বংশপরম্পরা আশ্রয় করে। এ হল কাল-নিত্যতা। অন্যদিকে পিতৃলোকে উন্নীত হয়ে কল্পকাল ধরে দেবযানে গতি—এ হল কালাতীত নিত্যতা (timeless eternity)। আত্মার নিত্যত্ব এই দুভাবেই সিদ্ধ হয়। তাছাড়া তিনি অজ নিত্য এবং শাশ্বত—এই অতিস্থিতি তো আছেই।

২।১১ ।। অশ্মা কথাটি ছান্দোগ্যে আছে। মুখ্য প্রাণকে সেখানে বলা হচ্ছে অশ্মা আখণ ( ১।২।৮ )—পাষাণের মত দুর্ভেদ্য। পাতালফোঁড়া শিবের মত অটল হয়ে বসে আছে প্রাণ। অশ্মা সংহিতায় পাথর, বজ্র, সূর্যপিণ্ড। পরশু ক্ষত্র প্রহরণ। পরশুর্ভব-সন্তানকে বীর্যবান হওয়ার আশীর্বাদ।

শত শরৎকাল মানুষের পূর্ণ আয়ুষ্কাল। ঈশোপনিষদে আছে 'জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ'। ব্রাহ্মণও তাঁর সন্তান সম্বন্ধে এই কামনা পোষণ করবেন। তার অকালমৃত্যু না হয়, গর্ভাধানকালেই আর্য পিতামাতা এই সংকল্প গ্রহণ করেছেন। বলা হচ্ছে তুমি হিরণ্যমস্তৃতং ভব। স্তৃ = to scatter (stir, aster—Lat) > স্তৃত যা চারিদিকে ছড়ানো থাকে। অস্তৃত তাহলে যা ছড়ানো নয়, যা সংহত। অস্তৃতম্ হিরণ্যম্—পিণ্ডবৎ হিরণ্য। অস্তৃত-র আরেক অর্থ অবিনাশ। আমরা জানি সোনার এক নাম হিরণ্য। নিঘণ্টুতে হিরণ্য কিন্তু

পৃথিবীভূত নয়, তেজভূত। হিরণ্য—প্রজ্ঞাদ্যুতি, জমাটবাঁধা আলো। সব ধাতুই আগুনে গলে যায় কিন্তু সোনা আগুনে পুড়লে আরো উজ্জ্বল হয়। এজন্য প্রাচীনেরা পার্থিব বস্তুর মধ্যে সোনাকে অপার্থিব বস্তুর উপমাস্থল মনে করতেন। এ থেকেই হিরণ্ময় পুরুষের ভাবনা এসেছিল। **তেজো বৈ পুত্রনামাসি** সুবর্ণপিণ্ডের মত প্রজ্ঞান হও তুমি। আমি জানি আমার ব্রহ্ম-তেজই পুত্ররূপে পরিণামিত হয়েছে। প্রজাপতি যেমন তাঁর প্রাণ প্রজ্ঞা ও প্রেম দিয়ে সর্বতোভাবে প্রজাকে রক্ষা করেন আমি তেমনি করে আমার তেজ দিয়ে ঔরসজাত পুত্রকে আগলে রাখব, বেড়ে রাখব **পরিগৃহ্লামি**। ফলে তার অরিষ্ট খণ্ডন হবে, কোন বিপদ থাকবে না। এই বলে পিতা পুত্রের দক্ষিণ কর্ণে একটি মন্ত্র জপ করবেন। **দক্ষিণ কর্ণ** পবিত্রতর। মন্ত্রটি এই—'হে ইন্দ্র হে ঋজীষিন্ অস্মিন্ প্রযন্ধি'—একে তুমি দাও। দাও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রবীর্য বা ওজঃ।

ইন্দ্রিয়গুলির মূলে রয়েছে দেবতার ওজস্বিতা। ইন্দ্রকে সংহিতার বহু জায়গায় মঘবন্ বলা হয়েছে। **মঘবন্** বলতে শক্তি ব্যাপ্তি এবং জ্যোতি এই তিনেরই ব্যঞ্জনা আছে। মূল ধাতুটি √মহ্। তা হতে মহৎ মহিমা এবং মহঃ সব পদই সিদ্ধ হয়। কারণ ধাতুটির অর্থ আলো দেওয়া, ছড়িয়ে পড়া, সমর্থ হওয়া। তৈত্তিরীয় উপনিষদে মহঃ চতুর্থব্যাহৃতিরূপী আদিত্য (১।৫)। কঠ্‌তে মহৎ শব্দ বিজ্ঞানের সমার্থক। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মহৎ এবং বৃহৎ বিশেষণ দুটি পাশাপাশি। সংহিতায় 'স্বর্ বৃহৎ ঋতং মহৎ' বহু ব্যবহৃত শব্দ। ইওরোপীয়রা মঘবন্ বলতে সব জায়গায় bountiful বা রসদ্দার অর্থই বুঝেছেন।

ইন্দ্র শুধু মঘবন্ নন তিনি **ঋজীষিন্**। সোম ছেঁচার পর যে আঁশ পড়ে থাকে, সেই ছোবড়া বা সোমাংশুগুলিই ঋজীষ। ইষ্ বা ঈষ্ ধাতুর অর্থ একই। মূলে আছে এষণা বা শরবৎ-তন্ময়তার ব্যঞ্জনা। তা থেকে কিছু ফুঁড়ে সোজা চলার ভাবটি এসেছে। হলীষা বা লাঙ্গলীষা—হল বা লাঙ্গলের ফাল সোজা চলে। তেমনি মনীষী। যাঁর মন একাগ্রভাবনায় তত্ত্বাবধারণ করে তিনি মনীষী। আর ঋজীষ আছে যাঁর তিনি ঋজীষী। ঋজু+ইষ্—চিত্তের একাগ্র এষণা। সব বাধা-বন্ধ ভেদ করে চলে বলেই বজ্রধর ইন্দ্র ঋজীষিন্। 'যাভ্য ইন্দ্র অরদদ্ গাতুম্ ঊর্মিম্'—বজ্রবাহু ইন্দ্র পাথর কাটিয়ে অবরুদ্ধ প্রাণস্রোতের পথ খুলে দেন। ঋজীষী বৈদিক উপমা। উপনিষদে

এটিই গ্রন্থি বিকিরণ। তন্ত্রে এ থেকে গ্রন্থিভেদের বর্ণনা এসেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় ওগুলি Knots। Neurosis ইত্যাদিতে Complex-গুলি বিশ্লেষণ করে মনোবিজ্ঞানীরা মনের গ্রন্থি বিমোচনের কথা বলে থাকেন। ইন্দ্র তাঁর ওজঃশক্তিতে বা বজ্রতেজে রুদ্ধ পথ খুলে দিলেই সে-পথে আলোর স্রোত বইতে থাকে। তন্ত্রে বজ্রাণী নাড়ীর উল্লেখ আছে। ব্রহ্মনাড়ী রুদ্ধ হয়ে আছে। ইন্দ্রবীর্য মূলাধারে অবরুদ্ধ আনন্দচেতনাকে ( অন্ধঃ সোম ) জাগিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বগামী করেন। তাঁর বজ্রশক্তি যে-পথ রচনা করে তা-ই বজ্রাণী নাড়ী। কুণ্ডলিনী চৈতন্য প্রসঙ্গে হঠযোগীরা যোনিমুদ্রার কথা বলেছেন। ওইটি বৈদিক উপমায় পাথর দিয়ে ছেঁচে সোমরস নিষ্কাশন। নাড়ীগুলি তখন সূর্যরশ্মিময় হয়ে যাবে। বজ্রশক্তির এই বাধা বিদারণের সঙ্কেত মহাভারতের উতঙ্ক-উপাখ্যানেও আছে।

ঋজীষীর এই এক ব্যাখ্যা হতে পারে। আবার ঋজীষ যদি সোমাংশু ধরি তাহলে সেদিক থেকেও একটা ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। সোম দ্বিমুখী— দ্যুক্ষ সোম দ্যুলোক হতে আধারে নির্ঝরিত হয়। আর অন্ধঃ সোম নিম্নমুখী ধারা, পুরাণের ভোগবতী। পাতালেই তার স্থিতি। কিন্তু সূর্যাংশু কেবল ঊর্ধ্ব হতেই নির্ঝরিত হয়। দ্যুক্ষ সোমাংশু আর সূর্যাংশু দুই-ই ঋজু। মর্ত্য আধারে যে-সোম বন্দী আছেন তাকেও ঋজু গতিতে উজিয়ে নিতে হবে। তবেই অংশু বা এই দেহ জ্যোতির্ময় হবে। লতা সোম এ-দেহের আনন্দ-চেতনার প্রতীক হলে দেহটিই সোমলতা। যোনিমুদ্রাযোগে ধারা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার পর এই দেহ-ই সোমের আঁশ। ইন্দ্র সহায় হয়ে ধারা ঊর্ধ্বস্রোতা করে দেন যদি, তারপর দ্যুক্ষ সোমের ক্ষরণে এই দেহই হবে সোমাংশবঃ বা জ্যোতিষ্মতী লতা। ইন্দ্রবীর্য এ-সাধনার সহায় বলেই ইন্দ্র 'ঋজীষী'।

তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, তুমি আমার সন্তানকে দ্রবিণ দাও। সংহিতায় অগ্নি দ্রবিণোদা। দ্রবিণ এক কথায় অগ্নিস্রোত। এখানে এক ইন্দ্রকে উদ্দেশ করে অগ্নি-সূর্য-সোম তিনটি মুখ্য বৈদিক দেবতাকেই পাচ্ছি। পিতার শুভ সঙ্কল্পে ছেলে হন বেদমূর্তি।

**মা ছেত্‌থাঃ**—তুমি যেন ছিন্ন (√ ছিদ্‌ ) কোরো না। উপনিষদে অনুশাসন আছে—'প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ'। প্রজাতন্তু যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে। এখানে সেই ব্যঞ্জনা। **মা ব্যথিষ্ঠাঃ**—তুমি ব্যথিত হয়ো না।

ব্যথা শব্দের প্রাচীন অর্থ বিচলিত হওয়া। ( বিথুর—চঞ্চল, অবিথুর—নিশ্চল। ) গীতায় পাই গতব্যথ হওয়া স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। এইসব বলে পিতা সন্তানের শিরোঘ্রাণ করবেন। এখানে শব্দটি আছে মূর্ধা। মূর্ধা আঘ্রাণ করে পিতা যেন তাঁর প্রাণশক্তি 'সীমানং বিদার্য' ব্রহ্মরন্ধ্র পথে সন্তানের অন্তর্হৃদয়ে সঞ্চারিত করলেন, তারপর তিনবার হিংকার উচ্চারণ করবেন তিনি।

বলা হচ্ছে, আমি গোসকলের উচ্চারিত হিংকার সহায়ে তোমায় হিংকৃত করলাম। সামাশ্রয়ী ওঁকারই হিংকার, সপ্ত স্বরের মধ্যে দ্বিতীয় ঋষভ বৃষের ধ্বনি। সংহিতায় বাকের হাম্বারবের কথা আছে। কিন্তু হিংকার বৃষের গর্জন হওয়াই সমীচীন। [ পুরাণে শিবকে বৃষবাহন করা হয়েছে। শিব আকাশবৎ আর বৃষ আদিত্য। ] সোমযাগে যে সামগান হয় হিংকার তারই অঙ্গ। এককথায় বলা যেতে পারে ওঙ্কার সুরে উচ্চারণ করাই হিংকার। সামের সার উদ্‌গীথ। উদ্‌গীথের সার প্রণব। হিংকার উদ্‌গীথ ও নিধন—এই তিনটিই সামের প্রধান অবয়ব। বৃষ যদি সূর্য বা আদিত্য হন তবে তাঁর ধ্বনি বা হিংকার আসলে ওঙ্কার। 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' ( পতঞ্জলি )। ছেলের মাথায় তিনবার ওঙ্কার ফুঁকে দেওয়া হল—সোজা কথাটা এ-ই।

২।১২॥ এটিও একটি প্রাণবিদ্যার উপদেশ। প্রাণের নাম দেওয়া হয়েছে দৈবঃ পরিমরঃ যার মধ্যে সমস্ত দেবশক্তির পর্যবসান ঘটেছে। এর মধ্যে প্রযত্নশৈথিল্যের একটি ভাব আছে। চারিদিকে সব যেন ধীরে ধীরে লয় হয়ে গেল, কেবল আমি স্থির আছি। আমার প্রাণ অশ্মা আখণঃ। এ যেন শিবের ভাব। সাধনার দিক দিয়ে ব্যাপারটিকে বলা যেতে পারে মৃত্যু অবলম্বনে ধ্যান। কিভাবে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি সেদিকে সতর্ক লক্ষ্য রেখে নিদ্রাতেও যদি সচেতন থাকা যায় তাহলে দৈব পরিমর বিদ্যা সহজে আয়ত্ত হতে পারে।

এ বিদ্যার দুটি ধারা—একটি অধিদৈবত, অন্যটি অধ্যাত্ম। অধিদৈবত দৃষ্টি হল ব্রহ্মই জ্বলে উঠছেন অগ্নিরূপে। কোন আগুন বস্তুত ক্ষুদ্র নয়, সে বৃহৎ। মুহূর্তে সে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে চারিদিকে। তাছাড়া বিশ্বের সর্বত্র চেতন প্রাণীদেহে এবং অচেতন জড়ে অগ্নি-তত্ত্ব রয়েছে। তার আলো ও তাপ প্রজ্ঞা এবং প্রাণের প্রতীক। অগ্নিশিখা কখনও নিম্নমুখী হয় না,

সর্বদাই উর্ধ্বমুখ। পার্থিব অগ্নির এইসব বৈশিষ্ট্যই বৈদিকদের অগ্নিকে ব্রহ্ম-স্বরূপ বলে গ্রহণ করতে প্রেরণা দিয়েছে। আবার পার্থিব অগ্নির নিভে যাওয়াটিও লক্ষ্য করার মত। তখনও অগ্নি ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত। তার ছাই থাকে পৃথিবীতে, তাপ বায়ুতে আর প্রজ্ঞা বা আলোক যায় আদিত্যে। ব্রহ্ম তখন সূর্য হয়ে জ্বলে ওঠেন বলা যায়। সূর্য নিভে গেলে সেই তেজ চন্দ্রে যায়, চন্দ্রের তেজ বিদ্যুতে এবং বিদ্যুতের তেজ যায় দিক্‌সমূহে বা শূন্যে। কিন্তু প্রতিবারই ওই তেজের প্রাণ বা সত্তা থেকে যায় বায়ুতে। ওই বায়ু হতেই তারা আবার প্রকাশিত হয়। বায়ুরূপী প্রাণই তাহলে সর্বাধার।

এটি নিবৃত্তি বা প্রলয়ের সাধনা। অধ্যাত্ম-বিবৃতিতেও আমরা এ-ই দেখব। এখানকার অধিদৈবত বিবৃতির সঙ্গে 'ন তত্র সূর্যো ভাতি' ( কঠ ২।২।১৫ ) মন্ত্রটি তুলনীয়। সূর্য অস্ত গেলে শুক্লপক্ষে চাঁদ এবং কৃষ্ণপক্ষে তারার আলো থাকে। কিন্তু যদি মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষ হয় তখন তারাও থাকে না, থাকে কেবল মেঘের বিদ্যুৎ। এ-বিদ্যুৎ প্রাণচেতনার প্রতীক। ছান্দোগ্যে উপকোসলকে অগ্নিরা যে বিদ্যুতের কথা বলেছেন তা কিন্তু বিজ্ঞানচেতনা। অথর্ব সংহিতায় এই বিদ্যুতের কথায় ভৃগ্বঙ্গিরা বলছেন 'বিদ্ম তে ধাম'·· ইত্যাদি। কেনোপনিষদে ব্রহ্মকে 'বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ···'। কিন্তু এখানে যে-বিদ্যুতের কথা তা হল 'স্বর'-সংহিতার সাধ্যদেবগণ। এই দেবতারা বিদ্যুতের মতই চকিতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যান।

২।১৩ ॥ অধ্যাত্ম-বিবৃতিতে বলা হচ্ছে অগ্নিই অভিব্যক্ত হন বাক্‌রূপে। সংহিতায় পুরুষসূক্তে এই সম্বন্ধটির সূচনা আছে—সেখানে বিরাটের মুখ হতে অগ্নির আবির্ভাব। সেই অগ্নি নির্বাপিত হলে বাক্ প্রবেশ করে চক্ষুতে। চক্ষু শ্রোত্রে, শ্রোত্র মনে এবং মন প্রাণে। বিশ্বের লয় হয় প্রাণে। সুতরাং প্রাণ সর্বাধার ও সর্বযোনি ব্রহ্ম।

গীতায় 'অভিতো ব্রহ্মনির্বাণে'র কথা আছে। এখানে যেন সেই অবস্থার কথাই বলা হচ্ছে। সে অবস্থায় কী থাকে? এটি ঋগ্বেদীয় উপনিষদ্ বলে ইন্দ্র বা অন্তরিক্ষলোকের প্রাণও মুখ্য তত্ত্ব। নির্বাণেও প্রাণ থাকে। বুদ্ধের নির্বাণের অনুভবও কি এই দেহেই হয়নি? শুদ্ধ প্রাণ নির্দ্বন্দ্ব, সে-প্রাণ দিব্য। এই দিব্য প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা অর্থাৎ প্রাণ ও প্রজ্ঞা একই তত্ত্বের এ-পিঠ ও-পিঠ মাত্র। আর প্রাণ থাকলেই বাক্ চক্ষু শ্রোত্র এবং মনের সার্থকতা। লক্ষণীয়, ছান্দোগ্যের পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষকেই আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি।

শুদ্ধ প্রাণের অনুভবই **দৈব পরিমর**। ধ্যানে বা মৃত্যুকালে এ অনুভব আসতে পারে। সাধারণভাবে দেখি মৃত্যুকালে মানুষের প্রথমেই বাক্‌রোধ হয়ে যায়। তখনও সে চোখে দেখতে পায়। তারপর চোখে আর দেখে না, কানে শোনে। শ্রবণেন্দ্রিয় চলে যাওয়ার পরও মনের ক্রিয়া থাকে। তা-ও যখন লোপ পায়, তখন প্রাণাগ্নিরা দেহপুরে থাকেন ( প্রশ্ন-উপ. )। দেহপাত হলে আমরা বলি পরলোকগত দেহী 'আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' হয়ে আছেন। এই বায়ুই প্রাণরূপী, সে কথা আগে বলা হয়েছে। মৃত্যু যদি যোগীর হয়, তাহলে বাকের তেজ চক্ষুতে এবং চক্ষুর তেজ শ্রোত্রে যাওয়ার পর তিনি অনাহতনাদে চিত্ত সমাহিত করেন। ইন্দ্রিয়াতীত মনকে অবলম্বন করে তিনি ধ্যানস্থ হন, এইটি **মনসা ধ্যায়তি**। তারপর আর ধ্যানও থাকে না। সমস্ত দেবতা প্রাণে প্রবেশ করেন বলে যোগী সবই দেবময় বা জ্যোতির্ময় দর্শন করেন। **এতৎ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে**। তারও ওপারে জ্যোতির্ময় অব্যক্ত। এ অবস্থা ধ্যানাতীত। যোগী তখন ব্রহ্মে সমাহিত। তাঁতেই জেগে থাকা আর তাঁতে ঘুমিয়ে পড়াই যোগীর সমাধি। সেই অবস্থাতে সবই প্রাণে প্রবেশ করে। মুণ্ডকোপনিষদে প্রাণ ব্রহ্মকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে—

দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। ২।২।৭

দৈনন্দিন জীবনের নিদ্রায় জাগরণে এবং সাধনজীবনে সমাধি ও ব্যুত্থানে এই দৈব পরিমর তত্ত্ব যাঁর আয়ত্ত হয়েছে, দুটি পর্বতও তাঁকে পিষে ফেলতে পারে না। কিন্তু তিনি এমন শক্তি ধরেন যে গিরিপর্বতকেও অনায়াসে উৎক্ষিপ্ত করতে পারেন। তাঁদের দ্বেষ করলে ধ্বংস অনিবার্য।

২।১৪॥ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ( ৬।১ ), ছান্দোগ্যে ( ৫।১ ) এবং প্রশ্নোপনিষদে ( ২।৩ ) এই তত্ত্বই ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বিবৃত হয়েছে। ইন্দ্রিয়দের মধ্যে কে বড়—এই প্রশ্নই সেইসব জায়গায় তোলা হয়েছে।

Keith-এর 'অপ্রাণৎ' পাঠ গ্রহণীয় নয়। কারণ প্রকরণের সঙ্গে তা খাপ খায় না। প্রাণ না থাকলে সবই ব্যর্থ। কিন্তু কোন ইন্দ্রিয় না থাকলেও প্রাণ থাকে। এখানে প্রথমে রয়েছে উর্ধ্বে ওঠার কথা **উচ্চক্রমুঃ**। উৎক্রান্তি একটা পারিভাষিক শব্দ, চেতনার উত্তরায়ণ বোঝায়। কিন্তু সবাই উৎক্রান্ত হলে কি পড়ে থাকবে তা ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় উৎক্রান্তি বলতে

যা বোঝায় এখানে ঠিক তা বলা হয়নি। উৎক্রান্তির কথা পরে বলা হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্রে মূর্ছিতের অর্ধসম্পত্তি বা সমাপত্তির কথা আছে। ছান্দোগ্যে উদ্দালক বলছেন সৎসম্পত্তির কথা ( সতি সম্পদ্যতে )। সর্ব জীব অনন্তকালে শুদ্ধ সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যায়—ব্রহ্মভূত হয়। উপমা দিয়ে বোঝাতে গিয়ে তিনি সুষুপ্তি ও মৃত্যুর কথা বলছেন। সৎসম্পত্তি ওই সুষুপ্তি ও মৃত্যুর অনুকার। ব্রহ্মসূত্রে প্রশ্ন উঠেছে মূর্ছাবস্থায় তাহলে জীবের কি হয়? নিদ্রা বা মৃত্যু জীবের স্বভাবধর্মে হয়। পাতঞ্জলেও স্বপ্ন ও নিদ্রা অবলম্বনের কথা আছে। কিন্তু মূর্ছা ঠিক তা নয়। তাহলে বলা যায় মূর্ছা যেন জাগ্রত ও সুষুপ্তির মাঝামাঝি একটা অবস্থা। সুষুপ্তি বা নিদ্রায় যেভাবে সর্ববৃত্তি তাতে লয় হয়, মূর্ছায় পুরোপুরি তেমনটি হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিয়ে বলতেন, 'ছোট ছেলে সারাদিন খেলা করে। সন্ধ্যা হয়ে এলে বলে মা যাব।' সুষুপ্তি বা নিদ্রায় নিজের অজ্ঞাতে তেমনি করে মাতৃক্রোড়ে ফিরে যাই আমরা। সমাধিতে যাই সজ্ঞানে। আর মূর্ছায় যেন 'অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে অর্ধ অঙ্গ থাকে স্থলে'। ব্রহ্মসূত্রমতে তাই মূর্ছিতের অর্ধ-সম্পত্তি।

এখানে যে-বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা যদি মূর্ছাবস্থা ধরা হয় তো একে সৃষ্টির প্রাক্কালীন অবস্থা বলা যেতে পারে। যোগবাশিষ্ঠে ভুষুণ্ডী কাকের কথা আছে। সে দেখছে কতবার রাম এলেন, কত-বারই না রাম-রাবণের যুদ্ধ হল। এই দৃষ্টিতে সৃষ্টি নতুন কিছু নয়, যেন একটা পর্দা উঠে গেল চোখের সামনে থেকে। কিংবা মূর্ছা ভেঙ্গে কেউ যেন চোখ মেলে উঠে বসল। পুরাণে রয়েছে সত্যব্রত মনু বসে আছেন কৃতমালা নদীর তীরে। যা হওয়ার তা হয়েই রয়েছে, প্রবাহের মত বয়ে চলেছে নিত্যকাল। একটি বীজে বা ডিমে যেমন পুরা গাছটি বা পাখীটি রয়েছে, সৃষ্টিও অমনি।

ইন্দ্রিয়গুলি যে যার কর্ম করে চলেছে, শ্রেষ্ঠতা নিয়ে দ্বন্দ্ব কিসের? তবে কিনা, 'বাঁচে তরুরাও মৃগ-পক্ষীরাও। কিন্তু মননের দ্বারা যে বাঁচে সেই বাঁচে বাঁচার মত'—এমনি একটা কথা আছে। তেমনি মুখ্য প্রাণই শ্রেষ্ঠ এইজন্য যে, তা চিন্ময় অতএব দিব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই তত্ত্বটি সুন্দর বোঝানো হয়েছে। এই প্রাণ অশ্মা আখণঃ কারণ তিনি 'অপহতপাপ্‌মা'। দ্বন্দ্ববোধই পাপ, মুখ্যপ্রাণে তা নাই।

এখানে মূর্ছাবস্থার কথা ধরা হচ্ছে এই যদি হয় তাহলে ব্যাখ্যা এই রকম

হবে—মূর্ছাবস্থায় ইন্দ্রিয়বৃত্তির সামান্য স্ফুরণ হয়, অপারেশনকালে যেমন দেখা যায়। মূর্ছাপন্ন হলেও প্রাণ আছে, দারুভূত হলেও প্রাণ রয়েছে। প্রাণ না থাকলে ইন্দ্রিয়বৃত্তির কাজ হয় না। আর হলেও তা নিরর্থক। সে-অবস্থা কেমন তা বোঝানোর জন্যই বলা হচ্ছে শিশ্যে শুয়ে পড়ে আছে। উত্থানই প্রাণের বিশেষ ক্রিয়া। চেতনার উৎকর্ষ ঘটে যাতে তা-ই প্রাণের নিজস্ব বৃত্তি। উপনিষদে পাই 'উত্তিষ্ঠত'। প্রাণ এলেই উঠে বসে প্রাণী, আসে আয়ু। √ই ধাতুর অর্থ চলা। সংহিতায় আয়ুরগ্নিঃ—আধুনিক ভাষায় life activity। তা থেকে পরে জীবৎকালের পরিমাণও আয়ু হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন তো এগিয়ে চলার জন্য, কর্ম করার জন্যই। সংহিতায় আয়ু একজন ঋষির নাম। তিনি অগ্নিসাযুজ্য লাভ করেছিলেন।

আদান হল প্রাপ্তি। নিঃশ্রেয়স পরম শ্রেয়ঃ। শুদ্ধ প্রাণকে লাভ করাই নিঃশ্রেয়স লাভ বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি। 'আমি বড়' এটি জীবের মূল অভিমান। ব্রহ্ম জেনেছিলেন অহং ব্রহ্মাস্মি। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্যেষ্ঠত্বের অভিমান জীবে সঞ্চারিত হয়েছে। অহং-শ্রেয়ঃ-বুদ্ধি আমাদের মর্মে মর্মে। কিন্তু পরীক্ষায় যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় তাকে ধরলেই নিঃশ্রেয়স।

ইন্দ্রিয়রা দেহ ছেড়ে উপরে উঠল যেন। দেহটি দারুভূত—একখণ্ড কাঠের মত পড়ে রইল। চেতনার ক্রমবিকাশ বোঝাতে ভাগবতে এই দারুর উপমাটি নেওয়া হয়েছে—পার্থিবাদ্ দারুণো ধূমঃ, ধূমাদ্ বহ্নিঃ ইত্যাদি। ঐতরেয় উপনিষদে চেতনার ক্রমবিকাশের একটি ছক দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা যখন মানবদেহ পায় তখনই তাদের সম্যক্ স্ফূর্তি (তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি)। মানুষের বিজ্ঞান আছে, আছে ভবিষ্যৎ দর্শনের উপযোগী স্বপ্ন ও কল্পনার শক্তি। সমনস্ক হয়ে সে যখন বিজ্ঞানভূমিকে জানে তখনই তার মধ্যে প্রজ্ঞান দেখা দেয়। সংহিতায় প্র—√জ্ঞা ধাতুর বহুল প্রচলন। প্রজ্ঞান মানে জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত হওয়া, 'অর্থের চেতনা'। ক্রমে লক্ষ্য কি তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি মন্ত্রে আছে 'পর্বতের এক সানু হতে আরেক সানুতে আরোহণ করছেন ইন্দ্র আর দেখছেন কত করবার আছে আমার। এ-ক্ষমতা কেবলমাত্র মানুষেরই আছে, —এটি শুদ্ধ প্রাণের ক্ষমতা।

ঐতরেয় উপনিষদের মত এখানেও চেতনা-উন্মেষের প্রথম সূচনারূপে আদিতে বাকের নাম করা হয়েছে। জৈন দর্শনে একেন্দ্রিয় দুটি-বা-তিনটি-

ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবের কথা আছে। তাঁরা অবশ্য বাক্ দিয়ে ইন্দ্রিয়োন্মেষের কথা বলেননি। সৃষ্টিক্রমে কিভাবে ইন্দ্রিয়াভিব্যক্তি হয় সেইটি দেখাতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে বাক্ আসে অনেক পরে। এখানে দেখানো হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হলেও শুদ্ধ প্রাণকে না ধরা পর্যন্ত জীবন নিরর্থক। সে-জীবন কবির ভাষায় 'বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ', 'পরশ করিলে জাগেনা সে /আর'। শুদ্ধ প্রাণের অনুভব জাগলে তবেই সে সমুত্থিত হয়। এই-ই আয়ু, অভীপ্সার উদ্যত শিখা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্র রোহিতকে উত্থিত হতে বলেছিলেন—ও-ই হল সত্য। এই সত্য লাভ হলে 'চরৈব' মন্ত্রে জীবন প্রণোদিত হয়। শুদ্ধ প্রাণকেই প্রজ্ঞাত্মা বলা যায়।

প্রাণের অব্যাকৃত অবস্থাও আছে—যেমন ঘ্রাণশক্তিকেও প্রাণ বলা হয়। বৈদিক দেববাদে প্রাণের চারটি রূপ :—(১) বাত—শ্বাসপ্রশ্বাস, অধিভূত দৃষ্টিতে বিশ্বে যে বায়ু প্রবহমান। সৃষ্টির ধারা যখন বইল তখন 'বাতস্য… সরীমণি'। পরমপুরুষ অবাত ( = বায়ুশূন্য ) স্থানে যখন শ্বাস ফেললেন তখনই মহাপ্রাণ স্পন্দিত হল, 'আনীদ্ অবাতম্ স্বধয়া তদ্ একম্।'

(২) বায়ু—ইনি দেবতা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে তাঁকে অধিদৈবত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলা হয়েছে। পুরুষসূক্তে আছে বিরাটের প্রাণ হতে তাঁর উদ্ভব। অধ্যাত্মবিচারে তাঁকে নাড়ীসঞ্চারী প্রাণ বলতে পারি।

(৩) মরুদ্গণ—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এঁরা জ্যোতির্ময় শুদ্ধ প্রাণ। নাড়ীতে অগ্নি-সোমের স্রোতস্বরূপ মরুদ্গণ বিশ্বপ্রাণের চেতনা উদ্দীপিত করেন। এঁরা তাই গণদেবতা।

(৪) মাতরিশ্বা—মহাপ্রাণ < √ শ্বৃ—ফেঁপে ওঠা। মায়ের বুকে যা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তা-ই মাতরিশ্বা—সৃষ্টির প্রথম উন্মেষ। এই মা অদিতি। তাঁর প্রাণোচ্ছ্বাস বা ব্রহ্মক্ষোভ একই কথা। মাতরিশ্বাকেই প্রজ্ঞাত্মা বলা যায়। তখন প্রাণ ও প্রজ্ঞা এক। মাতরিশ্বাকে জানলেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

সংভূয় Keith ধরছেন প্রবেশ করা, Cowell বলছেন অনড়। কিন্তু প্রকৃত অর্থ এর কোনটাই নয়। গীতায় দেবতা ও মানুষের অন্যোন্যসম্ভাবনের কথা আছে ( পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ ৩।১০ )। এখানে সংভূয় অর্থ প্রাণকে সম্ভাবিত করে, তাকে আপ্যায়ন বা সমাদর করে মান দেওয়া। [ ঈশা

যেমন বলেছিলেন সিজারকে তার প্রাপ্য দাও] ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা প্রাণকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিলেন।

প্রতি ইন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞাই তার দেবতা। যখন প্রাণকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ বলে জানলেন, তখন সকলে তাঁর সমুত্থানবৃত্তির অনুগামী হলেন। এ ভাবটি বোঝাতেই বলা হচ্ছে দেবতারা ইন্দ্রিয়দের নিয়ে উর্ধ্বগামী হলেন। প্রাণ ও প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে একাত্ম বলে ইন্দ্রিয়গুলিও প্রজ্ঞাবিষ্ট। সেই চৈতন্যময় ইন্দ্রিয়গ্রাম উর্ধ্বাভিসারী হল।

এবার সংসম্পত্তি। **অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য অমৃতং ভবতি।** মৃত্যুর পর বাক্ প্রভৃতি প্রাণবৃত্তি বায়ুতে প্রবেশ করে আকাশ হয়ে যায়। এবং এমনি করে স্বর্লোকে উৎক্রান্ত হয়। বলাবাহুল্য এ-মৃত্যু বিদ্বানের। তাঁর ইন্দ্রিয়বর্গ চিন্ময় সুতরাং তাদের বায়ুপ্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক। এই বায়ু মরুদ্‌গণ। সংহিতায় বায়ু ও মরুদ্‌গণ উভয়েই নিয়ুতবান্। √যু এক করা, আলাদা করা to unite, to separate পোরা to encase. যোনি শব্দ ওই ধাতুনিষ্পন্ন—গর্ভ গ্রহণ ও মোচন দুই-ই করে। শক্তিপ্রবাহ বইয়ে দেওয়া অর্থেও যু ধাতুর প্রয়োগ আছে। তা থেকে নি-যুত্—নল, যার মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট গতিতে একটা স্রোত বইতে পারে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই নিযুত্—নাড়ী। সাধারণত বহুবচন ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার হয়। এতে 'নাড়ীতন্ত্র' অর্থটিই প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। সংহিতার পূর্ণা নিযুত অবশ্য হিতা বা তন্ত্রে সুষুম্ণা।

ইন্দ্রিয়গুলি **বায়ুপ্রতিষ্ঠ।** শ্রাদ্ধের মন্ত্রে প্রেতকে বলা হয় 'বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ'। কিন্তু সৃষ্টিসামর্থ্য থেকেই যায় তার মধ্যে। সেইটিরই জন্ম হয়। বায়ু প্রাণ, আকাশ প্রজ্ঞা। ব্রহ্মসূত্রে 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ অত এব প্রাণঃ'। বায়ু বা প্রাণকে মহাপ্রকৃতি বলা যায়। আকাশ পুরুষ। শাণ্ডিল্যবিদ্যায় ব্রহ্ম আকাশাত্মা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আকাশ-শরীর। উৎক্রান্তির ফলে ইন্দ্রিয়রাও আকাশাত্মা হলেন। তখন তারা স্বরীয়ুঃ—তিনটি লোক অতিক্রম করে অন্তে উত্তীর্ণ হলেন স্বর্লোকে।

পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যৌ। এখানে আকাশ দ্যৌ। চতুর্থ বা তুরীয় লোক স্বর্—যা বিষ্ণুর পরম পদ। সংহিতায় কোন কোন জায়গায় তিনটি দ্যুলোকের কথা পাই দিব্ স্বর্ আর নাক, বিশোক বা অশোক। এর মধ্যে মহাব্যাহৃতিতে আমরা ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্কে পাই। দ্যুলোকে এলেও আবর্তন সম্ভব। কিন্তু স্বর্লোক আবর্তনের উর্ধ্বে। সংহিতায় এটি সকৃদ্দিবা, everlasting

day, সক্লদ্বিদ্যুৎ—নিত্য আলোকের রাজ্য। ব্যাহৃতিতে স্বর্ এবং দ্যৌ এক। বেদে কিন্তু এই সাবর্ণ্য নাই। স্বর্ সেখানে সর্বদাই দ্যুলোকের উর্ধ্বে। যোগীর মৃত্যু ওই নিত্য-জ্যোতিতে অবগাহন। আর এজন্য তাঁর মৃত্যু সকলকেই আলো করে তোলে, নিত্যজ্যোতির আভাস এনে দেয়। আধুনিক যুগে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে নিবেদিতা ও শশী মহারাজ এক জ্যোতির্ময় বিস্ফোরণের আভাস পেয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের সময়ও এমনিতর ঘটেছিল।

এখানে যে উৎক্রান্তি তা হল দেহ ছেড়ে যাওয়া। এ-বর্ণনা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি প্রাঞ্জল। ব্যষ্টিপ্রাণ সমষ্টিপ্রাণে মিশে শূন্যবৎ হয়ে যায়। আর সেই শূন্য স্বর্জ্যোতিতে ঝলমল করতে থাকে। ( বেদমীমাংসা ১।১০৭ দ্রষ্টব্য )।

**তত্ প্রাপ্য** বলা বাহুল্য এই তৎ ঋগ্বেদের একং তৎ। ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্—পরব্যোমই তৎ। আকাশ অক্ষর—দেবতারা সবাই আছেন সেখানে। তা হতে বায়ুরনিলমমৃতম্ নিঃসৃত হন মাতরিশ্বারূপে। আকাশের ব্রহ্মক্ষোভই বায়ু—আকাশাদ্বায়ুঃ। **আকাশাত্মা** আর বায়ুপ্রতিষ্ঠ সংজ্ঞা দুটিতে এর ইঙ্গিত আছে। বিদ্বান্ সর্বভূতকে নিয়ে সর্বদেবময় ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে থাকবেন।

২।১৫ ॥ **অথাতঃ**। স্পষ্টই সাধনসঙ্কেত। এতক্ষণ যে প্রাণোপাসনার কথা হল বিদ্বান্ তার ধারা কিভাবে বহতা রাখবেন সেই কথা বলা হচ্ছে। আমি সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলাম আর অমৃতত্ব পেলাম, তা নয়—দেওয়াও আছে। হয় গৃহত্যাগের পূর্বে, নয় আসন্ন মৃত্যুকালে গৃহমেধী পুত্রে বা শিষ্যে শক্তি সংক্রামিত করবেন। এই হল সম্প্রদান, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ( ১।৫।১৭ ) এই অনুষ্ঠানকেই বলা হয়েছে সম্প্রত্তি, সম্+প্র+√দা+তি। এখানে মৃত্যুকালে সম্প্রদানের কথাই বলা হচ্ছে—**প্রেষ্যন্** অর্থাৎ প্রেতির সময়। এ-মৃত্যু বিজ্ঞানীর বা যোগীর। প্রেতি অর্থেই বৈবস্বত মৃত্যু। সম্প্রদান বা সম্প্রত্তি হতেই পরে সম্প্রদায় কথাটি এসেছে।

ঘরখানি নতুন করে ছাইয়ে অগ্নি স্থাপন করে পূর্ণপাত্রসহ জলকুম্ভ রাখা হবে। ঘট বা আধার ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ—জলকুম্ভ তারই প্রতীক। ওর উপরে যে ব্রীহিপূর্ণ পাত্রটি সে হল বিজ্ঞানের সিদ্ধি ঋদ্ধি। ব্রীহি বা ধান সম্পদের প্রতীক। ওইটি তিনি ছেলেকে দিয়ে যাবেন। **উপনিধায়**—এই

সপাত্র জলকুম্ভ কাছে রেখে শুধু নববস্ত্র ও মাল্যভূষিত হয়ে পিতা পুত্রকে আহ্বান করবেন। ছেলে এসে বসবে **উপরিষ্টাত্** মাথার দিকে বা সামনে। যদি 'সামনে বসবে' অর্থ ধরা হয় তাহলে সে এসে বাবার পায়ের দিকেও বসতে পারে। যাই হোক ছেলে এসে **অভিনিপদ্যতে**—সর্বতোভাবে পিতার সঙ্গে একাত্ম হবে। অর্থাৎ সে ভাবনা করবে কায়-মন-প্রাণে সে পিতার সঙ্গে এক, তাঁরই দ্বিতীয় দেহ।

পিতা পুত্রের অভিমুখে ফিরে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে তার ইন্দ্রিয়গুলি স্পর্শ করবেন। অর্থাৎ চোখে চোখে চেয়ে তিনিও অনুরূপ ভাবনা করবেন। এ-উপনিষদে একটু আগেই বলা হয়েছে, [?] 'আত্মা ত্বং পুত্র মা আবিশ'। এখানে পিতা সেইভাবে আবিষ্ট হয়েই তাকে বিদ্যা সম্প্রদান করবেন। সম্প্রদানের অর্থ সুস্পষ্ট। প্রত্যর্পণ বা প্রতিদিনের আশা না রেখে দানই সম্প্রদান।

কৌষীতকী বৃহদারণ্যকের চেয়ে প্রাচীন। এজন্য এখানকার চেয়ে বৃহ-দারণ্যক উপনিষদের বর্ণনা অধিক সুসম্বদ্ধ। ( বে. মী. ১।১৯৪ )

ব্রহ্মের পাঁচটি দ্বারপাল বাক্ চক্ষু ( ছান্দোগ্যে বায়ু আছে এখানে তার পরিবর্তে প্রাণ ) ইত্যাদি আগে দিয়ে মুক্তির পথ খুলে দেওয়া হল। বিজ্ঞানীর প্রজ্ঞাবিষ্ট ওই ইন্দ্রিয়গুলি পুত্রে সাধনশৌর্য সঞ্চার করবে।

তারপর প্রাকৃত জীবনের কথা। বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র ও মন দিয়ে পুত্র ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করবে। বাইরের জীবন যেমন চলছিল তেমনি চলবে।

গীতায় আছে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন ভাবে চলেন ইতরেরা তার অনুসরণ করে। এই লোকশিক্ষার দায় থাকে বলেই বৈদিক ঋষি বাইরে গৃহাশ্রম ছাড়ার কথা কখনও বলতেন না। তাহলে সমাজকে সৎশিক্ষা, গৃহস্থের আদর্শ কে দেবে? অতএব পান-ভোজনকর্ম সুখ-দুঃখ এমনকি সুপ্রজননের দায়েরও পিতা হতে পুত্রে অনুবৃত্তি চলবে। প্রজাতন্তু ছিন্ন করনা—এ আচার্যেরও অনুশাসন ছিল। এই প্রসঙ্গে আনন্দ রতি ও প্রজাতির উল্লেখ রয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাই 'প্রজাতিরমৃতমানন্দমিতি উপস্থে।' রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় রমণসুখ, প্রজাতি—প্রজনঃ কন্দর্পঃ। তার ফলে প্র-জার উদ্ভব। আনন্দ এই দুটির ঊর্ধ্বে। **ইত্যা** প্রেতি, এগিয়ে চলা। আমি সারাজীবন এগিয়ে চলেছি, আজ তোমার চলাতেও প্রেরণা (urge) সঞ্চার করে দিলাম।

**ধী** বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞান। এটি পিতার সাবিত্র কর্ম। এরপর পুত্রের

মাধ্যমে তাঁর সেই ধীযোগ অব্যাহত থাকবে। সিদ্ধ চেতনার সম্যক্ রূপায়ণ না হওয়া পর্যন্ত পুত্র প্রজা, সম্যক্ রূপায়ণে বি-জা ( ঋ. ৩।১।২৩ )। তারপর বংশধারা লোপ পেতে পারে।

এক কথায় পিতার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সবই পুত্রে বর্তাবে।

চলে যাওয়ার সময় পুত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে যাবেন এবং পিতার আশীর্বচনের উত্তরে তাঁর মুখের দিকে সোজাসুজি আর না তাকিয়ে বলবেন 'আপনি স্বর্গলোকে গিয়ে ঈপ্সিত বস্তু লাভ করুন'। ফিরে না চাওয়ার অর্থ হয়তো মায়ার ডুরি কেটে দেওয়া। আর ওই **স্বর্গাল্লোঁকান্ কামান্ আপ্নুহীতি** এর অনুরূপ উক্তি রয়েছে ঐতরেয় উপনিষদে। সেখানে বামদেব সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাঽস্মাল্লোকাদুৎক্রম্য স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ ( ৩।১।৪ )।

এ অনুষ্ঠানের পর পিতা যদি নিরাময় লাভ করেন তবে হয় তিনি পুত্রের অধীন হয়ে সংসারে থাকবেন নয়তো প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন।

## দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

# তৃতীয় অধ্যায়

৩।১।। এ অধ্যায়ে প্রজ্ঞা প্রাণ ও ভূত (spirit, life and matter) নিয়ে বিচার করা হচ্ছে। তিনটি ওতপ্রোত এবং প্রাণ সবের মূল। প্রাণ, প্রজ্ঞাত্মা প্রাণকে বড় করে দেখানোই এ-উপনিষদের বৈশিষ্ট্য। ঋগ্বেদে ইন্দ্র প্রধান দেবতা, এখানে তাঁরই প্রাধান্য।

দিবোদাস ঋগ্বেদে একজন রাজা ( দ্র. ৩য় মণ্ডল )। দৈবোদাসি প্রতর্দন নামটা কাল্পনিক হতেও পারে। প্র+তর্দন<√তৃদ্ বেধন। ভিতরের আলো অন্ধকার ফুঁড়ে বাইরে যাচ্ছে বা অন্ধকার ভেদ করে আলোতে যাওয়া—গুহাগ্রন্থি ভেদই প্রতর্দন।

ইন্দ্রের প্রিয় ধাম পরম ব্যোম, পুরাণে অমরাবতী। যুদ্ধে পৌরুষের পরিচয়—এটি প্রতর্দনের ক্ষাত্রধর্মের প্রতি ইঙ্গিত। ধর্মশাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও বীর্যের কথা আছে, উপনিষদে আছে শ্রদ্ধা ও তপের কথা। বৈদিক ভাবনায় দুটি ওতপ্রোত—ব্রহ্ম ও ক্ষত্র কেউ অবজ্ঞাত নয়।

হতে পারে প্রতর্দন যুদ্ধমৃত্যু লাভ করেছিলেন। গীতায় ধর্মযুদ্ধের গুণ-কীর্তন স্মরণীয়।[১]

অনুশাসনে আছে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়ো না। ইন্দ্রই সত্যস্বরূপ। সুতরাং প্রতর্দনকে তিনি বললেন—

মাম্ এব সত্যম্ এব। সত্যস্বরূপকে জানাই হিততম। এই বলে তিনি তাঁর বীরকর্মের কিছু পরিচয় দিলেন।

ত্বষ্টা জগৎশিল্পী—সৃষ্টিব্যাপারের আদিমতম রূপ তাঁর মধ্যে পাই। পরে ইনি বিশ্বকর্মা প্রজাপতি নামে পরিচিত হয়েছেন। অব্যক্ত হতে জগৎকে ব্যক্ত করেন বলে তিনি সূত্রধর। ত্বষ্টা অতি প্রাচীন দেবতা ( দ্র. বেদমী, পৃ ৪৮০ ), তাঁর ত্রিশীর্ষ[২] পুত্রই বৃত্র। শতপথ ব্রাহ্মণে তাঁর কাহিনী আছে।

---

১ মূলে বর, অবর নিয়ে শব্দের খেলা। (১) অবরো বৈ কিল ? মা। অবর অর্থাৎ নিকৃষ্ট নাকি আমি ? তাহলে ( বর চাই ) না। (২) অবরো বৈ কিল মে। আমার অ-বর (=বর না নেওয়াই ) ভাল।

২ সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিনটি শীর্ষ। অথবা দেহ প্রাণ মন।

ত্বষ্টা জগৎকে ব্যাকৃত করায় নাম-রূপ দেখা দিল—এই তাঁর তক্ষণ। সেই নামরূপ ব্রহ্মকে আড়াল করল। পঞ্চদশীতে ব্রহ্ম পঞ্চাংশ—সৎ চিৎ আনন্দ নাম রূপ। শেষের দুটি তাঁর তটস্থ লক্ষণ। ত্বষ্টাও পঞ্চাংশ। ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ ব্যাকৃত নামরূপ। ত্বাষ্ট্রই বৃত্র বা সেই আবরণ যা সত্যসূর্যকে আড়াল করেছে।

ইন্দ্র বজ্রশক্তি দিয়ে তাকে হত্যা করে ব্রহ্মহত্যার পাপে পাপী হলেন, অর্থাৎ নামরূপের আবরণ খসানো চলবে না। ব্রহ্মদর্শনের পর নামরূপকেও সত্য বলে জানতে হবে। তা না হলে ব্রহ্মঘাত-পাপ—চতুষ্পাত্ ব্রহ্মকে জানা হয় না। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

**অরুন্মুখ** যতি সালাবৃকো[১] মুনি ( দ্র. বেমী পৃ ১০৭ টী ৪৮ ) এঁরা কাল চামড়ার কোমরবন্ধ পরেন—অর্থাৎ কৌপীন বা কটিমাত্র বস্ত্রাবরণ।

**সালাবৃক**[২] কি হায়না? বাজসনেয়ী সংহিতাতেও এ প্রসঙ্গ রয়েছে।

ঋগ্বেদে দুজায়গায় **যতিদের** কথা আছে। সেখানে সাম্প্রদায়িকতার ইঙ্গিত নেই। তাঁরা হয়ত স্বাধীনভাবে সাধনা করতেন। অন্যত্র আছে তাঁরা ইন্দ্ররক্ষিত। সম্ভবত তাঁরা ইন্দ্রের অতীন্দ্রিয় ভাবের উপাসক। এঁরাই পরে নৈষ্কর্ম্যবাদের প্রবর্তক হয়ে একেবারে পৃথক হয়ে গেলেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা সমাবর্তন করতেন না। হতে পারে তাঁরাই পরে স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। এঁরা দলে ভারী হওয়ার পর আরুণেয় উপনিষদে বিধি দেওয়া হল 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ' ইত্যাদি। ঋষিপন্থায় গৃহাশ্রমী হয়ে একটি সন্তান হলে তবে বানপ্রস্থ। সন্ন্যাস তারও পরে।

বৌদ্ধযুগে ছোট ছোট ছেলেদেরও সন্ন্যাস দেওয়া হচ্ছে দেখা যায়। সমাজে প্রতিবাদ ওঠায় বুদ্ধ এটি নিষিদ্ধ করেন।

**সন্ধা** = সন্ধি (pact)। **প্রহ্লাদ** প্রকৃষ্ট আহ্লাদ বা আনন্দবৃত্তি। তাতে জোর দিলে মত্ততা আসে। প্রহ্লাদ নিজে ভাগবত কিন্তু তাঁর সন্ততিরা অসুর। আনন্দবাদ তৌষ্টিকতা আনে, তা সাধনবিঘ্ন। প্রহ্লাদীয়রা অসুর বলার মধ্যে ভাগবতদের প্রতি একটু ঠেস থাকতে পারে। ফলে তাঁদেরও বৈদিকদের প্রতি একটা আক্রোশ হয়।

---

১ তু, পোড়ারমুখো। শব্দটি বিদ্বেষসূচক গালাগালি হওয়া সম্ভব।

২ সালাবৃক=গুজরাতীতে বরু। এরা ঘরে ঢুকে শিশু ও ছোট পশু টেনে নিয়ে যায়।

পুলোমা পুরাণে শচীর জনক। শব্দটিতে সদৃশবর্ণলোপ haplology থাকতে পারে। পুলোমা <পুলুলোমা<পুরুলোমা = লোমশ? মার্কণ্ডেয়কে মনে পড়ে। এ দেহ নিয়েই কল্পকাল বর্তমান থাকার মধ্যে যোগপন্থার ইঙ্গিত আছে। পৌলোমরা অন্তরিক্ষচারী সুতরাং প্রাণের সঙ্গে যোগ রয়েছে তাদেরও। আর যদি কোন মুনিসম্প্রদায় হন তাহলে ইন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ স্বাভাবিক। আবার পুরুরোমা যদি মেঘাবৃত আকাশ হয় তাহলে বৃত্রবধের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে মনে হয়। লোমশের সঙ্গে যোগ থাকাই সম্ভব। পরে পুলোমা হতে শচী পৌলোমী। পৌলোমরা তখন ইন্দ্রের অনুগত হয়ে গেছেন।

কাল তমঃ। কালকঞ্জ কৃষ্ণপদ্ম। পৃথিবীই কৃষ্ণপদ্ম, কর্দম হতে তার উদ্ভব। কিন্তু ইন্দ্রকে জানলে তা ভুবনপদ্ম। পথের বাধা দূর করলেই সব ঋতচ্ছন্দ। ইন্দ্র অসুর নাশ করেন তিনপুরে—এটি বাইরের ব্যাপার। কিন্তু এতে ইন্দ্র ব্রহ্মঘাতী। তিনি বলছেন, আমার একটি লোমও খসে না অর্থাৎ সাধকদের কোনও লোক এতে নষ্ট হয় না। √মী—ক্ষতি। ইন্দ্রকে জানাই বিজ্ঞান। তাঁকে যে জানে কোনও কর্মের দ্বারাই সে লোকভ্রষ্ট হয় না।

এই-ই বেদান্তের 'ন পুণ্যং ন পাপম্'। নীল পরঃ কৃষ্ণ 'নীলং ভাঃ'। তাঁকে জানলে নীলের আভা বা আনন্দের আভা চলে যায় না।

এ পর্যন্ত তটস্থ লক্ষণ। এরপর বলবেন স্বরূপ লক্ষণ।

৩।২॥ প্রজ্ঞা একটা মানস বৃত্তি। মননের চরমে যে প্রজ্ঞা তা নয়, সব মিলিয়েই প্রজ্ঞা। সমস্ত করণ বা সাধনই প্রজ্ঞা। পরে একটু গোলমাল হয়েছে। মুনিপন্থায় প্রজ্ঞার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। পাতঞ্জলে সাধনোপায়ের শেষটি হল প্রজ্ঞা। কঠতে বলা হয়েছে 'প্রজ্ঞানেন আপ্নুয়াৎ'। কিন্তু এখানে যা বলা হচ্ছে তা সহজ সাধনার কথা। প্রথমে প্রাণ প্রবল, প্রজ্ঞা তার অধীন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞার কার্যকারিতা বাড়বে।

আয়ু ( <√ই ) বলতে জীবন-যোনি প্রযত্ন (life-activity)। জীবৎ-কালের পরিমাণ আয়ু এটা আপাতদৃষ্ট—phenomenal আয়ু। আসলে তা আয়ুস্কম্ভ—জীবনের একটা স্তম্ভ। আর এই আয়ুই প্রাণ ( আয়ুঃ প্রাণঃ )। আয়ু সংজ্ঞাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদে পাই অক্ষিতায়ু—এ আয়ু কালপরিমাণ ছাপিয়ে যায়। ব্যষ্টিচেতনার (individuality)

উদয়নকে বলা যেতে পারে অক্ষিতায়ু। কালচক্রের মধ্যে থেকেও যদি আয়ুর সাতত্য অনুভব করা যায় তবে আমি অক্ষিতায়ু। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি···।' জন্মান্তরের পূর্ণ ধারাটা যিনি দেখছেন সেই আধিকারিক পুরুষকে অক্ষিতায়ু বলা যায়।

আরেকটা সংজ্ঞা 'বিশ্বায়ু'। বলা যেতে পারে এটি সমষ্টিপ্রাণের অনুভব (continuity of life through generations)। এই মুহূর্তে যিনি বিশ্বপ্রাণকে অনুভব করেন তিনি বিশ্বায়ু। সংজ্ঞাটিতে আলোকরশ্মির ব্যঞ্জনা আছে। আর অক্ষিতায়ুতে বায়ুর গতির ব্যঞ্জনা। সংহিতায় মরুদ্‌গণ বা দিব্যপ্রাণের সংবেগ সরুদ্-দিবা—ব্যাপ্তিচৈতন্য।

যাঁরা অমৃত প্রাণের অধিকারী তাঁদের প্রজ্ঞাই প্রজ্ঞাপারমিতা। তাঁরাই আধিকারিক পুরুষ। আয়ুক্ষয় হলেও তাঁদের ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। আর এই অমৃতপ্রাণের প্রজ্ঞাই সত্যসংকল্পের (mission) উৎস। এ সংকল্প ব্রহ্মের 'প্রজ্ঞয়া সত্যম্ সংকল্পম্'।

বৌদ্ধ ভাবনা দিয়ে কিন্তু এ প্রজ্ঞাকে বোঝা যাবে না। প্রাণ ও প্রজ্ঞাকে এখানে দেখানো হয়েছে প্রচলিত ধারার বিপরীত রীতিতে। প্রাণ স্থাণু, প্রজ্ঞাই সক্রিয়।

এখানে আয়ু জীবনের কাল-পরিমাণ। অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় সমগ্র বিশ্ব এক মধুচক্র। এটিই পুরাণে বিষ্ণুবক্ষে কৌস্তভ। প্রশ্নোপনিষদে একটি কথা আছে 'জীবঘনঃ'। সর্বম্ আয়ুঃ বলে দুটি ভাব দ্যোতিত করা হয়েছে। প্রথমটি মানুষের পূর্ণ আয়ুষ্কাল বা শত বৎসর—'দেবহিত আয়ু'। দ্বিতীয়টি ওই 'জীবঘন' ভাব—বিশ্বায়ু হওয়া সবার হয়ে সবার মধ্যে বাঁচা। পরে এটি জীবন্মুক্তি বলে বর্ণিত হয়েছে। (তু. তৈ. উপনিষদে মুক্তপুরুষের কথা—যিনি কামান্নী, কামচারী, কামরূপ)।

তারপর পরব্যোমে অক্ষিতায়ু বা অমৃতত্ব লাভ। রৈখিক ও ব্যাপ্তি—যুগপৎ চৈতন্যের দ্বিবিধ দশাতেই এ অমৃতত্ব লাভ হলে, কালে এবং কালাতীত ভূমিতে অমৃত সম্ভোগ করলেই অমৃত প্রাণের অধিকারী হওয়া যায়।

প্রাণাঃ প্রাণবৃত্তিসমূহ। মুখ্যপ্রাণ এক আর তার বৃত্তিগুলি পৃথক। ইউরোপীয়ানরা 'প্রাণাঃ' বলতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বুঝেছেন। তা কিন্তু নয়। প্র+অনন—প্রাণশক্তি, শ্বাস-প্রশ্বাস তার প্রকাশমাত্র। অনন, শুধু নিশ্বাস

( আনীদ অবাতম্‌…) কিন্তু প্র উপসর্গযোগে তা পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ। ঋগ্‌বেদে অবশ্য প্রাণ ও অপান দুটি বৃত্তির কথা আছে। যজুঃতে চারটি, উদানের উল্লেখ নাই। উপনিষদে তাকে পাই। ছান্দোগ্যে ব্যান দুটি বৃত্তির সন্ধি। প্রশ্নে আছে সমানয়নের কথা। তাহলে প্রাণ ও অপানই মুখ্য। ভূতমাত্রা নাভিতে, প্রাণমাত্রা হৃদয়ে এবং প্রজ্ঞামাত্রা ভ্রূমধ্যে রয়েছে। সকল ক্রিয়াতেই প্রাণ ও প্রজ্ঞার সহাবস্থান। কিন্তু প্রাণ না থাকলে প্রজ্ঞার ক্রিয়া হয় না।

কিন্তু ক্রিয়ার অনুবৃত্তি থাকে কি করে? সেও প্রাণের কাজ। এখানে ক্ষণভঙ্গবাদ আসে। সব ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে পড়ছে, তাকে অনুবর্তনের ধারায় নিয়ে চলেছে প্রাণ। অতএব **সর্বে প্রাণাঃ** পঞ্চবৃত্তি। এর মধ্যে একজন মুখ্য। জীবযাত্রার মূলে তারই কর্তৃত্ব। ইন্দ্র সেই মুখ্য প্রাণ বা প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ।

৩।৩।। **অপেত** একটি পারিভাষিক শব্দ (technical term)। যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ( কঠ. ২।৩।১১ ), কিন্তু ওটি এখানে ঠিক খাটে না। বাক্‌ ফোটেনি মন তখনও জাগেনি এই ভাবটা বোঝাতে চাইছেন। এই অংশটিই কেমন যেন অসম্বদ্ধ।

সুষুপ্তাবস্থার কথাই বোঝানো হয়েছে। ঠিক প্রাকৃতাবস্থার কথা আগে বলেন নি। তখন সব নিশ্চেষ্ট কিন্তু মুখ্য প্রাণ থাকে। সেই অধিষ্ঠান-চৈতন্য। সে জীবকে **পরিতঃ গৃহীত্বা উত্থাপয়তি**। এই মহাপ্রাণই **উকৃথ**। ( =উত্থাপক ) **এতদ্‌ উকৃথম্‌ ইতি উপাসীত**।

পঞ্চবৃত্তির মূলে প্রভব একটিই। বার বার এই দেখানো হচ্ছে। **শুধু** প্রাণকে দেখাই বিজ্ঞান। এটি **দৃষ্টি** ও **বিজ্ঞান** দুই-ই। দৃষ্টি কথাটি খুব প্রাচীন। এ থেকে পরে দর্শন শব্দটি এসেছে। জৈনরা বলতেন দৃষ্টির বিশুদ্ধি চাই। বৌদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গে 'সম্মাদিট্‌ঠি'। দৃষ্টি বলতে outlook। জীবনের তত্ত্ব মীমাংসা করতে গিয়ে যে-ভূমি হতে সবকিছু দেখা হয় সেইটাই দৃষ্টি। কঠতে আছে 'পরাক্‌ পশ্যতি'। সেখানে দৃষ্টি বহির্মুখ—চাই অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টি। স্মৃতিতে দৃষ্টি নিয়ে একটা কথা আছে—হেতুপ্রশ্ন, সব কিছুর কারণ খোঁজা। শ্বেতাশ্বতরের প্রথমে, কেন.তে এবং নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টি নিয়ে জিজ্ঞাসা রয়েছে। এই হেতুপ্রশ্ন ও দৃষ্টি একই এবং তা অন্তর্মুখ। এ না থাকলে জীবন অর্থহীন। তবে উপনিষদে আছে এই হেতুপ্রশ্নকেও বেশী বাড়াতে নেই। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'অতিপ্রশ্ন কর না'। শ্রীরামকৃষ্ণও

বলেছেন, 'জ্ঞান বাহিরে জানা, বিজ্ঞান ভিতরে জানা'। এ-ও দৃষ্টির কথা।

ছান্দোগ্যে আছে সুষুপ্তিতে জীব অহরহ ব্রহ্মে গমন করে। সেই নিরোধাবস্থা জাগ্রতে অবলম্বন করা যায়। পাতঞ্জলে আছে নিদ্রা ত্রিবিধ—তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক। এছাড়া যোগনিদ্রা আছে। বৈষ্ণব বলেন গোপীনিদ্রার কথা। রাজসে স্বপ্নময় নিদ্রা। সাত্ত্বিক নিদ্রায় সামান্য ঘুমেই দেহ প্রসন্ন হয়—কাকজ্যোৎস্নার মত।

জপের অভ্যাস থাকলে ঘুমের পরও দেখি জপ চলছে স্মরণে-মননে। এই ধরণে স্বপ্নে ইষ্টসম্প্রয়োগ হতে পারে, যাকে বৈষ্ণব বলেন স্বপ্নবিলাস। এ দিব্য স্বপ্ন। অনেকে বলবেন—এসব মনঃকল্পনা। তাতেই বা হানি কি? যে ওটি পেল সে যদি প্রসাদ লাভ করে অন্যের তাতে হানি কি? এই বিজ্ঞানভূমির স্বপ্নে সমাধি পর্যন্ত হয় এবং গভীর আনন্দ মেলে—তাতে যে পাওয়া তা বাইরের পাওয়ার চেয়ে ঢের বেশী।

স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে'
তাঁহা বিনু আর কারও নই॥

বিজ্ঞানের উপান্তে যোগনিদ্রা। তার বৈশিষ্ট—স্বপ্নে আলো দেখা—প্রথমে জ্যোৎস্নাবৎ তারপর যেন সূর্যোদয়। চিৎ-সূর্যের উদয়ে চিত্ত প্রপঞ্চোপশম শান্তাবস্থা লাভ করে।

জাগ্রতে চেতনা যত সুসংযত হবে ততই ভিতরটা পরিষ্কার হয়ে আসবে। 'অন্তরে সোনা চাপা আছে'। গীতায় আছে 'সমনস্কঃ সদা শুচিঃ' থাকার কথা। স্বপ্নভূমি আমাদের পতিত জমিন। ওটি অসীম সম্ভাবনার আধার। কর্ষণ করলে অফুরন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান মেলে।

সুষুপ্তিতে দেখছি সব লোপ পেল। রইল শুধু প্রাণ। এটি অনুভব করলে প্রশ্নের মতই বলা যায় প্রাণের উদয়ন সূর্যের মত। প্রাণ কখনও নিরুদ্ধ হয় না। পতঞ্জলিতে একাগ্র ভূমি হতে নিরোধে যাওয়ার কথা আছে। এখানে তা নয়। এখানে অগ্র্যা বুদ্ধি থাকেই।

প্রাণ মূলে রয়েছে, আর রয়েছে প্রজ্ঞা। বাইরে ফুটছে বাক্—তার বিষয় ভূতমাত্রা। ভূতমাত্রার কথা পরে বলা হচ্ছে। সব বাকের আশ্রয় হল নাম। নামেরও আবার বিজ্ঞানময় মনোময় ও স্থূলরূপ আছে। সবই বাকের বিষয়। সর্বেন্দ্রিয়ই তার বিষয় নিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। এ এক রকম স্বরূপাবস্থান এবং প্রাকৃত সমাধি।

**প্রাণাঃ** প্রাণের বৃত্তিসমূহ। এখানে প্রাকৃত ও যোগনিদ্রা দুটি মিলিয়ে বলা হয়েছে। অগ্নিকে বলা হচ্ছে **জলন্ত**। যদি প্রাকৃত নিদ্রা হয় তখনও প্রাণাগ্নিরা দেহপুরে প্রজ্বল (প্রশ্ন ৪।৩)। এটি সহজে ধরা যায় না। কিন্তু অভ্যাসে ধরা যেতে পারে। জাগ্রতে যদি সর্বদা সুস্থ দেহ ও তজ্জনিত প্রসন্নতার বোধ উদ্যত থাকে তবে স্বপ্নে ঐ বোধটি জাগবে। পরিপাক বা পরিণমন ঠিকমত হলেই তা পুষ্টির হেতু হয়। যোগনিদ্রায় কিন্তু প্রাণাগ্নির বোধ সর্বদা উজ্জ্বল থাকে। আর নিদ্রাশেষে সকলেই **বুধ্যতে** জেগে ওঠে। কিন্তু বিশেষভাবে জাগাই **প্রতিবোধ**। আমি জেগেই ছিলাম এইটি বোঝা প্রতিবোধ (তু. কেন ২।৪)। সাধারণ নিদ্রান্তে প্রাত্যহিক ক্রিয়ার অনুবর্তন চলে। কিন্তু প্রতিবুদ্ধের বেলায় ঠিক তা নয়। প্রাকৃত নিদ্রার পর ক্লান্তি দূর হওয়ায় ইন্দ্রিয়গুলি বেশ উৎফুল্ল আছে বলে মনে হয়। যোগীর বেলায় তা দাঁড়াবে প্রাণ হতে দেবতার প্রকাশ। তিনি সর্বেন্দ্রিয়ে দেবতাকে দর্শন করেন। [শংকর দেবাঃ শব্দটি বহুক্ষেত্রে প্রাণাঃ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। দেবতারাই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা।] দেবতা হতে ব্রহ্মলোক প্রয়াণ—সব কিছুতে ব্রহ্মদর্শন। সমাধির পরিপাকে সিদ্ধেরও এই দৃষ্টি সহজ। স্বপ্ননিদ্রা-জ্ঞানাবলম্বনে স্বচ্ছন্দে এ অবস্থা লাভ করা যেতে পারে। ঘুমের আগে আমি অসীমের বুকে ঘুমিয়ে পড়ছি এটি বেশ সহজেই ভাবনা করা যেতে পারে।

কথাটি **সিদ্ধি** না হয়ে দৃষ্টি হলেই ভাল হত। মুনি আগে দেখেন তারপর সিদ্ধি। এখানে হয়ত উদ্দেশ্য এই যে দৃষ্টির কথা বলা হল প্রথমে। জীবনে সেটি অভ্যাস করলে মরণে সিদ্ধি। প্রাচীন উপনিষদে সিদ্ধি কথাটি বেশি নাই, ওটি মুনিপন্থার সংজ্ঞা। তবে ধাতুটি মেলে।

এরপর মৃত্যুর কথা। **নি-এতি** নিয়ে চলেছে গভীরের দিকে। এখানেও সাধারণ মৃত্যু এবং যোগীর মৃত্যুকে একসঙ্গে মিলিয়ে বলা হচ্ছে। **উদক্রমীত্ চিত্তম্** এটি প্রাচীন ভাব। মৃত্যু সম্পর্কে তখন একটা উজ্জ্বলতর বোধ ছিল। তাঁরা বলতেন মরণ সবারই এক, তখন দেবতা এসে বিদেহীকে নিয়ে যান। তবে কেউ জ্ঞাতসারে যায়, কেউ বা অজ্ঞাতসারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে হৃদয়ের প্রদ্যোতের কথা বলা হয়েছে। এটি সবার হয়, চিত্ত-নিরোধও সবার হয়। তবে আলোটা পরে হয়ত নিভে যায়। ডমরু-মধ্য একটি প্রতীক, ওটি চ্যুতিক্ষণ। বাহিরটি একটা বিন্দুতে সংহত হয়। পরে তা টর্চের আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।

যে মৃত্যু প্রাকৃত সে-ই আবার যোগীর মৃত্যুও—কিন্তু তার ধরণ আলাদা। তিনি মরণে আবার প্রতিবোধিত হন। বৈদিকরা 'অজ ভাগে'র কথা বলতেন। মরণের পর দেবতা ও লোকদর্শন হয়। পরে অরূপ ব্রহ্মলোক বা বিশোক নাকে উত্তরণ। নাক হল বৈদিক পঞ্চম স্বর্গ।

বৌদ্ধ পরিভাষায় নির্মাণকায় এখানে পড়ে থাকে। সম্ভোগকায়ের আতিবাহিক শরীর জাগে। সেই শরীরই 'অজো ভাগঃ' নিয়ে চলে। সেইটি সত্যকার শরীর—সেই দেহে দেবতা ও লোক দর্শন হয়।

৩।৪॥ একীভূত যে-প্রাণ, উৎক্রান্তিকালে বাক্‌ তা হতে সমস্ত নাম বিসৃষ্ট করে। মৃত্যুতে সব ভিতরে ঢুকে যায়। এখানে যেন জন্মান্তরের একটা ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়।

আপ্নোতি ক্রিয়ার কর্তা প্রাণ। তত্ত্ব তিনটি—(১) প্রাণ (২) তার বৃত্তি বা কারণ ও (৩) বৃত্তির বিষয়। একীভূত না হলে প্রাণ হতেই ইন্দ্রিয়াদি বিসৃষ্ট হয়। বাক্‌ নামগুলিকে ভিতর হতে বাহিরে ছুঁড়ে (Projection) দেয়।

আগে বলা হয়েছে মরে গিয়ে আবার জন্মায়। তার ভিতর হতে সব ফোটে।

প্রাণ মুখ্য কর্তা। সে বাক্‌চক্ষুরাদি সহায়ে ভূতকে জানে। নাম তাহলে প্রাণেই থাকে। নামের সংস্কার প্রাণে আগে যদি না থাকে, তাহলে বাক্‌ কি করে নাম বলত? সংস্কার না থাকলে প্রবৃত্তি আসে না। প্রাচীনরা বলতেন প্রাক্তন সংস্কার। আধুনিকরা বলেন 'হেরিডিটি'। সাংখ্যমতে পুরুষের সঙ্গে এ-সংস্কারের সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক প্রাণের। প্রকৃতির ধারা নিত্য। অধুনা বিজ্ঞানেও বংশগতি বলতে তাই বোঝায়। এর মধ্যে জন্মান্তর মানবার কোন দরকার পড়ে না।

আপ্নোতি ও অপ্যেতির ধ্বনিসাম্য ইচ্ছা করে নেওয়া। ব্রাহ্মণগুলিতে এ শৈলী আছে। আপ্তি বিচ্ছুরণ আর অপ্যয় লীন হওয়া, প্রাণের দুটি ক্রিয়াই আছে। শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি আলাদা করে পাবার দরকার হয় না। প্রাণের মধ্যেই সব পান।

আগে নিদ্রা ও মৃত্যুতে লয়ের দিকটা দেখানো হয়েছে। জন্মান্তরবাদ মানলে ওই অপ্যয় হতেই সৃষ্টি। আর তা না হলে প্রাণ হতেই বিসৃষ্টি চলছে। কি করে এবার তা বলা হবে।

৩।৫। এখানে দশ-দশটি ভাগ করা হয়েছে। দশটি প্রজ্ঞা দশটি ভূত দশটি জ্ঞান-ও-কর্মেন্দ্রিয়। তবে orderটি এখানে ঠিক নাই, একটু এলো-মেলো হয়ে গেছে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে স্পর্শের পরিবর্তে আছে শরীর। গন্ধকে বলা হয়েছে ঘ্রাণ। রস জিহ্বা। আর কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাক্ হস্ত পাদ উপস্থ (পায়ু বাদ)। এছাড়া রয়েছে মন। এ ভারি অদ্ভুত ঠেকে।

একটি জীবিত প্রাণীর মন থাকে, আর থাকে কয়েকটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। সম্ভবত জৈবক্রিয়াগুলি বোঝাতে **শরীর** সংজ্ঞাটি ব্যবহার করেছেন। ন্যায়ে তা 'জীবনযোনিপ্রযত্ন'।

আহার ব্যাপারটার উল্লেখ নাই কেন? বোধহয় **হস্ত**কেই তাঁরা ধরেছেন আহার-গ্রহণেন্দ্রিয়। ওটি আদানের অর্থাৎ বাইরে থেকে কোন কিছু গ্রহণের ইন্দ্রিয়রূপে প্রখ্যাত। লক্ষণীয়, পশু হাত দিয়ে খায় না।

Locomotion-এর জন্যে **পদ** এবং Procreation-এর ইন্দ্রিয় উপস্থ।

মানুষের আর একটি প্রখ্যাত ইন্দ্রিয় **বাক্**। কিন্তু পায়ুকে এঁরা বাদ দিলেন কেন? সাংখ্য বলেন বিসর্গ মাত্রেই পায়ুর কর্ম। ঘাম কফ সবই বিসর্গ। মোটামুটি এখানে Metabolism-এর জন্যে হাত ও Catabolism-এর জন্যে পায়ু ধরলে জৈবক্রিয়ার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র মিলত। কিন্তু দশ সংখ্যাটি এবং মন এই দুইটিকেই বজায় রাখতে গিয়ে তাঁরা পায়ুকে বাদ দিয়েছেন মনে হয়। এখানে আমরা ইন্দ্রিয়গুলির প্রাচীনতম ছক পেলাম। **উদূঢ়ম্** < উদ্ √ বহ্‌—একটি অঙ্গ উদ্‌বহিত হল। পা. অদূঢুহত্‌ < √দুহ্‌।

**প্রজ্ঞার** একটি অঙ্গকে উপরে তোলা হয়েছে। তা লীন হয়ে ছিল। তাকে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রজ্ঞাতেই সব রয়েছে। এ-ব্যাপার সৃষ্টির পরে। ঐতরেয় উপনিষদে যে বর্ণনা তা সৃষ্টির আদিতে।

**মাত্রা** শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। গীতায় মাত্রাস্পর্শ ও ব্রহ্মসংস্পর্শের কথা আছে। টীকাকার সেখানে বলছেন সুখ-দুঃখ সবই শরীরের। এখানে 'মাত্রা' কথাটার সঙ্গে ওই স্পর্শের একটা সম্পর্ক রয়েছে। স্পর্শ বাইরে না ভিতরে? ছান্দোগ্যে আছে সব স্পর্শের 'উপস্থ এব আয়তনম্'। কঠে রয়েছে অন্তর্মুখ হলে সব contact-ই স্পর্শ। বেদে পৃশ্নি মরুদ্‌গণের মাতা। রুদ্র তাঁদের পিতা। অতএব রুদ্র ও পৃশ্নি সেই আদি মিথুন বা 'বৃষভশ্চ ধেনুঃ'? শ্রীঅরবিন্দও বোধির ক্ষেত্রে স্পর্শকে খুব উচ্চ স্থান দিয়েছেন।

এই স্থূল ভূত হতে ব্রহ্ম পর্যন্ত সবার সঙ্গেই প্রাণের সম্পর্ক স্পর্শ দিয়ে। ব্রহ্ম-সংস্পর্শ তার পরিণাম, তারও পরে শূন্য।

৩৬॥ এখানে মূল কথা হচ্ছে বৃত্তিগুলি ব্রহ্ম হতে বেরিয়ে এল। **প্রজ্ঞয়া ( প্রাণঃ ) বাচং সমারুহ্য**……ইত্যাদি। সম্-আ-√রুহ্—চড়ে বসা। **সমারুহ্য** চড়াও হয়ে, সওয়ার হয়ে।

সাংখ্যে পুরুষপ্রকৃতিবাদ আছে। প্রকৃতির চেতনা হচ্ছে। চেতনা সত্ত্বগুণ। সাংখ্যবাদী বলেন, প্রকৃতির সত্ত্বোদ্রেক হল। ( পৌরাণিক সাংখ্যমতে ) পুরুষ আত্মপ্রকৃতিকে এইরকম প্রজ্ঞান রূপেই আস্বাদন করেন। প্রজ্ঞানের কিছুটা হয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রিয়, আর কিছুটা consolidated হয়ে জমাট বেঁধে ভূত। জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। তিনের মধ্যে ঐক্য না থাকলে জ্ঞান হত না। দর্শনেন্দ্রিয় দৃশ্য দেখে, কিন্তু রূপজ্ঞান হয় কি করে? এক জিনিষের পরিণাম বলেই তা হয়। অতএব পুরুষের যে ভূতজ্ঞান তা অন্তর হতেই project প্রক্ষিপ্ত হয়। প্রাণ হতেই প্রজ্ঞা এবং ভূতমাত্রা।

আমরা যা কিছু ভাবছি করছি বা বলছি সবই যান্ত্রিক। কৌষীতকীতে প্রথমে এরকম সংকেত দিয়ে তারপর পুরুষকে আনা হয়েছে। প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় এবং ভূত—এর মধ্যে প্রজ্ঞাও প্রকৃতির এলাকায় পড়ছে। কৌষীতকীর মতে প্রাণ পিছনে থাকাতে প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে ক্রিয়া করছে। এটি আধুনিক দর্শনের সঙ্গে মেলে। সে বলে—ম্যাটারের মধ্যে যা-কিছু পড়ে সবই পূর্ব-নির্দিষ্ট। ওয়াটস্ বলেন Consciousness is a function.

প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় ও ভূতের মধ্যে প্রজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংখ্যমতে প্রকৃতির সবই পারার্থ্যে। এ ভাবনা কৌষীতকী হতেই এসেছে। প্রজ্ঞা না থাকলে এই function, কাজগুলি হয়ে গেলেও কেউ তা জানত না।

৩৭॥ বাকের কথাটা এমনভাবে বলা হয়েছে যে ওটি জ্ঞান না কর্মেন্দ্রিয় তা বোঝা যায় না।

যে বলছে সে জানে না কী বলছে—এই হল **প্রজ্ঞা-অপেতা বাক্**। সে-বাকের উচ্চারণ অনর্থক। কাকে কেন কী বলছে ঠিক নাই—প্রলাপে বা স্বপ্নে এরকম হয়। কিন্তু ক্রিয়াটি তাহলে ঠিক হয় না। প্রজ্ঞাপনের কোন লক্ষ্য না থাকলে ইন্দ্রিয়ের কাজ যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। প্রজ্ঞা থাকলে তবেই হয় লক্ষ্যাভিসারী।

**মন** এখানে বৈদিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—সাংখ্যের অর্থে নয়। বেদে মন ইন্দ্র (মনস্বান্)। শ্রীঅরবিন্দ বৈদিক অর্থে mind শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মননের দ্বারাই মানুষ 'মানুষ' হয়। সুতরাং মন না জাগলে সাধনা হয় না। (মন যজমান, উপনিষদ দ্র.) ইন্দ্রিয়-মানস ও এই মনে স্পষ্টই পার্থক্য রয়েছে।

অকর্তা—কর্ম করেও কিছুই করছি না। এরকম ভাব idea এ ছত্রটিতে থাকতেও পারে। আবার স্বভাবেও এইরকম হয় যে অন্যমনা হওয়ায় হাত যন্ত্রবৎ শারীর কর্ম নিষ্পন্ন করল, আমি জানি না। অবপ্রাকৃত subconscious বা অতিপ্রাকৃত super conscious দুই ভূমিতেই অবস্থাটা ঘটতে পারে।

**প্রজাতিরমৃতম্ আনন্দম্** (তৈ. উপ.)—এ উর্ধ্বস্রোতা প্রাণের লক্ষণ। স্পর্শসুখ বাদ দিয়ে শারীর ক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে এর অনেক উদাহরণ আছে। এই দিব্য সম্ভোগ বা প্রেমবিলাসবিবর্ত। অপ্রাকৃত চেতনার লক্ষণ হল, মন থাকে না কিন্তু সুখ-দুঃখের উজানে রস থাকে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান তখন সজ্ঞানে হয়। সর্বেন্দ্রিয় মানসোত্তর চেতনায় আবিষ্ট হয়ে ফিরে আসে যেন।

বুদ্ধে শক্তি সুপ্ত, নিঃশক্তিক। তারপর পেলাম শিবশক্তির যুগনদ্ধতা। শ্রীকৃষ্ণের বেলায় শক্তি মানসোত্তর চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত (supramentalised)। মন দিয়ে বোঝার বেলায় প্রজ্ঞা থাকে, আর সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে গেলে থাকে প্রাণ।

সমস্ত বৌদ্ধ ধারণার লক্ষ্য প্রজ্ঞা লাভ। প্রজ্ঞাপারমিতা তাঁদের ইষ্ট, তাঁরা মনকে নিরুদ্ধ করে (একটা কোন লক্ষ্য নিয়ে) শূন্যতায় সমাপন্ন হন। ব্যাপারটা কিন্তু মনের আশ্রিত সুতরাং মানসসংস্কার থাকে। পতঞ্জলি নিরোধকেও সংস্কার বলেছেন। সাধনকালে বিন্দুমাত্র সংস্কার থাকলেও পূর্ণ প্রজ্ঞা হয় না। যোগদর্শনে এর সুন্দর বিশ্লেষণ আছে।

৩৮॥ বিষয় না থাকলে বিষয়ীর জ্ঞান কি করে হতে পারে? রামানুজ বলেন, জ্ঞান কখনও নির্বিষয় হতে পারে না। ভূতমাত্রা ও ইন্দ্রিয় অন্যোন্যনির্ভর। এটি আধুনিক দর্শনের সঙ্গে মেলে, object ছাড়া consciousness থাকে না।

বাক্ ও রূপ সহজেই নাম-রূপের কথা মনে করিয়ে দেয়। বৌদ্ধ দর্শনের নামরূপ বেদান্ত হতেই নেওয়া। রূপ object, নাম subject। এই দেহ ও

বহির্জগত্ রূপ ( তু. রূপস্কন্ধ )। পঞ্চস্কন্ধের বাকি চারিটি নাম—বেদনা সংজ্ঞা ( অন্তঃ প্রজ্ঞার প্রথম উন্মেষ—Percept ) বিজ্ঞান ও সংস্কার—সবই অন্তর্জগতে। নাম অন্তরে, রূপ বাইরে। এখানে **ভূত ও প্রজ্ঞামাত্রা** তা কিন্তু ওই নামরূপেরই দার্শনিক বিশ্লেষণ। মুনি ও ঋষিপন্থার অন্যোন্যসম্ভাবন লক্ষণীয়।

ভূতমাত্রা যে প্রজ্ঞামাত্রাতেই পর্যবসিত এতক্ষণ এটাই বোঝানো হয়েছে। এখন মনের অনুভব বাদ দিয়ে যদি প্রাণের ক্রিয়া লক্ষ্য করতে পারি তখন দেখব প্রাণের অপ্রাকৃত রূপ।

অপ্রাকৃত রূপে **প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা**। সে **অজর, অমৃত**। এ প্রাণের কাছে সাধু-অসাধুর বিচার নাই।

ইন্দ্র <√ইদ্॥ ইন্দ্, ঈশ্বর হওয়া, সর্বজীবের প্রশাসক হওয়া। এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ সেই সর্বেশ্বর ইন্দ্র।

হে প্রতর্দন, তোমার এই প্রাণই আমার আত্মা। এ তত্ত্ব জানাই পরা বিদ্যা।

## তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

# চতুর্থ অধ্যায়

৪।১ ॥ **গার্গ্য** গর্গ ( তু-George)-বংশীয় এক ঋষি। বলাকার ছেলে বলে তাঁর পিতার নাম বালাক ( তু. সুমিত্রা > সৌমিত্র ), বালাক-র পুত্র বালাকি ( তু. দশরথ > দাশরথি )। তিনি **সংস্পষ্ট** ( < √স্পশ্—পরিষ্কার দেখা ) অর্থাৎ সকলের অতি দর্শনীয় বা খুব বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাস ছিল **উশীনরে** মধ্যপ্রদেশের নর্মদাকূলে। **মত্স্য** উশীনরের পশ্চিমে এবং **বশ** দক্ষিণে। এগুলি সবই প্রয়াগের পশ্চিমে। **কুরুপাঞ্চাল** তখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের আড্ডা ছিল। আর **কাশী-বিদেহ** পূর্ব-ভারতের প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ। এখানকার সঙ্গে ওখানকার চিরদিনই বিবাদ ছিল।

**অজাতশত্রু** কাশীনরেশ। কাশীর ব্রহ্মদত্তকুলে বোধিসত্ত্বের জন্ম—এ কিংবদন্তী বোধ হয় অজাতশত্রুর মত ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ কাশীরাজদের নিয়েই সৃষ্ট।

বৃ-উপনিষদেও দৃপ্ত বালাকি ও অজাতশত্রুর সংবাদ ( = কথোপকথন ) রয়েছে (২।১) তবে এখানে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সাধনসঙ্কেত আছে। কৌষীতকীর আখ্যানটি প্রাচীনতর। **অনূচানঃ** অনু— √বচ্ + কানচ্ যে অনুবচন করেছে অর্থাৎ বেদ পড়েছে। আচার্যের প্রবচন, শিষ্যের অনুবচন। উপনিষদে আর একজন অনুচানমানী শ্বেতকেতু।

উপনিষদের আখ্যান ভাগে ছোট দু-একটি আঁচড়ে চমৎকার কৌতুক রস ফুটে ওঠে। এ-অংশটি তার এক উদাহরণ। অজাতশত্রু ব্রহ্মবিদ্। কিন্তু জনক সম্বন্ধে তাঁর খেদটুকু লক্ষণীয়।

৪।২ ॥ বালাকি ও অজাতশত্রুর দৃষ্টিতে মৌল পার্থক্য রয়েছে। বালাকি পুরুষ বা দেবতা দেখছেন, এ দৃষ্টি পরাকৃবৃত্ত। আর অজাতশত্রু দেখছেন অবিগ্রহকে—তাঁর দৃষ্টি প্রত্যকৃবৃত্ত। বস্তুতঃ বালাকির অনুভব জগৎভূমির অবলম্বনে। আর অজাতশত্রুর দর্শন প্রাচ্যদর্শনের মূল রীতি অবলম্বনে। তিনি দিচ্ছেন সুষুপ্তির বিজ্ঞান।

বৈদিক ঋষির দৃষ্টিও কিন্তু এক হিসাবে 'পরাক্ পশ্যতি'। তাঁদের দেখা অধিদৈবত – যেমন এই বায়ুকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলে দেখা। তুলনীয় 'সর্বং-

খলু ইদং ব্রহ্ম'। পরিণামে এই দৃষ্টি অধ্যাত্ম হত। বালাকি এই দৃষ্টির অধিকারী। কিন্তু এ দৃষ্টির মূলে যে গভীরতা তা তাঁর ছিল না। অজাতশত্রু সেই ভাবের সত্য সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে তুললেন।

বালাকি আদিত্যপুরুষের উপাসক আর অজাতশত্রু দেখছেন 'পৌরুষ ভাব'। উপনিষদের যুগে **পুরুষ** কথাটি এই অর্থে ব্যবহার হতে শুরু করেছে দেখা যায়। একটি 'পুরুষবিধ' ( ছান্দোগ্যে হিরন্ময় পুরুষ ), অন্যটি 'পুরুষ-স্বরূপ'। পুরুষসূক্তে আর ভাগবতে ( জগৃহে পৌরুষং রূপম্ ) এ-দুটির দৃষ্টান্ত মেলে। দুটিই কিন্তু অবিগ্রহ ভাব। বালাকি দেখছেন হিরণ্যকেশ হিরণ্য-শ্মশ্রু বিগ্রহ। প্রতিতুলনায় অজাতশত্রু দেখাচ্ছেন বৃহৎ=ব্রহ্মস্বরূপ যিনি, যিনি অতিষ্ঠা=লোকোত্তর, তাঁকে। ( অতিষ্ঠা—অতিস্থিতি, প্রতিষ্ঠা—প্রতিস্থিতি বা সামনে ) বলা হচ্ছে তিনি আছেন সবার মূর্ধায়। এখানে পরবর্তী যুগের সহস্রারের সংকেত। ছান্দোগ্যে 'বৈশ্বানর সবার উপরে মূর্ধন্যকমলে রয়েছেন'—এ-উক্তি স্মরণীয়।

**পাণ্ডরবাসাঃ** ম্লান শুভ্রবর্ণ (pale white)। বিশেষণটি চন্দ্র সম্বন্ধে খাটে। আদিত্যপুরুষ জ্যোতির্ময় কিন্তু সে জ্যোতি স্নিগ্ধ সুশীতল, হয়ত এখনি এক ব্যঞ্জনা রয়েছে।

৪।৩॥ এবার অজাতশত্রু পুরুষের বদলে বললেন **আত্মা**। **সোম রাজা** এ-বিশেষণ সংহিতায় আছে। ওষধি-সূক্তে ওষধিরা সোমরাজ্ঞী (=সোম যাদের রাজা, বহুব্রীহি সমাস )। ধান উত্তরায়ণের শস্য, গম দক্ষিণায়নের। তারা চাঁদের আলোয় পাকে—এরকম ধারণা ছিল। কাশীবিদেহের **অন্ন** বলতে গমই বোঝায়। সোম এই অন্নের আত্মা Spirit, ও ভোক্তা দুই-ই।

৪।৪॥ **বিদ্যুৎ সত্যের আত্মা**—এ ভাবনা খুব প্রাচীন। এই বিদ্যুতের সংজ্ঞা সংহিতায় কেত বা কেতু flash of intuition < √ কিত্॥ √ চিত্ কোন কিছু সম্পর্কে সচেতন হওয়া > চিত্তি। দেবতা চকিতে দেখা দিয়ে চমকে তোলেন সমগ্র সত্তা। এর নামান্তর 'স্মর' < স্মৃ ঝলমল করা। তু. হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত। স্মৃতি থেকে এর পার্থক্য বোঝাতে একে বলা হয়েছে ধ্রুবা স্মৃতি। কেনোপনিষদে ব্রহ্ম সম্পর্কে আদেশ ( =নির্দেশ, সঙ্কেত, উপলব্ধ সত্যের উচ্চারণ ) রয়েছে তিনি যেন বিদ্যুতের বিদ্যোতন। বৃ. ও ছান্দোগ্য উপনিষদে ( ৪।১৫।৫, ৫।১০।২ )

দেবযান পথে বিদ্যুতে অমানব পুরুষের কথা আছে। কঠে অবশ্য দেবযান পন্থা একটু অন্যরকম।

√স্বৃ-র প্রয়োগ সংহিতায় আছে। অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে 'স্মরাথঃ' (১০।১০৬।৭) তাঁরা দুজনে ঝলসে উঠলেন। ঘনান্ধকারে-ইব দীপদর্শনম্। স্বৃ > মৃ > মর্মর —ঝলমলে পাথর, মর্ধ—তারুণ্যে ঝলমল, মৃত্যু—আলোকময়, বৈবস্বত।

৪।৫ ॥ **স্তনয়িত্নু** গ্রীক thanatos মৃত্যু ॥ স্তনথ < √স্তন্। এমন কিছু যা অস্তিত্বের সবকিছু ভেঙে খান খান করে দেয়। মরুত্-সূক্তে আছে, স্তনয়ন্ হস্তি দুষ্কৃতম্। কঠে অনুরূপ ভাবনাকে বলা হচ্ছে, মহদ্ ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্। স্তনন একটা গম্ভীর বৃংহনের মত। শূন্যতা বা আকাশের সঙ্গে তার যোগ আছে।

ঋষিরা বাকের উপাসক ছিলেন। বাকের প্রতীক বজ্রধ্বনি, যেমন ব্রহ্মের প্রতীক আকাশ। ব্রহ্ম ও বাক্ অবিনাভূত, আকাশের সঙ্গে বজ্রেরও আত্যন্তিক যোগ ( তু. হেবজ্র, হং আকাশবীজ )। নিরুক্তকার বললেন, বজ্রধ্বনি মধ্যমা বাক্। দ্যুস্থানে সরস্বতী প্রজ্ঞা। কিন্তু তিনি বাকে স্ফুরিত না হলে তাঁর উদ্দেশ পাব কি করে? তখন তিনিই হলেন মধ্যমা। তাঁর গর্জনে অন্ন matter বিশীর্ণ হয়ে দেবতাদের সৃষ্টি হল। অন্যভাবে বলা হয় ব্যাহৃতি হতে সৃষ্টি। এ কল্পনা পরে এসেছে। নিরুক্তে দেখি সৃষ্টিধর্মী দেবতারা সব অন্তরিক্ষস্থান। মরুদ্‌গণ যখন উজিয়ে যান, তখন তাঁরা ভানু-স্বর্ভানু। ভা উষার মোলায়েম আ-ভা। তু. তম্ এব ভান্তম্ অনুভূতি সর্বম্। রশ্মি এর বিপরীত। সে হল ঋজু কিরণরেখা যা দিগ্‌বিদিকে বিকীর্ণ হয় (pencil-like divergent rays), তু. রশনা—ঘোড়ার লাগাম। মোট কথা, বহু-ধা বিসৃষ্টি অন্তরিক্ষে। দ্যুলোকে সংহরণ।

অন্তরিক্ষে এসে ত্রিপদী গুহাহিতা বাক্ চতুষ্পদী বা চতুর্থী হলেন। মেঘগর্জন তারই প্রতীক। √রুদ্ গর্জন। রুদ্র ও মরুদ্‌গণ গর্জনশীল।

**শব্দস্য আত্মা** বাকের তিনটি পাদ। বালাকি বাইরের বাক্‌কে ধরছেন। অজাতশত্রু ধরছেন বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়কে।

৪।৬ ॥ আদিত্য হতে মেঘগর্জন পর্যন্ত এই চারটি অধিদৈবত। প্রথম তিনটি জ্যোতি, পরেরটি শব্দ। লোকের ক্রম ধরতে গেলে পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যৌ। কিন্তু পৃথিবী থেকেই বলা হচ্ছে, তাই হয়ত ওটি বাদ। আবার

পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ বায়ু অগ্নি ও অপ্ রয়েছে—ক্ষিতি বাদ। পৃথিবীকে যদি পাঞ্চভৌতিক ধরা হয় তাহলে এসবই পৃথিবীস্থান হতে বলা।

এবার ধারা একটু আলাদা। বালাকির পুরুষবিধতা ঠিকই আছে। অজাতশত্রুর বিন্যাস অন্যরকম।

**পূর্ণম্ অপ্রবর্তি** আকাশ সম্বন্ধে এ উক্তি ছান্দোগ্য উপনিষদেও পাই। ওটিও প্রাচীন উপনিষত্। আকাশ পুং ও ক্লীব-লিঙ্গ দুই হয়। এখানে ক্লীবলিঙ্গ। আকাশ ব্রহ্ম—এ-ও অতি প্রাচীন মত। ছান্দোগ্যে 'কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম'। এ আকাশ অসম্ভূতিস্বরূপ, কিছুই প্রবর্তিত হয় না তা হতে। আবার আকাশ নাম-রূপের নির্বহিতা—এ-ও আছে। সংহিতায় আকাশের অনুরূপ শব্দ দ্যৌ আর ব্যোম। দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। দ্যৌ আলো-ঝলমল আকাশ ( গ্রীক জিউস )। ছান্দোগ্যে পুরুষের 'শুক্লং ভাঃ'। বালাকি ঐ প্রাচীন ধারার উপাসক যাতে আকাশ প্রত্নঃ পিতা (Primal father) বা পুরুষ। আর সামান্যভাবনার দিক থেকে সংহিতায় আকাশ ব্যোমন্—পদপাঠে বি+ওমন্। অনুরূপ আরেকটি শব্দ অক্ষর। ব্যোমের সবসময়েই বিশেষণ 'পরম'। দ্যৌঃ পিতার অতীন্দ্রিয় ভাবই ব্যোমন্, অক্ষর—ছান্দোগ্যে 'পরঃকৃষ্ণ নীলিমা'। এই আকাশ 'অপ্রবর্তি', বৃহদারণ্যকে 'অক্ষর'। এ থেকেই বৌদ্ধ শূন্যবাদের উদ্ভব।

বালাকি ও অজাতশত্রুর অনুভবে পার্থক্য এইখানে। একজন আদিত্য-পুরুষ বা পিতাকে দেখছেন। অন্যজন দেখছেন মহাশূন্য।

এ থেকে তিনটি বাদ দাঁড় করানো চলে—দেব বা পুরুষবাদ ( সংহিতা ), ব্রহ্মবাদ ( উপনিষৎ ) ও আত্মবাদ ( সাংখ্য )। অজাতশত্রু পূর্বের মানুষ, যেখানে মুনিধারা বা আত্মবাদই প্রবল। অথচ দেববাদের প্রতিও সমর্থন রয়েছে। তাই তিনি নির্বিশেষের দিকে ঝুঁকেছেন। বৌদ্ধের নির্বাণবাদ এই নির্বিশেষত্বের চরম পর্যায়।

'৪।৭॥ তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'আকাশাদ্ বায়ুঃ'। এখানে সেই ক্রম অনুসৃত হচ্ছে। সংহিতায় **ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ** দেবতা এবং এক ঋষিরও নাম। কুণ্ঠা সংহিতায় অংহঃ, উপনিষদে জুগুপ্সা। তার অভাবেই চেতনা বৈকুণ্ঠ। অপ্রবর্তি ব্রহ্ম ও ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ একই। বৃহতের অকুণ্ঠ অনিবাধ চেতনা ঐন্দ্রী চেতনা।

এ উপনিষদে প্রাণ ও প্রজ্ঞা এক। যেখানে ইন্দ্র প্রজ্ঞাস্বরূপ, সেখানে

তিনি বৈকুণ্ঠ। আর যেখানে তিনি প্রাণ, সেখানে **অপরাজিতা সেনা**। সেনার প্রাচীন অর্থ যা ছুঁড়ে দেওয়া হয়। সংবেগের ভাব রয়েছে শব্দটিতে। ক্ষেপণাস্ত্র = সেনা। কিন্তু পরে যোদ্ধা অর্থটি রূঢ় হয়ে গেছে।

**অপরাজিতা** দিকের নাম—পূর্ব ও উত্তর দিক, যেদিকে সূর্যাস্ত হয় না। সেনা বললে পুরাণের দেবসেনা মনে পড়ে। কার্তিক দেবসেনা-পতি। অপরাজিতা সেনা অতএব মরুদ্‌গণ, এরকম ধরা যায়।
মরুত্বতীয় ইন্দ্র ধরলে প্রাণ ও প্রজ্ঞার যৌগপদ্য।

বালাকি বায়ুপুরুষকে প্রাণরূপেই উপাসনা করেছেন। অজাতশত্রু ঐ সঙ্গে প্রজ্ঞাকে যুক্ত করে দেখালেন প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ অকুণ্ঠ অপরাজিত। কিন্তু আগের মত ব্রহ্মভাবনায় নিয়ে গেলেন না—এইটি বিশেষ। সংহিতায় ইন্দ্র প্রধান দেবতা বলেই হয়ত তাঁকে আনা হল।

৪।৮॥ সংহিতায় **বিষাসহি** অগ্নি ও ইন্দ্রের বিশেষণ। সবকিছুকে অভিভূত করার যে সামর্থ্য তাই সহঃ (তু. অগ্নি সহসঃ সূনুঃ) < √সহ্। যিনি সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন তিনি বিষাসহি God overthrowing everything.

৪।৯॥ অগ্নির পরে যা উৎপন্ন হয় তা অপ্। অপ্‌কে **তেজের আত্মা** ভাবাটা বৈদিক ভাবনা। অগ্নিসূক্তে তাঁকে 'অপাং গর্ভঃ' বলা হয়েছে। এই অপ্ 'দেবীর্ আপঃ' বা কারণসলিল। তা হতে বৈশ্বানরর অগ্নি উদ্‌ভূত হন মাতরিশ্বার সামনে। অজাতশত্রু অপ্‌কে সেই কারণরূপে দেখছেন।

নাসদীয় সূক্তে অপ্রকেত গহন গভীর সলিলের কথা রয়েছে। সলিল <সৃ, যা সরে-সরে যায়। এ যেন একটা গতিবেগ বা স্পন্দ। নিস্পন্দে স্পন্দ দেখা দিল, এই Primal movement-ই সলিল বা অপ্। অন্যত্র একে সরীমন্ বলা হয়েছে, বাতস্য সর্গঃ অভবত্ সরীমণি ৩।২৯।১১। উচ্ছল আদিপ্রাণ মাতরিশ্বা—তা হতে 'সরীম'—অনড়ের নড়ে ওঠা। তারপরে বাত। প্রবাহ, গতি। এবং তারও পরে অগ্নি। ওই যে আদিম সলিল, অজাতশত্রুর লক্ষ্য তিনি। অন্যত্র এর নাম সমুদ্রঃ অর্ণবঃ।

দেখা যাচ্ছে বালাকি কেবল পুরুষবিধতা আরোপ করছেন। আর অজাতশত্রু আকাশাদি চারটিকেই নিয়ে যাচ্ছেন আদি বৈদিক ভাবনায়।

৪।১০॥ এবার অধ্যাত্মদৃষ্টি। **আদর্শে** আয়নায় পুরুষ-দর্শনের কথাটা কঠ ও বৃহদারণ্যকে আছে। এর মধ্যে abstraction-এর ব্যাপার নাই।

দেহাদি নিয়েই এ-উপাসনা চলে, আর এধারাটি যে দোষাবহ, তাও উপনিষদেই আছে। দ্র. ইন্দ্র বিরোচন প্রজাপতির গল্প, ছান্দোগ্য ৮।৭।

বাইরের ছায়া **প্রতিরূপ** মাত্র, পুরুষ নয়। গ্রীসে এই বোধহয় নার্সিসাসের গল্প—অহং-এর আরাধনা। ভাগবত আবার এই ভাবনারও যে উর্ধ্বায়ন সম্ভব তা ধরিয়ে দিয়েছেন—'দর্পণান্তে হেরি প্রিয়ে আপন মাধুরী' ইত্যাদি।

বালাকি আদর্শে শুধু পুরুষ দেখছেন আর অজাতশত্রু দেখছেন **প্রতিরূপ**—বৈদিক অর্থে রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব··· । অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টিতে বাইরের জগৎ আমারই আত্মপ্রচ্ছুরণ। বেদান্তে এ থেকে পরে প্রতিবিম্ববাদ এসেছে।

৪।১১ ॥ **প্রতিশ্রুৎকা** বা প্রতিধ্বনি হল আলম্বন। এটি যেন উত্তরাখণ্ডের ছবি। যেখানে প্রতিধ্বনি ব্যাপারটা খুব পরিচিত। স্তনয়িত্নুতে শব্দের বৈপুল্য বোঝায়। আর এটি হল পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত নদীগর্জন। সাধনার দিক থেকে পরে এ হতে নাদানুসন্ধানের ভাব এসেছে। জ্যোতিদর্শন, নাদশ্রবণ ইত্যাদির মূলে ভূতগুণের বৈপুল্য সাধন। শব্দের বৈপুল্য এক আছে মেঘগর্জনে, কিন্তু তা সর্বদা সুলভ নয়। সেদিক থেকে পাহাড়ী নদীর গর্জন খুব সহায়ক। ঝর্ণার ধারে যোগের স্থান নির্বাচন করা হত। অহোরাত্র ঐ প্রপাতগর্জন শুনতে শুনতে শব্দ যোগীর সত্তা গ্রাস করবে। শব্দে অভিভূত হয়ে ভিতরটা শূন্য হয়ে যাবে—এরকম সাধনসংকেত ছিল।

বালাকি ঐ প্রতিশ্রুৎকাকেই পুরুষভাবনা করছেন। অজাতশত্রু তাকে দেখছেন **দ্বিতীয়ঃ অনপগঃ** আত্মা হতে যে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না, যাকে কখনো হারাই না। শব্দকে অন্তরে শ্রবণ করলে তা অনপগ হতে পারে। যোগে তা অনাহত নাদ, প্রাচীন পরিভাষায় অগ্নের্ঘোষঃ, অগ্নিঘোষ, সোহং হংসঃ। ভেতরের এই শব্দই পরে মন্ত্র হয়ে গেছে। প্রণবের ওম্-ম্-ম্-কে টেনে নিয়ে লয় করার কথা বলতেন তান্ত্রিকেরা। তা থেকে মন্ত্রময় শরীর বা মন্ত্রমহেশ্বরের ভাবনা এসেছে শৈবদর্শনে।

পূর্বমীমাংসা শব্দব্রহ্মবাদী। তাঁরাই প্রথম মন্ত্র হতে মনোলয়ের সাধনা সৃষ্টি করেন। প্রণবের অর্ধমাত্রাকে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর করে ১/১২৮ > ১/২৫৬ >১/৫১২ ভাগ করার কথা তাঁরাই বলেছেন।

৪।১২ ॥ যে শব্দ পুরুষের অনুগমন করে অর্থাৎ প্রাণাপান বা শ্বাসপ্রশ্বাস, তারই উপাসনা করার কথা এখানে। সর্বদা ঐ শব্দের দিকে খেয়াল রাখাও আত্মসচেতন হওয়ার পন্থা বিশেষ। পরে এটি অজপা-জপের ধারা হয়েছে।

শ্বাসপ্রশ্বাস লয় হবে প্রাণবায়ু বা আত্মপ্রাণে। সেটি আবার মহাপ্রাণ বা শূন্যে লয় হয়। ফলে সাধনাটি দাঁড়ালো শ্বাসপ্রশ্বাসকে দেখে যাওয়া, ওটি অসু বা মাতরিশ্বার ক্রিয়া। শ্বাস বেরিয়ে গিয়ে একদিন আর ফিরবে না। যদি তাকে পুরুষভাবনা করি তাহলে কেবল জীবনটি দেখা হল, মৃত্যুকে দেখা হল না। কিন্তু যদি তাকে মাতরি-শ্বা বা মহাপ্রাণের স্পন্দন বলে দেখি, তবে জীবন-মৃত্যু দুয়ের চক্রাবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠবে চোখের সামনে।

৪।১৩ ॥ যোগশাস্ত্রে এটি ছায়াসাধন নামে পরিচিত। নিজের বিরাট রূপ দেখা বা ঐ ভাবটি আনার জন্য এ উপাসনার উদ্ভব।

অজাতশত্রু ছায়াকে মৃত্যু বললেন। কথাটি গভীর। কঠোপনিষদে 'ছায়াতপে'র প্রসঙ্গ আছে। আর্যেরা জ্যোতির উপাসক। তাঁরা সূর্যাভিমুখে চলেছেন, ছায়া চলেছে পিছনে। ছায়া alter-ego। লোকপ্রবাদ বলে, ছায়ার মধ্যে মানুষের শক্তি থাকে। অজাতশত্রু একে একটা রহস্যার্থ দিলেন। তুমি অমৃতাভিসারী আর মৃত্যু তোমায় অনুসরণ করছে—মৃত্যু ও অমৃত উভয়েই জ্ঞাতব্য। হিরণ্যগর্ভ-সূক্তে পাই, এ দুই-ই তাঁর মধ্যে আছে। যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ। ছায়া < ছদ্‌, আবরণ প্রকাশ দুই-ই। সংস্কৃতে ছায়া কান্তিও। তাই ছায়া ও আতপ অন্যোন্যসংপৃক্ত। সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা আর ছায়া। উপনিষদে তা শুক্ল ও কৃষ্ণ 'ভাঃ'। লক্ষ্য হল, জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে।

৪।১৪ ॥ **শারীর পুরুষ** কথাটিতে প্রাচীন একটি বৈদিক ভাব আছে। শরীর ও আত্মা জড়িয়ে রয়েছে একসঙ্গে—সবশুদ্ধ বোঝাতে গেলে শারীর পুরুষকেই ধরতে হয়। যোগেও তাই।

বালাকির দৃষ্টি অধ্যাত্ম—ব্যষ্টি-চেতনার ভাব। অজাতশত্রুর দৃষ্টি অধি-দৈবত—বিশ্বচেতনায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যাপ্তির ভাব আনছেন প্রতি ক্ষেত্রে। কেবল হিরণ্যশরীর হলেই হবে না, হিরণ্যগর্ভ হওয়া চাই—তাঁর ইঙ্গিত এই দিকে।

৪।১৫ ॥ এতক্ষণ বাইরের কথা চলছিল। এবার ক্রম একটু ভিন্ন।

প্রাজ্ঞ কথাটি সাধারণভাবে নেওয়া। প্রাজ্ঞ আত্মা চেতনা বা সচেতনতা। স্বপ্নেও এটা থাকে। বালাকি তার উপাসক। কিন্তু সুষুপ্তিতে যখন কিছুই দেখি না তখন কী হবে, সে প্রসঙ্গ নাই। অজাতশত্রু ঐ ফাঁকটুকু পূরণ করে দিচ্ছেন।

সুপ্তিতে বা ধ্যানে চেতনা সংহৃত হয় (regression of consciousness)। অন্তরাবৃত্তিতে চেতনা তলিয়ে যাওয়াই যম-প্রবৃত্তি। মৃত্যুতেও এই হয়। তবে যম রাজা এই বিশেষণটি অদ্ভুত। বহির্মুখ ইন্দ্রিয়দের যিনি টেনে রাখেন, সংহত করেন, তিনিই সংযমন পুরুষ ও রাজা (শাস্তা)। বালাকি জাগ্রতের খবর রাখেন, কিন্তু স্বপ্ন-নিদ্রা-জ্ঞান অবলম্বনে যে সত্যের উপলব্ধি তার সংবাদ জানতেন না।

৪।১৬-১৭॥ অক্ষিপুরুষের কথা বৃ. এবং ছান্দোগ্যে (৪।১৫) আছে। দক্ষিণে ইন্দ্র, বামে ইন্দ্রজায়া বিরাট্। এই অক্ষিপুরুষকে কেউ কেউ চোখে যে ছায়া পড়ে সেই পুরুষ মনে করেন। তা কিন্তু নয়। 'আবৃত্তচক্ষু ধীর' যাঁকে দর্শন করেন, তিনিই অক্ষিপুরুষ। ছান্দোগ্যে অক্ষিপুরুষকে বামনী এবং ভামনী বলা হয়েছে। উপাসনার সময় কেউ দক্ষিণাক্ষি, কেউ বামাক্ষি ধরতেন। আবার কেউ কেউ দুটি মিলিয়েই ধরতেন। পরে ভ্রূমধ্যে ত্রাটক যোগ এরই সংহত রূপ। অন্তরাবৃত্তিতে দুটি চোখ এসে মেলে এক বিন্দুতে—এটিই তৃতীয় নেত্র বা প্রজ্ঞাচক্ষু।

ডান ও বামের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এ তর্ক উঠতে পারে। বৈদিকরা সূর্যোপাসক, তাঁরা দক্ষিণ অক্ষিকে প্রাধান্য দিতেন। তন্ত্রে বামাঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তাঁদের ইড়া বামে, ওটি অমৃত বা চন্দ্র নাড়ী। পিঙ্গলা দক্ষিণে—মৃত্যু বা সূর্য নাড়ী। তাঁদের মতে সূর্যোপাসনায় মৃত্যু অতিক্রম করা যায় না। সূর্যদ্বার ভেদ করতে হবে। এর সঙ্কেত সংহিতাতেই রয়েছে। সূর্য দিনে, সোম রাত্রে। মিত্র অহঃ, বরুণ রাত্রি। সূর্য = মিত্র। চন্দ্র বা সোম = বরুণ। মিত্রাবরুণ উভয়কে জানতে হবে।

অজাতশত্রু অক্ষিপুরুষকে যথাক্রমে নামের অগ্নির ও জ্যোতির এবং সত্যের বিদ্যুতের ও তেজের আত্মা বলছেন। তাঁর এই বিন্যাসে বোঝা যায়, দক্ষিণ অক্ষি অপেক্ষা বাম অক্ষির দর্শন গভীরতর।

নাম এই দৃশ্যমান বিশ্ব। আর তার পিছনে যা তাই সত্য।

অগ্নি পৃথ্বীস্থান দেবতা। সংহিতা ও উপনিষদে অগ্নি সূর্য চন্দ্র তারকা ও বিদ্যুৎ—এই পাঁচটি **জ্যোতির** কথা পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ সর্বশেষ জ্যোতি। এ বিদ্যুৎ অন্তরিক্ষের নয়। উপনিষদে এটি স্মর বা সাধ্যদেবগণ, কোথাও অমানব বা অমানস পুরুষের স্বরূপ। তাকে অব্যক্তের জ্যোতি বলা যেতে পারে। জ্যোতি বলায় পুরুষের পরিবর্তে অক্ষিপুরুষকে আদিত্যবিম্বরূপে দেখছি—এমনি বোঝায়। আর **তেজ** সেই জ্যোতির সম্পুট। বাইরের ঝলক **জ্যোতি**, কেন্দ্রটি **তেজ**।

৪।১৮॥ বালাকি এবার চুপ করে গেলেন। অজাতশত্রু সপরিহাসে বললেন, কি? আর কিছু জানা আছে? নেই? তাহলে মিছেই বলেছিলেন, আমি তোমায় ব্রহ্মতত্ত্ব বলব![1]

গর্বিত ব্রাহ্মণ তখন দীনভাবে রাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। তাঁকে বিনীত হতে দেখে অজাতশত্রু বিনয়াবলম্বন করলেন। নম্রস্বরে বললেন, ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয় উপনয়ন দান করবে, এ রীতিবিরুদ্ধ। 'লোকের সামনে কথা হবে না, অন্তরালে চলুন' বলে রাজা বালাকির হাত ধরে সভা ছেড়ে অন্যত্র গেলেন। তারপর একজন সুপ্ত পুরুষের কাছে গিয়ে 'হে বৃহত্, হে রাজা সোম' বলে সম্বোধন করলেন। নিদ্রিত ব্যক্তি সাড়া দিল না। রাজা তখন লাঠি দিয়ে লোকটাকে খোঁচা দিলেন। সে জেগে উঠে বসল। অজাতশত্রু বালাকিকে বললেন, লোকটি কোথায় শুয়েছিল? কেমন সে জায়গা? আর এখানে ফিরে এলই বা কোথা হতে? বালাকি বলতে পারলেন না। তিনি জানেন না।

৪।১৯॥ তখন রাজা বললেন, তাহলে আমি বলছি ও কোথায় ছিল, কোথা হতে এল। **এতত্** এই যে পুরুষ। তত্-এর মত শব্দটির ব্যবহার ব্রাহ্মণে যথেষ্ট আছে।

**হিতা নাড়ী** প্রায় সর্বত্র বহুবচন, কেবল একটি জায়গা ছাড়া। যাতে সূর্যবিজ্ঞান নিহিত রয়েছে সেইটিই হিতা নাড়ী। ছান্দোগ্য ও কঠে এ নাড়ীর উল্লেখ আছে। তাছাড়া বৃহদারণ্যকে (২।১।১৯, ৩।২০, ৪।২।৩)

---

১ দুটি অর্থ। দ্র. অনুবাদ। মা—(১) না (২) আমাকে। লুঙ্—(১) মা-যোগে (২) অতীতে।

রয়েছে। ঋক্‌সংহিতায় এ নাড়ী সুষোমা নদী—পরে সুষুম্‌ণা। সূর্যরশ্মি ‘সীমানং বিদার্য’ এই নাড়ী অবলম্বনে হৃদয়ে নিহিত হয়।

**পুরীতত্**-এর ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে আছে। এ-দেহ পুরী। তাতে যা ‘তত’, তন্তুর মত বিছানো। সমগ্র বিস্তৃত নাড়ীজালই পুরীতত্—এ কালের nervous system। জালকে একটি দড়ি ধরে টেনে গুটিয়ে ফেলা যায়। এই আকর্ষণসূত্রই হিতা বা সুষুম্‌ণা।

**অণ্ব্যঃ**=অণ্বী+১।৩ ‘পবিত্র’ বা মেষলোমের ছাঁকনি। নাড়ীগুলি খুব অণ্বী সূক্ষ্ম—একটি চুলের হাজার ভাগের এক ভাগ। তাদের মাঝে খুব সূক্ষ্মভাবে রং খেলে। রংগুলি হল কৃষ্ণ পিঙ্গল লোহিত পীত শুক্ল। তিনটি হল মৌলিক বর্ণ, অন্যগুলি তাদের বিভূতি। এই রঙের বিন্যাস তমঃ, রজোমিশ্রিত তমঃ, রজঃ, মিশ্রসত্ত্ব এবং সত্ত্ব—চেতনার এই ক্রমবিকাশের স্তর লক্ষণীয়। নাড়ীবিজ্ঞানের একটা সূত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে। সাংখ্যে ত্রিগুণের সঙ্গে রঙের যোগ সম্ভবতঃ সূর্যোদয়-সূর্যাস্তকালের রঙের খেলা হতেই এসেছে। স্বরোদয় শাস্ত্রে ও জৈনদর্শনে এই রং নিয়ে অনেক কথা আছে। হৃদয় আকাশ হয়ে গেলে তাতে ক্রমান্বয়ে অমনি রঙ ফোটে। ঘুমন্ত লোকটি কোন ভূমিতে ছিল তা বর্ণ বা চেতনার বিচারে বলা যায়।

সুষুপ্তিতে জাগ্রতের চেতনা আপাতদৃষ্টিতে লোপ পেয়ে যায় বলে মনে হলেও তা থাকে প্রাণে, থাকে ঐ সূক্ষ্ম নাড়ীতন্ত্রে। জাগরণে আবার তারা যথায়তনে প্রতিষ্ঠিত হয়। **আয়তন** ইন্দ্রিয়গোলক। **দেবতা** ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী আর **লোক** ইন্দ্রিয়। **অপ্যয়** এখানে লয়। এককথায় প্রাণই সর্বাধার।

এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা। **শরীর-আত্মায়** তা অনুপ্রবিষ্ট। আত্মাতে সব কিছুর পর্যবসান। মূল কথা এই। শরীর-আত্মা কথাটি লক্ষণীয়। ‘সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম’র প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এই ছত্রটিতে। কথাটি আরো বিশদ করে বলছেন—

৪।২০॥ শ্রেষ্ঠী যেমন তাঁর স্বজনদের নিয়ে সব ভোগ করেন এবং স্বজনরাও তাঁর আশ্রয়েই ভোগ্যবস্তু লাভ করেন, আত্মাও তেমনি দেহাধীশ। প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ বা শুদ্ধ প্রাণের আশ্রয়েই ইন্দ্রিয়বর্গের অভ্যুদয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিজ্ঞান লাভ না হয়, ততক্ষণই অসুরশক্তির জয়। আত্মবিজ্ঞান বা প্রাণ-ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করলেই আধিপত্য ও স্বারাজ্য।

ভূতপতি হলে আধিপত্য, তার দেবতাদের অধিপতি হলেই স্বারাজ্য। ইন্দ্র ভূতপতি এবং দেবরাজ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

কৌষীতকী উপনিষদ্ ভাষ্য সমাপ্ত